হারুকি মুরাকামির শ্রেষ্ঠগল্প

অনুবাদ • দিলওয়ার হাসান

সূচীপত্র

1. Suggested eBook Reader
2. Acknowledgment
3. About Contributor
4. ইপানিমার মেয়েটি ১৯৬৩/১৯৮২
5. উড়োজাহাজ
6. একটি জানালা
7. এপ্রিলের এক চমৎকার সকালে ১০০ ভাগ মানানসই মেয়েটিকে দেখে
8. কিডনি আকারের পাথর যেটি রোজই চলাফেরা করে
9. গরিব খালাম্মা বিষয়ক একটি গল্প
10. ঘুম
11. জন্মদিন ও মেয়েটি
12. টনি টাকিটানি
13. তুষার-মানব
14. নাম-চোর বানর
15. বেকারিতে দ্বিতীয়বার হামলা
16. বেকারিতে হামলা
17. ব্যাঙ বাঁচালো টোকিও
18. মানুষ-খেকো বিড়াল
19. শেষ পৃষ্ঠা

Recommended eBook Reader

Android

Lithum

Desktop

Calibre

Apple

iBooks

Acknowledgment

করোনা প্রকোপের লকডাউনে বসে পাইথন শেখার প্রক্রিয়ায় বানানো বইগুলি।

Inspired from Lorenzo Di Fuccia, eBanglaLibrary @ Github & many more @ StackOverflow.

For any ideas/suggestions on books, you would like to get implemented go to @bongboi or @boibongo_bot

This Book is scraped from public domain maintained by eBanglaLibrary. No intention for copyright infringement.

eBanglaLibrary

Contributor

This ebook is auto generated by using python. Some parts may be broken. If you find such please improve and submit or report to telegram.

Disclaimer

⚠

Tele Boi Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976: allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, commenting, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favour of fair use.

The content of the book is publically available in the website eBanglaLibrary.

Do Not redistribute in a commercial way.

Please buy the hardcopy of the books to support your favourite

authors.

ইপানিমার মেয়েটি ১৯৬৩-১৯৮২

ইপানিমার মেয়েটি ১৯৬৩/১৯৮২

{গেট্জ/গিলবার্তোর সঙ্গীত দিয়ে শুরু হয়েছিল।} দীর্ঘ, গায়ের রঙ তামাটে, তরুণ, চমৎকার... {আর এভাবেই এগিয়েছিল।}

১৯৬৩ সালে ইপানিমার মেয়েটি এভাবেই সমুদ্র দর্শন করেছিল। আর এখন ১৯৮২ সালে এসে ইপানিমার মেয়েটি একইভাবে সমুদ্র দেখছে। তখন থেকে। একটুও বাড়েনি তার বয়স। একটা ভাবমূর্তি সৃষ্টি হয়েছে তার, আর সময়ের সাগরে ভাসছে সে। তার বয়স যদি একটু বাড়েও, চল্লিশের বেশি মনে হবে না তাকে। আর এটাও সম্ভব যে, সে এত বেশি বয়স্ক নয়, তবে সে ছিপছিপে আর টান-টান ত্বকের অধিকারী থাকবে না আগের মতো। হয়ত তার তিনটি সন্তান থাকবে। সূর্যের তাপ তার ত্বকের জন্য ভাল নয়। এখনও তাকে সুন্দরীই বলা যাবে, তবে পঁচিশ বছর আগের মতো তারুণ্যতো আর আশা করা যাবে না।

সঙ্গীতে কিন্তু সে বুড়ো হয়নি একটুও। স্টান গেঞ্জ এর বাঁধা ছন্দের স্যাক্সাফোনের মোলায়েম সুরে সে বরাবরই ইপানিমার আঠারো বছরের যুবতী, শান্তশিষ্ট, দয়াবতী। টার্নটেবলে রেকর্ডটা চাপিয়ে দিতেই সে এসে হাজির হয়। যতবারই সুরটি শুনি আমার স্মৃতিপটে হাইস্কুলের করিড়োর ভেসে ওঠে। অন্ধকার, স্যাঁতসেতে করিড,র। সিলিং

অনেক ওপরে আর যখন কনসার্ট ফ্লোরের ওপর দিয়ে হাঁটি আমার পদশব্দ প্রতিধ্বনিত হয়। উত্তর দিকের দেয়ালে কয়েকটা জানালাও আছে; কিন্তু সূর্যের আলো সেখানে কমই ঢোকে, কারণ ভবনটি একটা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। যতদূর মনে পড়ে করিডোরটা সব সময় থাকত নীরব সুনসান।

করিডোরের কথা মনে হতেই 'ইপানিমার মেয়েটি" নামের সঙ্গীতটি কেন আমি শুনি জানি না। কোনো কার্য-কারণ খুঁজে পাই না। আমার চৈতন্যের কূপে ইপানিমার মেয়েটি ১৯৬৩ কোন ধরনের নুড়ি ফেলে দিয়েছিল? হাইস্কুল ভবনের করিডোর আমাকে লেটুস, টমেটো, শসা, কাঁচালঙ্কা, অ্যাসপারাগাস, পেঁয়াজ এর সালাদের কথা মনে করিয়ে দেয়। করিডোরের মাথায় নিশ্চয়ই কোনো সালাদের দোকান নেই। করিডোরের শেষে আছে একটা দরজা আর তারপরেই পঁচিশ মিটার লম্বা একটা সুইমিং পুল।

.

১.

করিডোর কেন সালাদের কথা মনে করিয়ে দেয় জানি না। কোনো কার্য-কারণও নেই। মনের ভেতর এই দু'য়ের সংযোগ হয়ত কোনো দুর্ঘটনা বা অন্য কিছু। কোনো ভাগ্যাহত মহিলার মতো, যে কিনা সদ্য রঙ করা কোনো বেঞ্চের ওপর বসে পড়ছে। ওই সালাদ একটা মেয়ের কথা মনে করিয়ে দেয় আমাকে, যার সঙ্গে চেনাজানা ছিল আমার। এখানে একটা স্পষ্ট সম্বন্ধ রয়েছে। মেয়েটি সারাক্ষণ সালাদ খেত।

"ইংরেজি ক্লাসের (কচ কচ) জন্য পেপারটা (কচ কচ কচ) শেষ করছে? আমারটা এখনও (কচ কচ) শেষ হয়নি। বাকি আছে একটু (কচ কচ) খানি।"

আমি সবজি খুব পছন্দ করি আর যখনই আমাদের দেখা হয় এ রকম করে সালাদ খাই আমরা। সে খুব কঠিন মনের একটি মেয়ে আর তার বিশ্বাস নানা ধরনের সবজি খেলে

সব কিছু ঠিকঠাক চলবে। মানুষ যদি সবজি খাওয়া অব্যাহত রাখে তাহলে বিশ্ব হয়ে উঠবে শান্তিময়, সুন্দর, স্বাস্থ্যকর ও ভালবাসায় পূর্ণ। "স্ট্রবেরি বিবৃতির মতো অনেকটা। একদা, এক দার্শনিক লিখেছিলেন, "একটা সময় ছিল যখন বস্তু ও স্মৃতি তত্ত্বজ্ঞানসমৃদ্ধ গভীরতা দিয়ে ভাগ করা হতো।" ইপানিমার মেয়ে ১৯৬৩/১৯৮২ কোনো রকম শব্দ না করে নিগুঢ় তপ্ত সমুদ্র তটের ওপর দিয়ে হাঁটছে। এটা একটা দীর্ঘ সমুদ্র তট আর ধীর-শুভ্র ঢেউ তা ধুয়ে দিচ্ছে। বাতাস নেই, দিগন্ত ফাঁকা। সমুদ্রের গন্ধ পাচ্ছি আমি। প্রখর রোদে পুড়ে যাচ্ছি। একটা ছাতার নিচে শুয়ে বিয়ারের একটা ঠাণ্ডা ক্যান খুলি। সে তখনও হাঁটছে। তার দীর্ঘ, টানটান শরীরে বিকিনি ছাড়া আর কিছুই নেই এখন।

"হেই।" সাহস করে বলি। সে জবাব দেয় "হেই।"

"একটা বিয়ার খেলে কেমন হয়?" প্রস্তাব দেই আমি। একটুখানি দ্বিধায় পড়ে সে। সারাদিন বিচে হেঁটে-হেঁটে সে নিশ্চয়ই তৃষ্ণার্ত এখন। "ঠিক আছে চলুক।" তারপর আমরা ছাতার তলায় বসে বিয়ার পান করি।

.

২.

"একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আমি নিশ্চিত ১৯৬৩ সালে এই সময় একই জায়গায় আমি আপনাকে দেখেছি।" মাথাটা একটুখানি তুলে সে উত্তর দেয়, "সে তো অনেক দিন আগের কথা, তাই না?"

"হ্যাঁ সে অনেক আগের কথা।"

বিয়ারের অর্ধেকটা খেয়ে ক্যানের মুখের দিকে তাকায় সে। খুবই সাধারণ একটা মুখ, কিন্তু সে যখন দেখল আমার কাছে মনে হলো গুরুত্বপূর্ণ কিছু আছে ওখানে। যেন গোটা

পৃথিবীই ধারণ করে আছে ওটা।

“হয়ত আমাদের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটেছিল ১৯৬৩ তে? হ্যাঁ ১৯৬৩ তে-ই তো। হ্যাঁ দেখা হয়েছিল একে অপরের।”

“তখন থেকে আপনার বয়স কিন্তু একটুও বাড়েনি।”

“কারণ আমি একজন বিমূর্ত মেয়ে যাকে বলে মেটাফিজিক্যাল গার্ল।”

আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়ি। সব সময় সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিলেন বলে আমাকে খেয়াল করেননি। আমি নিশ্চিত।”

“হতেও পারে।” বলল সে তারপর হাসল। চমৎকার হাসি, তবে একটুখানি বিষণ্ণতার আভাস ছিল তাতে। “হয়ত সারাক্ষণই সমুদ্রের দিকে তাকিয়েছিলাম, সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছিল না।”

আমি নিজেই আর একটা বিয়ারের ক্যান খুলে তাকে অফার করলাম। মাথা ঝাঁকিয়ে মানা করল সে। “আমি খুব বেশি একটা বিয়ার খাইনে। ধন্যবাদ, হাঁটাটা অব্যাহত রাখতে হবে আমাকে আগের মতো।”

“দীর্ঘ সময় হেঁটে জুতোর তলায় বালির উত্তাপ অনুভব করছেন না?”

“না আমার জুতোর সোলও মেটাফিজিক্যালি তৈরি। ওগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখেননি?”

.

৩.

হ্যাঁ। সে জুতোর ভেতর থেকে তার শীর্ণ পা দুটো বের করে আমাকে দেখাল। সত্যিই

সোলগুলো মেটাফিজিক্যাল। আলতো করে সেগুলো স্পর্শ করলাম, না-গরম না-ঠাণ্ডা। সোল স্পর্শ করার সময় ঢেউয়ের অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পেলাম। ঢেউয়ের শব্দ পর্যন্ত মেটাফিজিক্যাল। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ রেখে আবার খুলোম এবং ঠাণ্ডা বিয়ারে চুমুক দিলাম। সূর্য এক ফোঁটাও নড়ল না। সময় স্থির হয়ে রইল। মনে হলো একটা আয়নার ভেতর ঢুকে গেছি। "যখনই আপনার কথা মনে হয়, তখনই আমার স্কুল ভবনের করিডোর স্মরণে আসে। কেন এমন হয় বলে আপনার ধারণা?" সাহস করে জিজ্ঞেস করি।

"মানবতার নির্যাস নিহিত আছে তার যৌগে পরিণত হওয়ার ভেতর" সে বলল, "মানব-বিজ্ঞানের উচিত নয় লক্ষ্যকে খুঁজে বের করা বরং তার খোঁজা উচিত মূল বিষয় যা শরীরের সঙ্গে যুক্ত।"

"হুঁ।"

"যে ভাবেই হোক বেঁচে থাক, বাঁচো, বাঁচো। তাতেই চলবে। তুমি জীবন যাপন করছ এটাই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। শুধু এটুকুই বলতে পারি। আমি শুধু এমন একটা মেয়ে যার আত্মাটা মেটাফিজিক্যাল।" এবং ইপানিমার মেয়েটি ১৯৬৩/১৯৮২ তার হাঁটু থেকে বালু মুছে উঠে দাঁড়াল।

"বিয়ারের জন্য ধন্যবাদ।"

"ধন্যবাদ আপনাকেও।"

মাঝে মধ্যে তার সঙ্গে সাবওয়ে ট্রেনে দেখা হয়। 'থ্যাঙ্ক-ইও-ফর দ্য বিয়ার' হাসি ছুঁড়ে দেয় আমার দিকে। তারপর থেকে আমাদের মধ্যে বাক্য বিনিময় হয় না আর। তবে আমার মনে হয়, আমাদের ভেতর হৃদয়ের যোগাযোগ আছে। জানি না কোথায় আমরা যুক্ত, তবে আমি নিশ্চিত, বন্ধনটি অদ্ভুত দূরের এক পৃথিবীর কোনো খানে আছে।

বন্ধনটার কথা ভাবি আমি। বন্ধনটা নীরবে থাকে অন্ধকার করিডোরটার ভেতর যেখান দিয়ে কেউ চলাফেরা করে না। এসব ভাবার সময় অনেক বছরের পুরনো স্মৃতি ধীরে ধীরে আমার মনে এসে ভিড় জমায়। ওখানেও বন্ধন আছে একটা, যা আমাকে ও আমার সত্তাকে যুক্ত করে। অদ্ভুত দূরের পৃথিবীতে কারও সঙ্গে দেখা হবে আমার। আশাকরি ওটা হবে একটা উষ্ণ স্থান। ঠাণ্ডা কিছু বিয়ারের সন্ধান মিললে কিছুই বলার থাকবে না আমার। ওই পৃথিবীতে আমিই স্বয়ং আমি আর স্বয়ং আমিই আমি। বিষয়বস্তু হচ্ছে লক্ষ্য এবং লক্ষ্যই বিষয়বস্তু। কোনো যাওয়া-আসার পথ নেই মাঝখানে। তারা ঘনিষ্টভাবে যুক্ত। পৃথিবীর কোনো স্থানে এই অদ্ভুত জায়গার অস্তিত্ব আছে।

১৯৬৩/১৯৮২ এর ইপানিমার মেয়ে এখন সমুদ্রতট দিয়ে হেঁটে চলেছে। শেষ রেকর্ডটি ক্ষয়প্রাপ্ত না-হওয়া পর্যন্ত সে বিরতিহীনভাবে হাঁটতে থাকবে...

উড়োজাহাজ

উড়োজাহাজ

সেই বিকেলে মেয়েটি তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, “যেভাবে তুমি নিজের সঙ্গে কথা বলো, তা কি পুরনো অভ্যাস?” টেবিলের ওপর থেকে চোখ তুলে সে এমনভাবে প্রশ্নটা করল যেন ওই ভাবনা তাকে এই মাত্র আঘাত করেছে। বলাই বাহুল্য আসলে তা করেনি।

রান্নাঘরের টেবিলে মুখোমুখি বসেছিল দু’জন। পাশের রেল সড়ক দিয়ে কমিউটার ট্রেনের যাতায়াতের শব্দ ছাড়া ওই এলাকাটা বেশ নীরব। ট্রেনবিহীন রেল সড়কটা তাদের জন্য এক রহস্যময় নৈঃশব্দ্য তৈরি করে। কিচেনের পাতলা প্লাস্টিকের মেঝে ছেলেটার পা দুটোকে শীতল পরশ দান করে। মোজা খুলে পকেটে ঢুকিয়ে ফেলে সে। এপ্রিল মাসের বিকেল হলেও আজকের আবহাওয়ায় একটু বেশি গরমের ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। মেয়েটা তার বিবর্ণ চেক শার্টের হাতা কনুই অবধি গুটিয়ে রেখেছে। তার পলকা ফরসা আঙ্গুলগুলো খেলছে কফি চামচের হাতলের সাথে। ছেলেটা তার আঙ্গুলগুলোর দিকে তাকায়, আর তার মনের ক্রিয়া অদ্ভুত রকমের নীরস হয়ে পড়ে।

ছেলেটা কেবল কুড়িতে পড়েছে, মেয়েটা তার চেয়ে সাত বছরের বড়, বিবাহিত ও এক সন্তানের জননী। ছেলেটির জন্য মেয়েটি হচ্ছে চাঁদের দূরের অংশ।

তার স্বামী এমন একটা ট্রাভেল এজেন্সিতে কাজ যারা বিদেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে পারদর্শী। ফলে তাকে মাসের অর্ধেকটা সময় দেশের বাইরের কোনো শহর যেমন লন্ডন, রোম কিংবা সিঙ্গাপুরে থাকতে হয়। অপেরা ওই ভদ্রলোকের খুব প্রিয়। তার শেলভে তাই জায়গা করে আছে ভার্দি, পুসিনি, দোনিজেত্তি বা রিচার্ড স্ট্রাউসের রেকর্ড। যখন কথা ফুরিয়ে যায় কিংবা করবার কিছু থাকে না ছেলেটা রেকর্ডের শেলভের এ পাশ থেকে ও পাশে চোখ বুলায় আর মনে মনে অ্যালবামগুলোর নাম পড়ে- লা বোহ... মি, টোসকা, টুরানডট, নরমা, ফাঁইডেলিও... সে কখনো এসব মিউজিক শোনেনি বা শোনার সুযোগ তার হয়নি। তার পরিবার, বন্ধু-বান্ধব বা পরিচিতদের কেউ-ই অপেরার ভক্ত নয়। শুধু জানে অপেরা-সঙ্গীতের অস্তিত্ব এই পৃথিবীতে আছে, কিছু লোক তা শোনে; তবে মেয়েটির স্বামীর এই রেকর্ডগুলো দেখে সে ওই জগৎ সম্পর্কে প্রথম জ্ঞান লাভ করেছে।

মেয়েটিও অবশ্য অপেরার ভক্ত নয়। তবে ওগুলো আমি ঘেন্না টেন্না করি না। ওগুলোর একটাই দোষ, বড় দীর্ঘ।" বলে সে।

রেকর্ডের শেলভের পাশেই চমৎকার একটা স্টিরিও সেট। এটার উপস্থিতি সত্যিকার অর্থেই ব্যতিক্রমধর্মী। তবে বাজানোর সময় ওটা সে দেখেনি কখনো। মেয়েটিও জানে না ওটার পাওয়ার সুইচ কোথায় আর ছেলেটি ওটি স্পর্শ করার কথাও ভাবেনি কখনো।

মেয়েটি ওকে বলেছে "ঘরে কোনো সমস্যা নেই আমার। স্বামী আমার কাছে খুবই ভাল। মেয়েকে আমি স্নেহ করি খুব। আমি মনে করি আমি সুখী।" তাকে বেশ শান্তশিষ্টই মনে হয়। তার কথা থেকে আঁচ করা যায় না যে, সে তার জীবনের ব্যাপারে অজুহাত দাঁড় করাচ্ছে। নিষ্ঠার সঙ্গে সে তার বিয়ের কথা বলে, যেন সে ট্রাফিক আইন কিংবা আন্তর্জাতিক ডেটলাইন নিয়ে আলোচনা করছে। আমার ধারণা আমি সুখী, কোনো ঝামেলা নেই।" এই হচ্ছে তার বক্তব্য।

সে তখন অবাক হয়ে ভাবে, তা-ই যদি হয় তাহলে তুমি কেন আমার সঙ্গে বিছানায় যাচ্ছ? এ নিয়ে অনেক ভেবেছে ছেলেটি; কিন্তু কোনো কূলকিনারা করতে পারেনি। কথাটা তাকে জিজ্ঞেস করার কথাও ভেবেছে সে। কীভাবে শুরু করবে বুঝে উঠতে পারেনি। বলেই বা কেমন করে? "এতই যখন সুখে আছ তাহলে আমার সঙ্গে শুতে আস কেন" এ কথা কী করে জিজ্ঞেস করে। সে জানে এ প্রশ্নের মুখোমুখি হলে নির্ঘাত কেঁদে ফেলবে ও।

হামেশাই বিস্তর কাঁদে সে, অনেকক্ষণ ধরে, খুব কম শব্দ করে। ছেলেটি বলতে গেলে জানেই না কেন সে কাঁদে। একবার শুরু করলে থামতেই চায় না। সে অবশ্য তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করে; কিন্তু নির্দিষ্ট একটা সময় পার না-হওয়া পর্যন্ত কান্না থামায় না সে। কেন মানুষ একে অন্য থেকে এত আলাদা? অবাক হয়ে ছেলেটি ভাবে। অনেক মেয়ের সঙ্গে মিশেছে সে, সবাই কেঁদেছে অথবা রাগ করেছে তবে সবার-ই একটা বিশেষ ভঙ্গিমা ছিল। মিলও ছিল বিস্তর, সেগুলো অমিলের তুলনায় অনেক কম। ওখানে অবশ্য বয়সের কোনো তারতম্য ছিল না। বয়স্ক কোনো নারীর সঙ্গে এই তার প্রথম; কিন্তু বয়সের পার্থক্য ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনি সে। বয়সের পার্থক্যের চেয়ে বেশি অর্থবহ ছিল প্রতিটি রমণীর নানা ঝোঁক বা প্রবণতা। সে না ভেবে পারেনি জীবনের রহস্য খোলার জন্য এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ চাবি।

কান্না শেষ হলে সাধারণত তারা রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। কান্নার পরে মেয়েটিই সব। সময় উদ্যোগটা প্রথমে নেয়, অন্য সময় ছেলেটি এগিয়ে আসে। কখনো মেয়েটি কোনো কথা না বলে শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে প্রত্যাখ্যান করে। তখন তার চোখ দুটো সকালের আকাশে ভাসমান সাদা চাঁদের মতো দেখায়। সে যখন এরকম চোখের দিকে তাকায় তার মনে হয়, তাকে আর কিছু বলা মোটেও সম্ভব নয়। রাগ কিংবা অসন্তোষ কোনোটাই আসে না। এভাবে হয়ে যায় সবকিছু, ভাবে সে। কখনো কখনো খুব স্বস্তি অনুভব করে। ধীরে ধীরে গল্প করতে করতে কফি পান করে। অধিকাংশ সময়ই

তাদের কথাবার্তা থাকে অসম্পূর্ণ। দু'জনের একজনও বাকপটু নয়, তবে কিছু কিছু ব্যাপারে তাদের অভিন্ন কথা থাকে।

তাদের যৌন মিলন ঘটে খুবই স্তব্ধতার ভেতর। একে কোনো ভাবেই শরীরী আনন্দ বলে অভিহিত করা যায় না। তবে একথা বললে ভুল হবে যে, ওই মিলনে যে-সুখানুভূতি সে সম্পর্কে অবহিত নয় তারা। দেহ-মিলনের মাধ্যমে ছেলেটি যে আনন্দ লাভ করে আগে সে তা পায়নি কখনো। ওটা তাকে ছোট্ট একটা সুন্দর পরিচ্ছন্ন ঘরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যা একটা আরামদায়ক স্থান।...পরিস্থিতির এই অদ্ভুত অবস্থাটা তার জন্য একটু বেশিই।

তার বিশ্বাস নিজের বিচার বিবেচনা দিয়েই জীবনের পথ চলছে সে। কিন্তু যখন সে এই ঘরে বসে আছে, ট্রেন চলে যাওয়ার শব্দ শুনছে আর নিজের বাহুতে আঁকড়ে ধরে আছে তার চেয়ে বেশি বয়সের এক মহিলাকে তখন সে বিভ্রান্তি অনুভব না করে পারে না। বার বার নিজেকে প্রশ্ন করে, আমি কি তার প্রেমে পড়েছি? কিন্তু পুরো দৃঢ়তা নিয়ে কোনো সদুত্তর খুঁজে পায় না।

শরীরের খেলা শেষ হলে মেয়েটি ঘড়ির দিকে তাকায়। ছেলেটির বাহুর ওপর শুয়ে মুখোনি একটু ওঠায় এবং ঘড়িঅলা রেডিওটার দিকে দৃষ্টি দেয়। তখন বাইরের রেল সড়ক দিয়ে একটা ট্রেন দ্রুত চলে যায়। কন্ডিশন্ড রিফ্লেক্সের মতো সে তাকায়, একটা ট্রেন চলে যায়।

মেয়েটি বার বার ঘড়ি দেখে নিশ্চিত হয় তার মেয়ের স্কুল থেকে ফেরার সময় হয়নি। একবারই মাত্র ছেলেটি তার বাচ্চাটার দিকে তাকিয়েছিল। তার কাছে মনে হয়েছে মেয়েটি ফুটফুটে-সুন্দর। সে ওর অপেরা-প্রেমী স্বামীকে কোনোদিন দেখেনি, ভাগ্যক্রমে যে একটা ট্রাভেল এজেন্সিতে কাজ করে।

মে মাসের এক বিকেলে সে প্রথম তার নিজের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারটি ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করেছিল। সেদিনও কেঁদেছিল মেয়েটি তারপর সঙ্গমে রত হয়েছিল। কেন সে কেঁদেছিল মনে নেই তার। তার মাঝে মাঝে মনে হয় কারও বাহুবন্ধনে কাঁদতে পারবে বলেই সে ওর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছে। হতে পারে সে একা কাঁদতে পারে না, সে জন্য ওকে বেছে নিয়েছে।

সেদিন সে দরজায় তালা লাগাল, পর্দা নামাল, টেলিফোন সেটটি বিছানার পাশে এনে রাখল তারপর মিলিত হলো; আগের মতোই ধীরেসুস্থে, নীরবে। তখন ডোরবেল বাজল। উপেক্ষা করল সে। চমকালো না, অবাকও হলো না। শুধু মাথা নাড়াল একটুখানি, যেন বলতে চাইল, "ও কিছু না ঘাবড়াবার কিছু নেই।" বেল বাজল আরও কয়েকবার। যে-ই বাজাচ্ছিল না কেন, ক্ষান্ত দিয়ে চলে গেল। কোনো সেলসম্যান-ট্যান হতে পারে। কিন্তু সে কি করে এত নিশ্চিন্ত থাকছে? একটু আগে একটা ট্রেন চলে গেল গুড় গুড় করে। দূর থেকে ভেসে এলো পিয়ানোর সুর। খুব অস্পষ্টভাবে সুরটা আঁচ করতে পারল ছেলেটি। অনেক দিন আগে সঙ্গীতের ক্লাসে সুরটি শুনেছিল সে; কিন্তু ঠিক ঠিক মনে করতে পারল না। সবজি বোঝাই একটা ট্রাক ঠনঠন শব্দ তুলছিল। চোখ বন্ধ করে মেয়েটি গভীর শ্বাস টানল, প্রশান্তি নেমে এলো ছেলেটির মধ্যে।

সে বাথরুমে ঢুকল গোসল করতে। ফিরে এসে টাওয়েলে মাথা মুছতে মুছতে লক্ষ্য করল বিছানায় মুখ ডুবিয়ে শুয়ে আসে সে। তারপাশে বসে ওর পশ্চাৎদেশ ডলাই-মলাই করতে করতে অপেরা-রেকর্ডগুলোর নাম পড়তে লাগল।

মেয়েটি উঠে কাপড় চোপড় ঠিক করল, তারপর কফি বানাতে রান্নাঘরে ঢুকল। তার কিছুক্ষণ পরে সে জিজ্ঞেস করল, "নিজের সঙ্গে ও-রকম কথা বলাটা কি তোমার পুরনো অভ্যাস?"

"ও-রকম? তার মানে তুমি কি বলতে চাইছো ওটা করার সময়...?"

“না-না, সে সময় না, যে-কোনো সময়। এই ধরো যখন গোসল করছ কিংবা আমি যখন কিচেনে, তুমি একা বসে খবরের কাগজ পড়ছ, ওই রকম আর কী...”

মাথা নাড়িয়ে সে বলল, “জানি না, কখনো খেয়াল করিনি। নিজের সঙ্গে কথা বলি আমি?”

ছেলেটির লাইটারটা নিয়ে খেলতে খেলতে সে বলল, “সত্যি তুমি নিজের সঙ্গে কথা বল।”

“তোমার কথা অবিশ্বাস করছি না।” বলল সে। এ কথার অস্বস্তি তার কণ্ঠস্বরে ধরা পড়ল। তার হাত থেকে লাইটারটা নিয়ে একটা সিগারেট ধরাল সে। অল্প কিছু। দিন আগে সেফেন স্টার ব্র্যান্ডের সিগারেট খেতে শুরু করেছে সে, ওর স্বামীর ব্র্যান্ড। আগে তার ছিল হোপ। তার কথায় সে ব্র্যান্ড বদলায়নি, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। হিসেবে সে নিজেই সিদ্ধান্তটা নিয়েছে। এতে সহজ হবে সব কিছু, টিভির ওই মেলোড্রামার মতো...।

“শোন, আমিও নিজের সঙ্গে কথা বলতাম,” বলল সে, “তবে যখন ছোট ছিলাম।”

“ও তাই নাকি?”

“মা আমার ওই অভ্যাসটা গাঢ় হতে দেননি। প্রায়ই তিনি বলতেন, “বাচ্চা মেয়েদের নিজের সঙ্গে কথা বলতে নেই।” যখনই আমি কাজটা করতাম ভীষণ ক্ষেপে যেতেন তিনি। একবার তো একটা বড় বাক্সের ভেতর ঢুকিয়ে রেখেছিলেন আমাকে। জায়গাটা ছিল অন্ধকার, দুর্গন্ধে ভরা, এমন বাজে জায়গার কথা ভাবাই যায় না। মাঝে মাঝে রুলার দিয়ে আমার হাঁটুর ওপর বাড়িও মারতেন। কাজ হয়েছিল তাতে। নিজের সঙ্গে কথা বলার রোগটি সারতে বেশি সময় লাগেনি।”

কোনো কিছু বলার কথা ভাবতে পারেনি সে, বলেও নি। মেয়েটি শুধু ঠোঁট

কামড়িয়েছিল।

“এখনও যদি কোনো কিছু একটা বলতে চাই আপন মনে, বাক্যটা বেরুনোর আগেই গ্রাস করে ফেলি। কিন্তু নিজের সঙ্গে কথা বলা এত খারাপ কেন, বুঝি না আমি। মুখ থেকে বেরুনো স্বাভাবিক বচন বই তো নয়! মা জীবিত থাকলে জিজ্ঞেস করতাম তাকে।”

একটা কফির চামচ নাড়াচাড়া করছিল মেয়েটি। হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকাল, ঠিক সেই সময় একটা ট্রেন চলে গেল। তারপর সে বলল, “কখনো-কখনো আমার মনে হয় মানুষের হৃদয় গভীর কূপের মতো, তলায় কী আছে কেউ জানে না। কখনো ক্ষণিকের জন্য তার একটুখানি ওপরে ভেসে উঠলে খানিকটা আঁচ-অনুমান করা যায় সে সম্পর্কে।”

দু’জনেই কিছুক্ষণের জন্য সেই কূপের কথা ভাবল।

“নিজের সঙ্গে যখন কথা বলি তখন কী বলি? একটা উদাহরণ দেবে?” ছেলেটি জিজ্ঞেস করল। কয়েক মিনিট মাথাটা নাড়াল সে, যেন বিচক্ষণতার সাথে ঘাড়ের নড়াচড়া পরীক্ষা করছে। “বেশ শোন তাহলে, ওখানে. উড়োজাহাজের ব্যাপার আছে...”

“উড়োজাহাজ?”

“হ্যাঁ, দেখনি, আকাশে ওড়ে।”

হাসল সে। “এতো কিছু থাকতে উড়োজাহাজ নিয়ে কথা বলতে যাব কেন আমি?”

সে-ও হাসল। তর্জনী ব্যবহার করে আকাশে কল্পিত একটা বস্তু মাপল। এটা তার একটা অভ্যাস।

“তোমার উচ্চারণ কিন্তু খুব স্পষ্ট। তুমি কি নিশ্চিত যে নিজের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারটা একেবারেই মনে পড়ে না তোমার?”

“একটুও না।”

একটা বলপেন তুলে নিয়ে কয়েক সেকেন্ড খেলল সে, তারপর আবার ঘড়ির দিকে তাকাল। ঘড়ি তার নিজের কাজ করে যাচ্ছে। পাঁচ মিনিট আগে যখন সে তার দিকে তাকিয়েছিল এখন তার চেয়ে পাঁচ মিনিট এগিয়ে গেছে।

“নিজের সঙ্গে কথা বলার সময় মনে হয় তুমি কবিতা আবৃত্তি করছ।”

এ কথা বলার সময় মেয়েটির মুখে লালের আভাস ছড়িয়ে পড়ল। তখন ওই অস্বাভাবিক ব্যাপারটির সন্ধান পেল সে। আমার নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলার ব্যাপারটিতে সে কেন রক্তিম হচ্ছে?

ছন্দ দিয়ে বাক্যগুলো প্রকাশ করতে চাইল : “নিজের সঙ্গে কথা বলি আমি/প্রায় যেন/ করছিলাম আবৃত্তি/একটা কবিতা।”

বলপেনটা আবার তুলে নিল মেয়েটি। হলুদ রঙের প্লাস্টিকে তৈরি। কোনো একটা ব্যাংকের দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বের করা হয়েছে।

কলমটার প্রতি নির্দেশ করে সে বলল, “এর পরে যখন আমি নিজের সঙ্গে কথা বলি, আমি কী বলি তা শুনে-শুনে তুমি লিখে রাখবে। লিখবে তো?”

সে সরাসরি তার চোখের দিকে তাকাল। “সত্যিই তুমি তা জানতে চাও?”

ছেলেটি সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল।

মেয়েটি এক টুকরো কাগজ তুলে নিয়ে তাতে কী যেন লিখতে লাগল। ধীরে ধীরে লিখলেও কোনো বিরতি নিল না। ছেলেটি চিবুকে হাত রেখে সারাক্ষণ তাকিয়ে রইল ওর চোখের পাতার লোমের দিকে। আর মেয়েটি কয়েক সেকেন্ড পরপর চোখ পিট পিট করতে লাগল। সে যত বেশি ওই চোখের পাতার দিকে তাকিয়ে রইল (কিছুক্ষণ আগেও যা ছিল অশ্রুজলে ভেজা) সে তত বেশি বুঝতে পারল না ওর সাথে বিছানায় যাওয়ার সত্যিকার অর্থ কী। তখন সবকিছু হারানোর একটা অনুভূতি তাকে গ্রাস করে ফেলল। তার মনে হলো সে হয়ত কোনো দিন আর কোথাও যেতে পারবে না। এই ভাবনা তার মধ্যে এমন আতঙ্কের সৃষ্টি করল যে, তা সহ্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল তার জন্য। তার অস্তিত্ব আর নিজস্বতা গলে পড়তে যাচ্ছে। হ্যাঁ একথা তো সত্যি, নতুন কাদা মাটির মতোন সে তরতাজা আর সে নিজের সঙ্গে কথা বলে, যেন কবিতা আবৃত্তি করে চলেছে ...।

লেখা শেষ করে মেয়েটি কাগজটি তার দিকে বাড়িয়ে দিল। ছেলেটি তুলে নিল কাগজখানা।

মেয়েটি বলল, “এর সবটা আমি হৃদয় দিয়ে জেনেছি- যা তুমি বলেছিলে।”

সে জোরে-জোরে পড়ল শব্দগুলো : উড়োজাহাজ, উড়োজাহাজ, উড়ছি আমি উড়োজাহাজ। উড়োজাহাজ উড়ছে বটে, তবে স্থির, যদিও ওড়ে উড়োজাহাজটাই আকাশ?

সে অবাক। “এই সব আমি বলেছি?”

“হ্যাঁ, একেবারে পুরোটা।”

“অবিশ্বাস্য! নিজেকে আমি এইসব বলেছি আর এর এক বর্ণও মনে নেই আমার?”

ছোট্ট একটা হাসি দিয়ে মেয়েটি বলল, “তুমি বলোনি তো কে বলেছে আবার। যেমনটা বললাম ওই রকমই ছিল তোমার কথা।”

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ছেলেটি। রহস্যজনক একটা ব্যাপার। জীবনে কোনো দিনও উড়োজাহাজের কথা ভাবিনি। এর কোনো স্মৃতিও নেই আমার জীবনে। তাহলে হঠাৎ কেন উড়োজাহাজ চলে আসছে।”

“জানি না। তবে একেবারে ঠিক ঠিক ওই কথা-ই বলছিলে তুমি, ওই যে স্নান করার আগে। তুমি হয়ত উড়োজাহাজের কথা ভাবছিলে না; কিন্তু গহিন কোনো বনের ভেতর, অনেক দূরে তোমার মন ভাবছিল তাদের কথা।”

“কে জানে? হতে পারে গভীর কোনো জঙ্গলের ভেতর বসে আমি নিজেই একটা উড়োজাহাজ বানাচ্ছিলাম।”

বলপয়েন্টটা টেবিলে রেখে মেয়েটি তার চোখ তুলল আর ওর দিকে তাকাল।

কিছুক্ষণের জন্য তারা কোনো কথা বলল না। তাদের কাপের কফি মেঘের রঙ ধারণ করে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। পৃথিবী তার অক্ষের দিকে ফিরল; সেই সময় চাঁদের ভর ক্রমশ সময় বদলালো। সময় এগিয়ে চলল নীরবে, আর রেললাইন ধরে দ্রুত চলে গেল ট্রেন।

ছেলেটি আর মেয়েটি একই জিনিস নিয়ে ভাবছিল, জিনিসটি আর কিছুই নয় উড়োজাহাজ, যা ছেলেটির হৃদয় গভীর অরণ্যে বসে তৈরি করছে। কত বড় ওটা, এর আকারই বা কী, কী তার রঙ, কোথায় চলেছে ওই উড়োজাহাজ, তাতে চড়বেই। বা কারা?

একটু পরেই মেয়েটি আবার কাঁদতে লাগল। এই প্রথম বারের মতো সে একই দিনে দু’বার কাঁদল। এটা একই সাথে শেষবার। এটা তার জন্য বিশেষ একটা জিনিস।

টেবিল উজিয়ে ছেলেটি মেয়েটির কেশ স্পর্শ করল। আশ্চর্যজনকভাবে ওগুলো তার কাছে একই সঙ্গে শক্ত ও পেলব মনে হলো। আর মনে হলো ওগুলো অনেক দূরে ...

একটি জানালা

একটি জানালা

প্রিয়ে...

শীতের সকাল তার শক্ত মুঠি একটুখানি শিথিল করলে সূর্যের তাপের উষ্ণতার ভেতর বসন্ত অনুভব করি। গতকালের চমৎকার চিঠির জন্য আবারও ধন্যবাদ।

হামবার্গার স্টেক এর সঙ্গে মশলা হিসেবে জায়ফল মেশানো নিয়ে তোমার লেখার অংশ উপভোগ করেছি। খুব বাস্তব সম্মত মনে হয়েছে। ছুরি দিয়ে যখন তুমি সবজি কাটছিলে তার সেই চপ-চপ' শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি। তোমার রান্নাঘরের উষ্ণতা আর গন্ধও অনুভব করতে পেরেছি।

তোমার চিঠি পড়ার পর একটা হামবার্গার স্টেক খেতে খুব ইচ্ছে করেছিল। ফলে দ্রুত একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়েছিলাম। বিশ্বাস করো আর না করো ওই রেস্তোরাঁয় আট রকমের হামবার্গার স্টেক পাওয়া যায়! একটা আছে ট্রেক্সাস রীতির। আর একটা ক্যালিফোর্নিয়ার। আর একটা আছে হাওয়াইয়ের ঘ্রাণঅলা। তারপর আছে জাপানি রীতির। ট্রেক্সাস রীতির হামবার্গারটা সাইজে বড় এই যা। হাওয়াইয়ের বার্গারটা আবার আনারসের টুকরো দিয়ে সাজানো হয়। ক্যালিফোর্নিয়ার রীতিটা কেমন ছিল মনে করতে

পারছি না। জাপানি স্টেক পরিবেশিত হয় মূলোর কুচো দিয়ে। রেস্তোরাঁটি আমার কাছে বেশ হাল ফ্যাশনের মনে হয়েছে। ওয়েট্রেসদের সবাই খুব সুন্দরী। তারা খাটো স্কার্ট পরে।

যদিও রেস্তোরাঁটির ভেতরকর সাজসজ্জা আর ওয়েট্রেসদের দেখতে যাইনি। ওখানে যাওয়ার একটাই উদ্দেশ্য আমার ছিল তা হচ্ছে ওখানকার প্রধান হামবার্গারগুলো চেখে দেখা। ওয়েট্রেসদেরকে সে কথাই বলেছিলাম। কিন্তু ওদের একজন ক্ষমা প্রকাশ করে জানাল যে, তাদের কাছে শুধু সাধারণ স্টেক আছে। ওদের দায়ি করা যায় না এ জন্য। কারণ মেনু নির্ধারণের দায়িত্ব ওদের নয়। তবে তার পরনের স্কার্টটা আবার এত খাটো নয় যে, কেউ কোনো জিনিস ফেলে দিয়ে নিচ থেকে তার প্যান্টি দেখার সুযোগ নিতে পারে। শেষতক হাওয়াই রীতির একটা হামবার্গারের অর্ডার পেশ করলাম। ওটা খাওয়ার সময় একজন ওয়েট্রেস আনারসের টুকরোগুলো ফেলে দেওয়ার পরামর্শ দিল। দুনিয়া একটা আজব জায়গা বটে। সত্যিকথা বলতে কী সাধারণ একটা হামবার্গার স্টেকই চেয়েছিলাম আমি। সে থাকগে, তুমি কেমন করে হামবার্গার স্টেক বানাও তাই বল আমাকে। তোমার চিঠি পড়ে ভেবেছি, তোমার বানানো স্টেক খেতে হবে একবার।

স্বয়ংক্রিয় টিকেট মেশিন সম্পর্কে যা লিখেছ তা ভাল লেগেছে। মনে হয়েছে কিছু উন্নতি ঘটেছে ওটার। দৃষ্টিভঙ্গিটা চমৎকার ছিল। তবে দৃশ্য আর অবস্থা দেখা সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে। হতে পারে তুমি জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছ। যা-ই বল না কেন একটা বাক্য দিয়ে তুমি গোটা পৃথিবী বদলে ফেলতে পারবে না।

লেখাটার সব দিক বিবেচনা করে তোমাকে ৭০ নম্বর দিয়েছি। আমার মনে হয় উন্নতি হচ্ছে লেখার। তাড়াহুড়ো করবার দরকার নেই কোনো। ধৈর্যধারণ কর। ভাল থেকো। তোমার পরের চিঠির প্রতীক্ষায় আছি। সে যা-ই হোক, বসন্ত জাগ্রত দ্বারে, তাই না? পাঁচমিশালী কুকি পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ। ওগুলো সত্যিই খুব ভাল। পত্রের বাইরে

সৌহার্দ্য যেহেতু নিষিদ্ধ কাজেই ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবে প্লিজ। বিস্কিট বা কুকির প্যাকেট ট্যাকেট পাঠিও না আর। ধন্যবাদ তোমাকে।

চিঠি শেষ করবার আগে তোমার স্বামীর নার্ভাসনেসের সমস্যার ব্যাখ্যা চমৎকারভাবে দিয়েছ বলে আমার ধারণা।

আমার ২২ বছর বয়সের সময় প্রায় এক বছর ওটাই ছিল আমার কাজ। পেন। সোসাইটি' নামে ছোট্ট একটা কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করেছিলাম। প্রতিটি চিঠি লেখার জন্য ২০০০ ইয়েন পেতাম। শিগগিরই মাসে গোটা ৩০টি চিঠি লেখা সম্ভব হয়েছিল। আমাদের কোম্পানির আদর্শবাণী ছিল- আপনিও এমন একখানা চিঠি লিখুন যা আপনার বন্ধু বা বান্ধবীর হৃদয়ের গভীরে প্রতিধ্বনিত হয়। মাসিক ফি দিয়ে ক্লায়েন্টরা প্রতি মাসে অন্তত চারখানা চিঠি লিখত। আমাদেরকে 'পেন মাস্টার' ডাকা হতো।

মহিলা পেন মাস্টাররা পুরুষদের কাছে আর পুরুষ পেন মাস্টাররা মেয়েদের কাছে লিখত। আমার সব ক্লায়েন্টই বয়সে আমার চেয়ে বড় ছিল। প্রায় ১৫ জনের বয়স ৪০ থেকে ৫৩'র মধ্যে, তবে অধিকাংশের বয়সই ছিল ২৫ থেকে ৩৫। লেখার প্রথম মাসটা খুব খারাপ গেছে। আমার সব ক্লায়েন্ট আমার চেয়ে ভাল লিখত? কারণ তারা লেখালেখিতে অভ্যস্ত ছিল। জীবনের ওই সময়টা পর্যন্ত চিঠি লেখাকে খুব একটা সিরিয়াসভাবে নেইনি।

তারপরও আমার সুনাম বাড়তে থাকে। ক্লায়েন্টরাই বলেছে এ কথা। তবে মাস তিনেক পর আমার লিখবার ক্ষমতা নেতৃত্বদানের' পর্যায়ে চলে যায়। এইসব মহিলাদের সাহায্য করে যে আস্থা অর্জন করি তাতে এক ধরনের অদ্ভুত অনুভবের সঞ্চার হয় আমার ভেতর। তারা বিশ্বাস করে আমাকে আর আমার নির্দেশনায় আস্থা রাখে। সেই সময় ব্যাপারটা বুঝতাম না। পরে বুঝেছিলাম ওই মহিলারা ছিল নিঃসঙ্গ। তাদের কাছে কারা চিঠি লিখত এটা কোনো ব্যাপারই ছিল না। আর কী তারা লিখত তাতেও কিছু আসত

যেত না। হতে পারে আমাদের সবারই ওই প্রয়োজনটুকু ছিল। প্রয়োজন ছিল ক্ষমার কিংবা কারও সঙ্গে সুখ-দুঃখের অনুভূতি ভাগ করে নেওয়ার।

ওভাবেই শীত আর বসন্ত অতিক্রান্ত হয়, একুশ পেরিয়ে বাইশে পড়ি আমি। চারদিকে তখন চিঠি আর চিঠি।

নানা ধরনের চিঠির উত্তর লিখতে হয়েছে। বিরক্তিকর সব চিঠি, খুশি আর দুঃখে ভরা চিঠির উত্তরও লিখেছি। ওখানে মাত্র এক বছর কাজ করলেও মনে হয়েছে তিন বছর কাজ করেছি। চাকুরি ছেড়ে দেওয়ার নোটিশ দিলে আমার ক্লায়েন্টরা দুঃখ প্রকাশ করেছে। তবে কথা কী, ওখানে আমি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। কোনো কারণ খুঁজে পাইনি। তবে চাকুরিটা ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে আমার নিজেরই নানান উদ্বেগ- আশংকা ছিল। বুঝেছিলাম এতগুলো সৎ ও ভাল মানুষের সঙ্গে মেশার দ্বিতীয় সুযোগ আর পাব না।

হামবার্গার স্টেক এর কথা বলতে বলতে, শেষ পর্যন্ত ওই মহিলার বানানো (প্রথম চিঠি থেকে) একটা স্টেক খেয়েছিলাম। তার বয়স ৩২। কোনো ছেলেপুলে নেই। স্বামী বিশ্বের ৫ম বিখ্যাত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। মাসের শেষের দিকে চাকুরি ছাড়ার কথা জানালে ওই মহিলা তার বাড়িতে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ করে আমাকে। সে কথা দেয় একটা আসল হামবার্গার স্টেক বানাবে। কোম্পানির নীতির বাইরে হলেও তৎক্ষণাত তার প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলাম। ব্যাপারটা হলো কী কৌতূহল দমন করতে পারছিলাম না। ওটাচু ট্রেন লাইনের কাছে ছিল তার অ্যাপার্টমেন্টটা। ওটা ছিল বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর ছিমছাম। বাচ্চাকাচ্চা নেই এমন দম্পতিদের জন্য উপযুক্ত। ঘরের আসবাবপত্র আর ভেতরকার সাজসজ্জা সুন্দর। তার গায়ের স্যুয়েটারটা দামি না হলেও দেখতে ছিল চমৎকার। আমার প্রত্যাশার চেয়েও বয়স কম ছিল তার। আমার তারুণ্য মুগ্ধ করেছিল তাকে। আমাদের কোম্পানির পলিসিতে বয়স প্রকাশ না করবার

বিধান ছিল।

অচিরেই আমরা আয়েশ করে কথাবার্তা বলতে লাগলাম। মনে হলো একই ট্রেন মিস করবার পর আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়েছে আর আমরা পরবর্তী ট্রেনের প্রতীক্ষায় আছি। আমরা স্টেক আর কফি খেলাম। আবহাওয়াটাও ছিল চমৎকার। তার চারতলা অ্যাপার্টমেন্টের জানালা থেকে ট্রেন দেখা যায়। হামবার্গার স্টেকটা খেতে খুব মজা ছিল। পরিমাণ মতো মশলা দেওয়া হয়েছিল আর রসালও ছিল। মাংসের ঝোলও ঠিক মতো মেশানো হয়েছিল। কফি শেষ করে জীবনের গল্প বলেছিলাম। বলার মতো তেমন কিছুই ছিল না আমার, ফলে সে-ই বেশি কথা বলেছিল। সে আমাকে জানাল, ছাত্রী থাকাকালে সে লেখক হতে চেয়েছিল। ফ্রাসোয়া সাগার ভক্ত ছিল সে। তার লেখা 'ডু ইউ লাইক ব্রাহ্ম' ছিল ওর প্রিয় বই। তবে এমন নয় যে, আমি সাগার লেখা পছন্দ করি না। ভালই লেখেন। লোকেরা অবশ্য বলে তার লেখা বিরক্তিকর। তাদের সঙ্গে একমত নই আমি।

"কিন্তু কিছুই লিখতে পারি না," বলল সে।

আমি বললাম, "সময় তো যায়নি।"

"কিন্তু তুমি-ই বলেছিলে ভাল লিখতে পারি না আমি।" হেসে বলল।

আমিও হাসি। ২২ বছর বয়সের সময় খুব হাসতাম।

"আমার মনে হয় তোমার লেখায় যথেষ্ট বাস্তবতা আছে।" সে কিছু না বললেও এক ঝলক মৃদু হাসি তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। "তোমার চিঠি পড়ে আমার মনে হয়েছে তোমার বানানো একটা হামবার্গার স্টেক খাওয়া উচিত।"

সে হেসে বলল, "সম্ভবত ক্ষুধার্ত ছিলে তুমি।"

আমারও তাই মনে হয়েছে।

তখন ঘটাং ঘটাং শব্দ করে একটা ট্রেন চলে যেতে দেখলাম। হঠাৎ আমার মনে হলো ৫ টা বাজে। চলে যেতে হবে আমাকে। তার কাছে ক্ষমা চেয়ে উঠতে উদ্যত হলাম। বললাম, "তোমার স্বামী শিগগিরই এসে পড়বে, ধারণা করি ডিনার তৈরিতে বসতে হবে তোমাকে।"

"সে বরাবরই দেরিতে আসে," বলল সে, "মধ্যরাতের আগে সে ঘরে ফেরে না।"

"খুব ব্যস্ত মানুষ নিশ্চয়ই।"

"আমারও তাই মনে হয়, একটুখানি দ্বিধা নিয়ে সে বলল,

"চিঠিতে তো লিখেছিলাম আমাদের ভেতর বনিবনার অভাব।" এ কথার কোনো জবাব আমার কাছে ছিল না।

"তাতে অসুবিধা নেই," কোমল স্বরে সে বলল। আমারও তাই মনে হয়েছে।

"এত সব সুন্দর চিঠি লেখার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। ওগুলো বেশ উপভোগ করেছি।"

বললাম, "আমিও। হামবার্গার স্টেকের জন্য ধন্যবাদ।"

.

দশ বছর পরে ওটাচু লাইন দিয়ে ট্রেনে যাওয়ার সময় তার ওই হামবার্গার স্টেকের কথা আমার মনে পড়ে যায়। তার অ্যাপার্টমেন্টের জানালাটি খুঁজে বের করা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। তবে বিস্ময়ের সঙ্গে ভেবেছিলাম সে কি এখনও একা, বসে বসে বার্ট বাখারাচের সঙ্গীত শুনছে?

আপনার কি মনে হয় ওই মহিলার সঙ্গে বিছানায় যাওয়া উচিত ছিল আমার?

এটাই হচ্ছে এই গল্পের আসল ব্যাপার। আমারও জানা নেই ব্যাপারটা। যতই দিন যাচ্ছে, অনেক বেশি বেশি জিনিস আমার বোঝার বাইরে চলে যাচ্ছে...।

এপ্রিলের এক চমৎকার সকালে ১০০ ভাগ মানানসই মেয়েটিকে দেখে

এপ্রিলের এক চমৎকার সকালে ১০০ ভাগ মানানসই মেয়েটিকে দেখে

এপ্রিলের এক মনোরম সকালে টোকিওর ফ্যাশনদুরস্ত হারুজুকু এলাকার এক সরু গলিতে আমি শতকরা ১০০ ভাগ মানানসই মেয়েটির সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলাম।

সত্যি কথা বলতে কি, দেখতে তেমন একটা ভাল ছিল না মেয়েটি। কোনো দিক থেকেই আহামরি কিছু নয়। কাপড় চোপড়েও তেমন একটা বিশেষত্ব ছিল না। চুলটুলও কেমন যেন অগোছালো হয়ে আছে। যুবতী বলা যাবে না তাকে। বয়স তিরিশের কাছাকাছি, আবার ঠিক 'মেয়ে' বললেও যথার্থ হবে না কথাটি। তারপরও, পঞ্চাশ গজ দূর থেকে আমার মনে হলো, এই মেয়েটি শতকরা ১০০ ভাগ মানানসই আমার জন্য। ওকে দেখা মাত্র হৃদকম্পন শুরু হলো, মুখ টুখ শুকিয়ে একেবারে মরুভূমি।

আপনার নিজেরও হয়ত একটা নির্দিষ্ট ধরনের মেয়ে পছন্দ- যার পায়ের গোছা হালকা পাতলা, কিংবা ঢেলা ঢেলা তার চোখ, চাপার কলির মতো সরু সরু আঙ্গুল অথবা উপযুক্ত কোনো কারণ ছাড়াই আকৃষ্ট হন সেইসব মেয়ের প্রতি যারা খুব আস্তে আস্তে খায়। আমার নিজেরও পছন্দ-অপছন্দ আছে। কখনো-কখনো এমন হয়েছে। যে,

রেস্তোরাঁয় গেছি খেতে, তখন পাশের টেবিলের মেয়েটির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকেছি শুধুমাত্র মেয়েটির নাকের গড়ন ভাল লেগেছে বলে।

তবে কেউ-ই হলপ করে বলতে পারবে না যে, তার জন্য ১০০ ভাগ মানানসই মেয়েটি কেমন ছিল তা আগে থেকেই জানা ছিল তার। নাক আমার খুব পছন্দের একট জিনিস; কিন্তু তার নাকের গড়ন কেমন ছিল মনে করতে পারব না কিংবা আদৌ তার নাক ছিল কিনা তা-ও খেয়াল নেই আমার। তবে নির্ঘাত মনে আছে সে তেমন একটা সুন্দরী নয়। আজব ব্যাপার আর কি!

“গতকালই রাস্তায় আমার জন্য ১০০ ভাগ মানানসই একটা মেয়েকে দেখেছি।” একজনকে বললাম।

“ও তাই নাকি,” বলল সে, “দেখতে সুন্দর তো?”

“তেমন একটা না।”

“যেমনটা তোমার পছন্দ সে রকম তো?”

“জানি না রে ভাই। তার কোনো কিছুই মনে নেই। তার চোখের গড়ন কিংবা ধরো স্তনের সাইজ।”

“আশ্চর্য কথা।”

“আশ্চর্য-ই বটে।”

“সে যাকগে,” এর মধ্যেই সে তিতিবিরক্ত, “কী করলে শেষাবধি? কথা বলেছ? পিছু নিয়েছিলে?“

“নাহ্। শুধু পাশ কাটিয়ে গেছি।”

সে পুব থেকে পশ্চিমে যাচ্ছিল আর আমি পশ্চিম থেকে পুবে। এপ্রিলের সকালটি সত্যিই খুব মনোরম ছিল।

কথা বলা যেত তার সঙ্গে। আধা ঘন্টাই যথেষ্ট ছিল। ওর নিজের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে পারতাম, বলতে পারতাম আমার কথাও। আর সত্যিই যা চাইছিলাম তা হচ্ছে ওকে বুঝিয়ে বলা- কেমন জটিলভাবে আমাদের নিয়তি ১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসের এই চমৎকার সকালে হারুজুকুর রাস্তায় আমাদের পাঠাল একে অপরের পাশ দিয়ে যাবার জন্য। নির্ঘাত উষ্ণ সব গোপনীয়তায় ভরা যেন পৃথিবী যে সময় শান্তিতে ভরপুর ছিল সেই সময় তৈরি একটা অ্যান্টিক ঘড়ি।

কথাবার্তা শেষ করে আমরা কোথাও গিয়ে লাঞ্চ সারতে পারতাম, দেখতে পারতাম উডি অ্যালেনের কোনো ছবি।

একটুখানি ককটেল পান করার জন্য কোনো হোটেলের বার-এ গিয়েও বসা। যেত, আর বরাত ভাল হলে বিছানা অবধি গড়াতে পারত ব্যাপারটা।

হৃদয়ের দুয়ারে নানান সম্ভাবনা কড়াঘাত করছিল। আমাদের ভেতর তখন দূরত্ব কমে এসে পনের গজে দাঁড়িয়েছে।

মনের কথাটা বলি কী ভাবে? বলবই-বা কী?

“সুপ্রভাত। একটুখানি কথা বলার জন্য আধা ঘন্টা সময় কি হবে?”

দুর, নেহাতই হাস্যকর। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির দালালদের মতো লাগছে কথাটা।

“মাফ করবেন, সারারাত খোলা থাকে এরকম কোনো লন্ড্রি কি চেনা আছে আপনার?”

না, এটাও একই রকম হাস্যকর। লন্ড্রিতে দেয়ার মতো কোনো কাপড়-চোপড়ও নেই আমার সঙ্গে।...

সহজভাবে সত্যি কথাটাই বলা উচিত। "সুপ্রভাত, আমার জন্য আপনি শতকরা ১০০ ভাগ মানানসই একটি মেয়ে।"

না, কথাটা বিশ্বাসই করবে না সে। বিশ্বাস করলেও হয়ত কথা বলতে চাইবে না। আমার সাথে। বলে বসতে পারে আমি আপনার জন্য ১০০% মানানসই হলেও আপনি আমার ১০০ ভাগ মানানসই ছেলে নন। বলতেও পারে সে এমন কথা। তাহলে তো আমি ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাব। ওই আঘাত কোনো দিনও কাটিয়ে উঠতে পারব না। বয়স এখন আমার বত্রিশ, দিনে দিনে বাড়ছে তা।

একটা ফুলের দোকানের সামনে এসে আমরা একে অপরকে অতিক্রম করলাম। একটুখানি হালকা বাতাস আমার ত্বক ছুঁয়ে গেল। পায়ের নিচের অ্যাসফল্ট ভিজে, নাকে এল গোলাপের ঘ্রাণ। কথা বলার জন্য কিছুতেই অগ্রসর হতে পারলাম না। সাদা একটা সোয়েটার পরে আছে সে, ডান হাতে ধরা একটা আনকোরা এনভেলাপ, শুধু ডাকটিকেট লাগানো নেই। কাউকে চিঠি লিখেছে, হয়ত রাতটাই কাবার করে দিয়েছে লিখতে লিখতে। চোখের ঘুমঘুম চাহনি থেকেই আঁচ করা যাচ্ছে ব্যাপারটা।

ওর তাবৎ গোপন কথা হয়ত ভরা আছে ওই খামে।

কয়েক পা এগিয়েই পেছনে ফিরি। ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে মেয়েটা। এখন একদম ঠিকঠিক জানি ওকে কী বলা উচিত ছিল। দীর্ঘ একটা বক্তিমেই হয়ে যেত হয়ত, এত দীর্ঘ যে গুছিয়ে গাছিয়ে বলতেই পারতাম না। যেসব আইডিয়া আমার মাথায় আসে কখনোই তা খুব কেজো হয় না।

শুনুন তাহলে। আমার কথা শুরু হতে পারত এই ভাবে "অতীতে কোনো এক সময়।"

আর শেষ হতো, “একটা দুঃখের কাহিনী, কী বলেন?”

অতীতে কোনো এক সময়ে এক দেশে ছিল একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। ছেলেটির বয়স ছিল আঠারো আর মেয়েটির ষোলো। ছেলেটি আহামরি হ্যান্ডসাম ছিল না, মেয়েটিও ছিল না নজরকাড়া সুন্দরী। অন্য দশজনের মতো তারাও ছিল সাধারণ ছেলে আর মেয়ে। তবে তারা দু’জনেই অন্তরের অন্তস্থল থেকে বিশ্বাস করত যে, পৃথিবীর কোথাও-না-কোথাও ওদের জন্য যথাক্রমে ১০০ ভাগ মানানসই মেয়ে আর ১০০ ভাগ মানানসই ছেলের অস্তিত্ব আছে। হ্যাঁ, দৈবে বিশ্বাস করত তারা, আর সেই দৈব ঘটনাটি ঘটলো।

একদিন এক রাস্তার মোড়ে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হলো দু’জনের। “খুবই আশ্চর্য ব্যাপার,” ছেলেটি বলল, “সারা জীবন ধরে খুঁজছি তোমাকে। হয়ত বিশ্বাস হবে না তোমার। তবে জেনে রাখ, তুমিই আমার জন্য ১০০ ভাগ মানানসই একটা মেয়ে।”

“আর তুমি,” মেয়েটি বলল তাকে, “তুমিও আমার জন্য ১০০ ভাগ মানানসই পুরুষ। ঠিক যেভাবে আমার মনের মধ্যে তোমাকে চিত্রিত করেছিলাম। স্বপ্নের মতো।”

হাত ধরাধরি করে তারা একটা পার্কের বেঞ্চে গিয়ে বসল আর ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে নিজেদের গল্প বলতে লাগল। এখন আর নিঃসঙ্গ নয় তারা। ১০০ ভাগ কাঙ্ক্ষিত মানুষের দেখা পেয়েছে দু’জন। ১০০ ভাগ মানানসই সাথী খুঁজে পাওয়া কতই না আনন্দের। একেবারে অলৌকিক ব্যাপার। একটা মহাজাগতিক দৈব।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ করেই সন্দেহের এক চিলতে মেঘ উঁকি দিল ওদের হৃদয়ে। এত সহজে সত্যি হয়ে যাওয়া স্বপের ভেতর গোলমাল নেই তো কোনো?

তাদের আলাপে একটুখানি বিরতি ঘটতেই ছেলেটি মেয়েটিকে বলল, “চলো, শুধু একটি বারের জন্য আমরা নিজেদের পরীক্ষা করি। আমরা যদি সত্যিই একে অপরের জন্য

১০০ ভাগ মানানসই ও যথার্থ প্রেমিক-প্রেমিকা হয়ে থাকি তাহলে কোনো-না-কোনো সময়, কোথাও-না-কোথাও আবার আমাদের দেখা হবে। আর যখন তা হবে আমরা জানব ব্যাপারটা আসলেই ঠিক- সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে করে ফেলব। তুমি কী বল?"

মেয়েটি বলল, "এটাই করা উচিত আমাদের।"

অতএব পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল তারা। ছেলেটি গেল পশ্চিমে আর মেয়েটি পুবে।

দুজনের সম্মতিক্রমে যে-পরীক্ষাটা হলো আসলে তার কোনো দরকারই ছিল না। এ কাজটি করা আদৌ উচিত হয়নি তাদের। কেননা, আদতেই ওরা ছিল একে অপরের জন্য ১০০ ভাগ মানানসই প্রেমিক-প্রেমিকা, দৈবক্রমে ওদের মধ্যে দেখা হয়েছিল। কিন্তু বিষয়টা অনুধাবন করা একেবারেই অসম্ভব ছিল ওদের জন্য কারণ তাদের বয়স ছিল কম। ভাগ্যের শীতল, নির্লিপ্ত ঢেউ দু'জনকে নির্মমভাবে দুদিকে নিক্ষেপ করল।

এক শীতে ছেলেটি আর মেয়েটি দু'জনেই মৌসুমের ভয়াল ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হলো। জীবন-মৃত্যুর সাথে সপ্তাহ কয়েকের লড়াইয়ের পর তারা হারিয়ে ফেলল বিগত বছরগুলোর সব স্মৃতি। জ্ঞান যখন ফিরল মাথার ভিতরটা একদম ফাঁকা, ডি. এইচ. লরেন্সের বালকবেলার টাকা জমানোর শূকরাকৃতির পাত্রের মতো।

তারা দুজনেই ছিল বুদ্ধিদীপ্ত, দৃঢ়চেতা যুবক-যুবতী। নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করল সেইটুকু জ্ঞান আর বোধশক্তি যার বলে তারা আবার সমাজের পুরোদস্তুর নাগরিক হয়ে উঠতে পারে। বিধাতার কৃপায় এখন তারা সুস্থসবল ও বলিষ্ঠ নাগরিক। তারা জানে কী করে এক সাবওয়ে থেকে আর এক সাবওয়েতে ট্রেন বদল করতে হয়। পোস্ট অফিসে বিশেষ ডেলিভারি চিঠি পাঠাতেও সক্ষম তারা। এমন এপ্রিলের এক চমৎকার সকালে ১০০ ভাগ মানানসই মেয়েটিকে দেখে কি প্রেমানুভূতিরও সঞ্চার হলো

তাদের ভেতর, তা ধরুন কখনো-কখনো ৭৫% থেকে ৮৫% তো বটেই।

সময় বয়ে যায় প্রচণ্ড বেগে। শিগগিরই ছেলেটার বয়স বত্রিশে গিয়ে দাঁড়ায় আর মেয়েটার ত্রিশে।

এপ্রিলের এক সুন্দর সকালে দিবসের কাজ শুরু করার আগে কফির খোঁজে ছেলেটা হাঁটছিল পশ্চিম থেকে পুবে আর মেয়েটা বিশেষ-ডেলিভারি চিঠি পাঠানোর। জন্য যাচ্ছিল পুব থেকে পশ্চিমে। দু'জনেই হাঁটছিল টোকিওর হারুজুকু এলাকার একটা সরু পথ ধরে। রাস্তার ঠিক মাঝখানটাতে একে অপরকে অতিক্রম করল। তারা। হারানো স্মৃতির একটা ম্লান রশ্মি মুহূর্তের জন্য আলো ছড়াল ওদের হৃদয়ে। দু'জনের বুকেই বেজে উঠল গুরু গুরু তান। তারা জানে?

মেয়েটি আমার জন্য ১০০ ভাগ মানানসই।

ছেলেটি আমার জন্য ১০০ ভাগ মানানসই।

কিন্তু তাদের স্মৃতির আভা তখন খুবই ক্ষীণ। ভাবনায় চোদ্দ বছর আগের সেই। স্বচ্ছতা আর নেই। কোনো কথা না বলে একে অপরকে অতিক্রম করে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল তারা। চিরদিনের জন্য।

কি দারুণ মন খারাপ করিয়ে দেয়া একটা গল্প, তাই না? হ্যাঁ, এটাই। এই কথাটা তাকে বলা উচিত ছিল আমার।

কিডনি আকারের পাথর যেটি রোজই চলাফেরা করে

কিডনি আকারের পাথর যেটি রোজই চলাফেরা করে

জুনপেইর বয়স যখন মাত্র ১৬ তার বাবা এক চমকপ্রদ ঘোষণা দিয়েছিলেন। বাপ বেটার শরীরে একই রক্ত প্রবাহিত হলেও তারা দুজন একে অপরের কাছে তাদের মনের দুয়ার মেলে ধরে না।

“সারা জীবনে একজন মানুষের সান্নিধ্যে যে নারীরা আসে তার মধ্যে মাত্র তিনজনের জন্য সত্যিকার অর্থ সে খুঁজে পায়, কমও না বেশিও না।” বলেছিল জুনপেইর বাবা। বরং বলা ভাল ঘোষণা করেছিল। খুব শীতলভাবে কথাটা বললেও প্রচন্ড দৃঢ়তা ছিল তার মধ্যে।

“সম্ভবত তুমি অনেক নারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে, তবে ভুল নারী পছন্দ করলে বিস্তর সময় নষ্ট হবে তোমার। কথাটা মনে রেখ।” বলেছিল তার বাবা।

পরে জুনপেইর তরুণ হৃদয়ে প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছিল, ওই তিন রমণীর সঙ্গে কী এর মধ্যেই বাবার দেখা হয়েছে? আমার মা কী তার একজন? তা-ই যদি হয়ে থাকে, তবে বাকি দু’জনের কী হয়েছে? কিন্তু বাবাকে সে এসব কথা জিজ্ঞেস করতে পারেনি।

.

১৮ বছর বয়সের সময় জুনপেই টোকিওর একটা কলেজে ভর্তি হয়। সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে বেশ ক'জন মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে সে, যার মধ্যে একজনের জন্য সত্যিকার অর্থ খুঁজে পেয়েছিল। নিজের অনুভূতি প্রকাশ করার (ওটা প্রকাশ করতে অন্য লোকের চেয়ে তার সময় বেশি লাগে) আগেই মেয়েটি তার এক পরম বন্ধুকে বিয়ে করে আর অচিরেই মা হয়। ফলে আপাতত মেয়েটিকে তালিকা থেকে বাদ রাখতে হয়। মনটাকে শক্ত করে সেখান থেকে ঝেড়ে ফেলতে হয় তার নাম। ফলে তার বাবার তত্ত্ব অনুসারে তার তিন নারীর মধ্যে বাকি থাকে আর দু'জন।

যখনই নতুন কোনো মেয়ের সঙ্গে জুনপেইর দেখা হয়, সে ভাবে সত্যিই কি এই নারী তার জীবনের সত্যিকার কোনো অর্থ রাখে? আর এই প্রশ্ন তার মনে উভয় সংকটের জন্ম দেয়।...

নতুন কোনো মেয়ের সঙ্গে কয়েক মাস থাকার পর তার চরিত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সে অবহিত হয়, তোক তা তুচ্ছ কিংবা অকিঞ্চিতকর। এসব বেদনা তাকে অসন্তুষ্ট করে বা স্নায়ুকে স্পর্শ করে, হৃদয়ের নিভৃত কোণে সে বেদনা থেকে পরিত্রাণ অনুভব করে। এর ফলে একটার পর একটা মেয়ের সঙ্গে সিদ্ধান্তহীন সম্পর্ক বজায় রাখার একটা প্যাটার্ন দাঁড়িয়ে যায় তার ভেতর।

জুনপেই ঠিক নিশ্চিত নয় তার ওই শক্তি কি তার সহজাত চরিত্র থেকে উৎসারিত না পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে জন্ম নিয়েছে। পরেরটা যদি হয় তাহলে বলতে হয় এটা তার বাবার অভিশাপেরই ফল। কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন নেয়ার সময় বাবার সঙ্গে তার প্রচণ্ড বচসা হয়, আর তার সঙ্গে সব যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু অদ্যাবধি 'তিন নারী তত্ত্বটির পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা সে পায়নি। একটা পর্যায়ে এসে সে হাস্যোচ্ছলেই সমকামীতে পরিণত হওয়ার কথা ভাবে। যাতে সে ওই হাস্যকর উল্টো-গণনার হাত

থেকে পরিত্রাণ পায়। ভাল হোক খারাপ হোক মেয়েরাই জুনপেইর একমাত্র যৌনাগ্রহের বিষয়।

.

পরবর্তী যে-মেয়েটার সঙ্গে জুনপেইর মোলাকাত হয় তার বয়স ছিল ওর চেয়ে বেশি। মহিলার বয়স ৩৬, আর ওর ৩১। জুনপেইর এক পরিচিত লোক মধ্য টোকিওর বাইরের দিকের একটা জায়গায় ফরাসি রেস্তোরাঁ খুলেছিল। সে উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দাওয়াত হয়েছিল তার। সামার স্পোর্টস জ্যাকেটের সঙ্গে ম্যাচ করে গাঢ় নীল রঙের পেরি এলিস শার্ট গায়ে দিয়েছিল সে। ওই পার্টিতে এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা ছিল তার; কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে সাক্ষাৎকার বাতিল করে। ফলে কথা বলার কোনো লোকই সে পাচ্ছিল না। বারে বসে একা সে বড় এক গ্লাস মদ পান করছিল। সে ওখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে আমন্ত্রণকারী পরিচিত ভদ্রলোককে খুঁজতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। তখনই দীর্ঘাঙ্গী এক মহিলা সেখানে এসে হাজির হয়। তাকে দেখে জুনপেইর প্রথম ভাবনা ছিল, গর্বিত অঙ্গভঙ্গির এক মেয়ের প্রবেশ ঘটেছে এখানে।

বারের কাউন্টারে কনুই রেখে সে বলল, “এখানকার একজনের কাছে শুনলাম আপনি লেখক। সত্যি নাকি?”

“তা-ই তো মনে হয়।”

“কয়টা বই বেরিয়েছে আপনার?”

“দু’টি গল্প সংকলন আর একটা অনুবাদের। খুব একটা বিক্রি হয়নি অবশ্য।”

জুনপেইকে আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে মৃদু হাসল সে। আপাতদৃষ্টিতে সন্তুষ্ট বলেই

মনে হলো তাকে।

“চমৎকার। সত্যিকার কোনো লেখকের সাথে এটাই আমার প্রথম মোলাকাত।” সে বলল।

“আমি হয়ত খানিকটা হতাশ করব আপনাকে,” বলল জুনপেই, “একজন পিয়ানোবাদক আপনাকে সুর বাজিয়ে শোনাতে পারবে, একজন চিত্রকর এঁকে দেখাতে পারবে, কিংবা ধরুন একজন জাদুকর, সে জাদু দেখিয়ে মুগ্ধ করতে পারবে আপনাকে। কিন্তু একজন লেখকের পক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে এসব কিছুই করা সম্ভব নয়।”

“সে আমি জানিনে, তবে আমি আপনার মধ্যেকার অলৌকিক আভা কিংবা ওই জাতীয় কিছু একটা উপভোগ করতে পারছি।”

“অলৌকিক আভা?”

“বিশেষ ধরনের আলোর দীপ্তি সাধারণ লোকের ভেতর খুঁজে পাওয়া যায় না।”

“রোজ শেভ করার সময় আয়নার দিকে তাকাতে হয়; কিন্তু এ ধরনের কিছু তো চোখে পড়েনি আমার।”

সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসে। বলে, “কী ধরনের গল্প লেখেন আপনি?”

“লোকেরা প্রায়ই এ কথাটা জিজ্ঞেস করে; কিন্তু আমার গল্প নির্দিষ্ট কোনো গোত্রে পড়ে না।” ঠোঁটে আঙ্গুল বুলিয়ে সে বলে, “আমার মনে হচ্ছে আপনি বলতে চাচ্ছেন সাহিত্য পদবাচ্যের গল্প কাহিনী রচনা করেন আপনি।”

“হয়ত তা-ই। এক ধরনের ঘটনার বিবরণমূলক পত্র বলতে পারেন আর কি।”

সে আবার হাসে। জিজ্ঞেস করে, “আপনার নামটা জানতে পারি কি?”

“সাহিত্য পত্রিকা পড়ার অভ্যাস আছে আপনার?” সে একটুখানি মাথাটা ঝাঁকায়।

“তাহলে তো আমার নাম জানাটা কষ্টকর। আমি তেমন একটা পরিচিত লেখক নই।”

তার অনুমতি না নিয়েই জুনপেইর পাশের টুলে বসে পড়ে সে। গ্লাসের শেষ পানীয়টুকু গলাধঃকরণ করে বলে, “আমার নাম কিরি।”

জুনপেই অনুমান করে সে ওর চেয়ে ইঞ্চিখানেক কিংবা তার চেয়ে বেশি লম্বা। গায়ের রঙ তামাটে, চুল ছোট, মাথার আকৃতি চমৎকার। বিবর্ণ সবুজ লিনেন জ্যাকেট তার গায়ে, হাত কনুই অবধি গোটানো। হাঁটু সমান স্কার্ট। জ্যাকেটের নিচে পড়েছে সূতির ব্লাউজ। তার স্তন খুব ছোট নয় আবার বড়ও নয়। পোশাকে স্টাইলের প্রবল প্রভাব। সব মিলিয়ে ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে সেখানে। ঠোঁট পুরুষ্টু। কোনো কিছু ভাবার জন্য থামলে তার চওড়া কপালে তিনটি সমান্তরাল ভাঁজ পড়ে। ভাবনা শেষ হলে ভাঁজগুলো থাকে না।

জুনপেই এ ব্যাপারে সচেতন যে, সে তার প্রতি আকৃষ্ট। ব্যাখ্যা করা যায় না তবে খুব অনড় একটা ব্যাপার তাকে উত্তেজিত করে তোলে। হঠাৎই সে খেয়াল করে তার গলা শুকিয়ে গেছে। তখন সে একজন ওয়েটারকে ডেকে খানিকটা মদের অর্ডার দেয়। আর আগের মতো ভাবতে বসে এই মেয়েটি কি তার জীবনে বিশেষ অর্থ বয়ে আনবে। সে কি বাকি দু’জনের একজন? এই মেয়ে কি তার জীবনের দ্বিতীয় সুযোগ? তাকে কি চলে যেতে দেবে, না ঝুলে পড়বে?”

“আপনি কি সব সময় লেখক হতে চেয়েছেন?” বলল কিরি।

“হু। যা হতে চাই তার বাইরে আর কিছুই ভাবিনি।”

“তাহলে তো বলতেই হয় আপনার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিয়েছে।”

জুনপেই তার হাত প্রসারিত করে বলল, “অবাক কাণ্ড। আমি সব সময়ই। একজন মহৎ লেখক হতে চেয়েছি।”

“তা বয়স কত আপনার?”

জুনপেই যে তার চেয়ে বয়সে ছোট তাতে ওর কিছুই যায় আসে না। জুনপেইও কিছু মনে করে না তাতে। তরুণীদের চেয়ে সে বরং একটু বয়সী মেয়েদের পছন্দ করে। বয়স্কদের সাথে সম্পর্ক ছেদ করা সহজ।

জুনপেই বলল, “তা কী কাজ করেন আপনি?” এ কথায় তার ঠোঁট সোজা হয়ে এল আর এই প্রথমবারের মতো তার অভিব্যক্তিতে আন্তরিকতা ফুটে উঠল।

“আমি কোন ধরনের কাজ করি বলে আপনার ধারণা?”

জুনপেই তার মদের গ্লাসটি একটুখানি কঁকিয়ে নিয়ে বলল, “সামান্য ইঙ্গিত কি পেতে পারি?”

“না কোনো আভাস দেয়া যাবে না। এটা বলা কি এতো কঠিন? সব কিছু পর্যবেক্ষণ আর বিচার করাই তো আপনার কাজ।”

“ঠিক তা নয়। একজনকে বার বার পর্যবেক্ষণ করতে হয় আর শেষ সম্ভাব্য মুহূর্ত পর্যন্ত বিচার করে যেতে হয়।”

“নিশ্চয়ই। তাহলে পর্যবেক্ষণ করতে থাকুন তারপর প্রয়োগ করুন আপনার কল্পনাশক্তি। তাহলে তা আপনার পেশার নৈতিকতার সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি করবে না।”

জুনপেই তার চোখ তুলে কিরির দিকে তাকাল আর নতুন অভিনিবেশ দিয়ে তার মুখমণ্ডল পরীক্ষা করতে লাগল এই আশায় যে, ওখানে সে কোনো গোপন চিহ্ন পেয়ে যাবে। জুনপেই সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকাল। সে-ও তাই করল।

একটুখানি থেমে জুনপেই বলল, "আমার মনে হয় আপনি কোনো ধরনের একজন পেশাজীবী। আপনি যে কাজটি করেন সবার পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। ওটা করার জন্য বিশেষ অভিজ্ঞতার দরকার পড়ে।"

"ষাঁড়ের চোখ দেখছি! আর একটু বিশদ বলা যায় না?"

"সঙ্গীত বিষয়ক কিছু একটা?"

"না।"

"ফ্যাশন ডিজাইন।"

"হলো না।"

"তাহলে টেনিস?"

"এবারও হলো না।" কিরি বলল।

জুনপেই মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, "বেশ। আপনার গায়ের রঙ তামাটে। শক্তপোক্ত শরীরের গড়ন, হাতের মাসলগুলোও খুব দৃঢ়। মনে হয় আউটডোর স্পোর্টস করেন। তবে মনে হয় না আপনি কোনো শ্রমিক।"

কিরি তার হাত দুটো কাউন্টারের ওপর স্থাপন করে বলল, "কাছাকাছি চলে এসেছেন আপনি।"

“কিন্তু ঠিক উত্তরতো দিতে পারিনি এখনো।”

“ছোট কিছু জিনিস গোপন রাখা জরুরি, বলল কিরি, “পেশাগত ফুর্তি থেকে বঞ্চিত রাখতে চাইনে আপনাকে... একটা ইঙ্গিত অবশ্য দেব। আপনার বেলায় এটা আমার জন্যও একই ব্যাপার।”

“একই ব্যাপার কেমন করে?”

“মনে হচ্ছে আমার পেশাটা এমন যা আমি খুব ছোটবেলা থেকেই হতে চেয়েছি। আপনার মতো। তবে ওখানে পৌঁছা খুব সহজ ছিল না আমার জন্য।”

“ভাল। ভাল। সেটা গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। কাজটি হতে হবে ভালবাসার, সুবিধার বিয়ের মতো নয়।”

“ভালবাসার কাজ,” কিরি বলল, “ওটা একটা চমৎকার রূপক বলতে পারেন।”

“আপনার কি মনে হয় আমি আপনার নাম শুনেছি?”

“সম্ভবত না, আমি এতোটা জনপ্রিয় নই।”

“বেশ। সবাইকেই কোথাও-না-কোথাও থেকে শুরু করতে হয়।”

“তবে আমার ব্যাপারটা আপনার থেকে একটু ভিন্ন। শুরু থেকেই আমি পূর্ণ শুদ্ধতা প্রত্যাশা করেছিলাম। কোনো ভুল করার অবকাশ ছিল না। শুদ্ধতা- নাহলে কিছুই না। দ্বিতীয় কোনো চয়েস ছিল না।”

“ওটা তো তাহলে আর একটা ইঙ্গিত।”

কিরি বলল, “হতেও পারে।”

একজন ওয়েটার শ্যাম্পেনের ট্রে হাতে করে ওখান দিয়ে যাচ্ছিল। কিরি দুটো গ্লাস তুলে নিয়ে নিজে একটা নিল আর একটা দিল জুনপেইকে। তারা গ্লাস ঠোকাঠুকি করল। কিরি বলল,"সে যাকগে, আপনি কি বিবাহিত?" জুনপেই মাথা নাড়ল। কিরি তখন বলল, "আমিও বিবাহিত নই।"

.

কিরি জুনপেইর রুমে রাত কাটাল। তারা বিস্তর মদ পান করল। রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হল, তারপর ঘুমাতে গেল। পরের দিন সকাল ১০টায় জুনপেই ঘুম থেকে উঠে দেখল কিরি চলে গেছে। যাবার আগে একটা সংক্ষিপ্ত নোট রেখে গেছে। কাজে যেতে হচ্ছে আমাকে। ইচ্ছে করলে যোগাযোগ করতে পার আমার সঙ্গে। নিচে ওর সেল ফোন নম্বর দিয়েছে।

জুনপেই ওকে ফোন করল আর পরের শনিবার একটা রেস্তোরাঁয় ডিনার করল দু'জনে মিলে। তারা একটুখানি মদ খেল। জুনপেইর রুমে গিয়ে সঙ্গম করল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। পরের দিন সকালে আবার সে চলে গেল। রোববার সত্ত্বেও সে নোটে লিখল, কাজে যেতে হচ্ছে আমাকে।

জুনপেই এখনও জানে না কিরি কী কাজ করে। তবে ওই কাজটি শুরু হয় খুব সকালে। আর মাঝে মধ্যে সে রোববারেও কাজ করে। অনেক বিষয়ে কিরির জ্ঞান। পড়তে সে ভালবাসে। গল্প উপন্যাসের চেয়ে জীবনী, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান আর বিজ্ঞান বিষয়ক বই তার বেশি পছন্দ। বিস্তর তথ্য তার জানা। গৃহনির্মাণ বিষয়ে তার জ্ঞান দেখে তো জুনপেই অবাক। সে বলল, "তুমি কি নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত?" "আরে না না। বাস্তব সম্মত যে কোনো বিষয়ই আমাকে আকর্ষণ করে, এই যা।" সে জুনপেইর দু'খণ্ড গল্পগ্রন্থ পড়ে মন্তব্য করেছে, "চমকর তোমার গল্প। প্রত্যাশার চেয়েও বেশি আনন্দ আমি পেয়েছি। সত্যি কথা বলতে কি, ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলাম, যদি তোমার

গল্প ভাল না লাগে তাহলে কী বলতাম তোমাকে? কিন্তু ভাবনার কোনো কারণই ঘটল না। ওগুলো পড়ে দারুণ মজা পেয়েছি।"

জুনপেই বলল, "যাক বাঁচালে। খুব ভাল লাগছে তোমার কথা শুনে।"

"শুধু তোমার ভাললাগবার জন্য বলছিনা এ কথা, তোমার ভেতর বিশেষ এক ধরনের উপাদান আছে যা তোমাকে বিশিষ্ট লেখকে পরিণত করেছে। তোমার গল্পগুলো জীবন্ত, শৈলি চমৎকার আর সবচেয়ে বড় কথা ওগুলো খুবই সুষম। এ সব আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গীত, উপন্যাস কিংবা চিত্রশিল্পের বেলাতেও তা প্রত্যাশা করি আমি। কোনো কিছুর মধ্যে ভারসাম্য না থাকলে তা আমাকে রীতিমতো অসুস্থ করে তোলে।

"যে কারণে আমি কনসার্টে যাই না আর কোনো উপন্যাসও সচরাচর ছুঁয়ে দেখি না। আমার তো ধারণা তুমি ভবিষ্যতে উপন্যাস লিখবে। তখন আরও গুরুত্বপূর্ণ একজন লেখকে পরিণত হবে। তবে খানিকটা সময় লাগতে পারে আর কি।"

"না, আমি জন্মগত গল্প লেখক। উপন্যাস আমার মাথায় আসে না।" শুকনো কণ্ঠে বলল জুনপেই।...

বিছানায় শুয়ে আলাপ করছিল তারা। এখন শরৎকাল। দীর্ঘ আর উষ্ণ যৌন : মিলনের পর পোশাক-আশাক খুলে ফেলেছিল তারা। সামনের টেবিলে দু' গ্লাস মদ রাখা।

"জুনপেই।"

"বলো।"

"তুমি অন্য কারও প্রেমে এখন মত্ত, তাই না? এমন কেউ যাকে ভুলতে পারছ না?"

"হ্যাঁ। তা বলতে পার..."

“বলতে পার কেন? কথাটা তো ষোল আনা সত্যি। মেয়েরা কিন্তু এসব ব্যাপারে খুব সেনসেটিভ। ওর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে পার না?”

“না, সমস্যা আছে।”

“এসব সমস্যা সমাধানের কোনো উপায় কি নেই?”

মাথাটা দ্রুত নাড়িয়ে জুনপেই বলল, “না।”

খানিকটা মদ গলায় ঢেলে কিরি বলল, “ও রকম কেউ কিন্তু আমার নেই। তোমাকে দারুণ পছন্দ করি জুনপেই। তুমি সত্যিই আমাকে মুগ্ধ করেছ। তোমার সঙ্গে মিলতে পেরে আমি খুবই সুখী। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, আমি তোমার সঙ্গে সিরিয়াস কোনো সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই। এতে কেমন বোধ করছ? একেবারে দুশ্চিন্তামুক্ত?”

জুনপেই ওর চুলে হাত বুলাতে বুলাতে ওই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, “সেটা কেন?”

“কেন আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চাইতে পারি না?”

“উ হুঁ।”

“তোমার অসুবিধা হবে?”

“একটুখানি।”

“কারও সঙ্গে সিরিয়াস নৈমিত্তিক সম্পর্ক থাকবে না আমার। শুধু তুমি না, কারও সঙ্গেই না। এখন যা করছি তার ওপর মনোনিবেশ করতে চাই। কারও সঙ্গে যদি থাকতাম বা কারও সঙ্গে গভীর সম্পর্ক থাকত তাহলে হয়ত এটা করা যেত না।”

একটুখানি ভেবে জুনপেই বলল, “তার মানে তুমি বলতে চাইছ, বিচ্ছিন্ন হতে চাইছ

না।”

“হ্যাঁ।”

“বিচ্ছিন্ন হলে তুমি তোমার ব্যালান্স হারাবে, যা তোমার ক্যারিয়ারের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে।”

“তোমার কথা ঠিক।”

“কিন্তু এখনও তুমি বলনি কী কাজ তুমি কর।”

“অনুমান করে নাও।”

“তুমি একটা সিঁধেল চোর।”

“না।” বেশ ফুর্তি নিয়ে জবাব দিল কিরি। বলল, “খুবই সেক্সি তোমার অনুমান। তবে কিনা সিঁধেল চোর এত সকালে কাজে বেরয় না।”

“তাহলে তুমি হিট ম্যান।”

“হিট পারসন বলো। কিন্তু তা-ও না। তোমার অনুমান এমন বিদঘুঁটে কেন?”

“তুমি যা কর তা খুবই বৈধ কাজ।”

“খাঁটি। একেবারে খাঁটি কথা।”

“আন্ডারকভার এজেন্ট?”

“না। আজ থাক তবে এই প্রসঙ্গ। তোমার কাজ নিয়ে আলাপ করি বরং। কী লিখছ

আজকাল?”

“কী আর। ছোটগল্প একখানা।”

“কী ধরনের গল্প?”

“এখনও শেষ হয়নি।”

“এখন পর্যন্ত কী ঘটেছে?”

জুনপেই চুপ করে রইল। যে কাজটি চলছে তা নিয়ে নীতিগতভাবে সে কোনো কথা বলে না। গল্পটা যদি সে মুখে বলে আর যদি কোনো কথা বাকি থাকে, তার ধারণা, গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছু সকালের শিশিরের মতো বাতাসে মিলিয়ে যাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে বিছানায়, আর কিরির চুলে আঙ্গুল দিয়ে বিলি কেটে দিচ্ছে। তার মনে হলো, ঠিক আছে কিরিকে বলা যায় গল্পটা। তাছাড়া সে একটুখানি অবকাশও নিচ্ছে গল্প লেখা ফেলে।

“শোন তাহলে। গল্পটা প্রথম পুরুষে বলা। প্রটাগোনিস্ট একটা মেয়ে। বয়স তিরিশের কাছাকাছি। ইন্টার্নি হিসেবে বড় একটা হাসপাতালে কর্মরত। বিয়ে করেনি, তবে একই হাসপাতালের একজন সার্জনের সঙ্গে প্রেম চলছে। ওই সার্জন ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের কোঠায়, বউ বাচ্চা আছে।”

নায়িকার চেহারা সুরত ভাবার জন্য খানিকটা সময় নিয়ে কিরি বলল, “সে কি সুন্দরী?”

“খুবই আকর্ষণীয়া। তবে তোমার মতো এতো সুন্দরী না।” কিরি জুনপেইর কাঁধে একটা চুমু দিয়ে বলল, “যথার্থ উত্তর দিয়েছ।”

“একদিন সে ছুটি নিল আর একা একা বেড়াতে চলে গেল। তখন ছিল শরৎকাল।

একটা চমৎকার অবকাশ যাপন কেন্দ্রে গিয়ে উঠল সে। তারপর ঝরনার পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগল। পাখি পর্যবেক্ষণের নেশা আছে তার, বিশেষ করে মাছরাঙা তার খুব ভাল লাগে। হাঁটার সময় একটা বিচ্ছিরি পাথর তার চোখে পড়ল। পাথরটি কালো হলেও লালের ছোপ আছে খানিকটা। বেশ মসৃণ আর আকারটাও চমৎকার। তার মনে হলো পাথরটা দেখতে কিডনির মতো। শত হলেও সে তো একজন ডাক্তার। পাথরটা আকার আকৃতি ও পুরুত্বের বিবেচনায় সত্যিকার কিডনির মতো।"

"অতএব পাথরটা তুলে সে তার ঘরে নিয়ে গেল।" জুনপেই বলল, "ঠিক তাই। সে ওটা তার অফিসের কামরায় নিয়ে গেল আর পেপার ওয়েট হিসেবে ব্যবহার করতে লাগল। জিনিসটা আকার আকৃতি আর ওজনে পেপারওয়েটের মতোই ছিল।"

"হাসপাতালের জন্যও তা উপযুক্ত ছিল, তাই না?" কিরি জিজ্ঞেস করল।

"ঠিক বলেছ। তবে দিন কয়েক পরে অদ্ভুত একটা ব্যাপার তার চোখে পড়ল।" কিরি গল্পের বাকি অংশ শোনার জন্য নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলো। জুনপেই একটু থামল, যেন ইচ্ছাকৃতভাবে তার শ্রোতাকে উত্যক্ত করার জন্য; কিন্তু ব্যাপারটা মোটেও ইচ্ছাকৃত ছিল না। গল্পের বাকি অংশ এখনও সে লেখেনি। কাজেই এই স্থানে এসে তাকে থামতে হলো। অচিহ্নিত এই মোড়ে দাঁড়িয়ে সে আশেপাশের এলাকাটা পর্যবেক্ষণ করল আর মস্তিষ্কের ভেতর তা খেলাল। তারপর সে ভাবল কেমন করে গল্পটা এগিয়ে নেয়া যায়।

"প্রতিদিন সকালেই সে পাথরটাকে অন্য একটা জায়গাতে আবিষ্কার করে। সে খুব সুশৃঙ্খল বলে পাথরটা সব সময় একই জায়গায় রাখে; কিন্তু পাথরটা সে কখনো চেয়ারের পাশে, ফুলদানির কিনারায় কিংবা মেঝের ওপর দেখতে পায়। প্রথমে তার মনে হয় স্মৃতি বিভ্রম ঘটেছে তার। কিন্তু তার রুম সব সময় তালা দেয়া থাকে, সেখানে বাইরের কেউ ঢোকে না। নৈশ প্রহরীর কাছে অবশ্য চাবি থাকে একটা; কিন্তু এই

হাসপাতালে সে কাজ করছে দীর্ঘ দিন, সে কখনো কারও রুমে ঢোকে না। তাছাড়া একটা পাথর সরিয়ে রাখার জন্য প্রতিরাতে সে কেনই বা রুমে ঢুকবে। যেখানে ঘরের অন্য সব জিনিস যথাস্থানে আছে, কোনো জিনিস এদিক-ওদিক হয়নি বা খোয়া যায়নি। সে দারুণ রকম বিমূঢ় হয়ে পড়ে। ব্যাপারটা সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? কেন তোমার মনে হয় পাথরটা রাতের বেলা ঘুরে বেড়ায়?"

কিরি বলল, "কোনো কিছু করা না করার ব্যাপারে কিডনি আকারের পাথরটির নিজস্ব যুক্তি আছে।"

"কী ধরনের যুক্তি থাকতে পারে তার?"

"ওটা নিজেকে নাড়াতে চায়। ধীরে ধীরে, দীর্ঘ সময় ধরে।"

"ভালকথা। সে কেন নিজেকে নাড়াতে চায়?"

কিরি বলল, "তা তো আমি জানি না। তারপর খিলখিল করে হেসে বলল, "হতে পারে সে তার জগতটাকে নাড়াতে চায়।"

"এ রকম বাজে শব্দ-কৌতুক জীবনেও শুনিনি। প্রায় গোঙানির মতো বলল জুনপেই।

" শোন, তুমি হচ্ছে লেখক। সিদ্ধান্ত কিন্তু তোমাকেই নিতে হবে।"

"লেখার টেবিলে গিয়ে না বসলে আমার এই কাহিনী এগিয়ে নেয়া যাবে না..."

কিরি বলল, "অসুবিধা নেই। অপেক্ষা করব আমি।" সে হাত বাড়িয়ে গ্লাসটি নিল আর একটুখানি মদ গলায় ঢালল। তারপর বলল, "তবে গল্পটি বেশ ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠছে ক্রমে-ক্রমে। কিডনি আকারের পাথরটার কী হয় শেষ পর্যন্ত জানতে চাই আমি।"

সে জুনপেইর দিকে ঘুরলে ওর স্তন যুগল তার শরীরে লেপ্টে যায়। তখন সে খুব নীরবে, গোপন কিছু শেয়ার করার ভঙ্গিমায় ফিস ফিস করে বলে, “একটা কথা কি জান জুনপেই, পৃথিবীতে কোনো কিছু করার জন্য অবশ্যই কোনো কারণ থাকে।”

ঘুমে ঢলে পড়ছিল জুনপেই, ফলে ওই কথার উত্তর দিতে পারল না।

.

পরবর্তী পাঁচদিন জুনপেই বলতে গেলে ঘর থেকেই বেরুল না। নিজের টেবিলে বসে কিডনি আকারের পাথরের গল্পটির বাকি অংশ লিখতে লাগল। কিরি ইতোমধ্যেই আভাস দিয়েছিল যে, পাথরটি ডাক্তারকে ধীরে ধীরে নাড়াতে শুরু করেছে তবে তা করছে খুব স্পষ্টভাবে। সে তার প্রেমিকের সঙ্গে অজ্ঞাত একটি হোটেল কক্ষে খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে, যখন সে তার প্রেমিকের পৃষ্ঠদেশের কাছে পৌঁছেছে এবং কিডনির আকার অনুভব করেছে। কিডনি হচ্ছে গোপন সংবাদদাতা যেটাকে সে নিজে তার প্রেমিকের শরীরে লুকিয়ে ফেলেছে। তার হাতের নিচে ওটি পতঙ্গের মতো মোচড়ামুচড়ি করেছে, আর তার কাছে বার্তা পাঠিয়েছে। সে কিডনির সঙ্গে কথা বলেছে আর বার্তা আদান-প্রদান করেছে।

কিডনির মতো দেখতে পাথরটির অস্তিত্ব ডাক্তরের কাছে এখন গা সওয়া হয়ে উঠেছে। সে এটাকে খুব স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছে। হাসপাতালে নিজের রুমে ঢুকেই সে পাথরটা দেখে, হাতে তুলে নেয় আবার যথাস্থানে রেখে দেয়। এটা তার কাছে একটা রুটিনে পরিণত হয়েছে। যতক্ষণ সে রুমে থাকে পাথরটি একটুও নড়াচড়া করে না, সূর্যের নিচে ঘুমন্ত বিড়ালের মতো চুপ হয়ে থাকে। সে ঘর থেকে বেরিয়ে তালা লাগালেই ওটি নড়াচড়া শুরু করে।

কর্মস্থলে সে যখন অবসরে থাকে পাথরটাকে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে। কিছুক্ষণের

মধ্যেই ওটার দিকে চোখ রাখা তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে, যেন তাকে সম্মোহন করা হয়েছে। ধীরে ধীরে সে অন্যসব কিছুর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। বইপত্র পড়তে পারে না, জিমনেশিয়ামে যাওয়া ছেড়ে দেয়। অন্য সহকর্মীদের সাথে কথা বলতে বিরক্ত বোধ করে। এক অন্য রকম মানুষে পরিণত হয় সে। খিদে মরে যায়। এমন কি প্রেমিকের উষ্ণ আলিঙ্গন তার ভয়ের কারণ হয়ে ওঠে। আশে পাশে কেউ না থাকলে নিচুস্বরে পাথরের সঙ্গে কথা বলতে থাকে। কিডনির মতো দেখতে পাথরটি এখন তার জীবনের বড় একটা অংশ নিয়ন্ত্রণ করে।....

গল্প লেখার সময় জুনপেই কিরির কথা ভাবে। সে অনুভব করে কিরি (অথবা তার ভেতরকার কিছু) গল্পটা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে; তা নাহলে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন এমন কিছু লেখার ইচ্ছে তার আদৌ ছিল না। জুনপেই আগে যে স্টোরি লাইনটা মনে-মনে ভেবেছিল তা ছিল আরও বেশি প্রশান্ত, মনস্তাত্ত্বিক। ওখানে পাথরের ঘোরাফেরার কোনো বিষয় ছিল না।

জুনপেই ভাবে ডাক্তার তার বিবাহিত সার্জন প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করবে। এমন কী সে তাকে ঘৃণা পর্যন্ত করবে। সম্ভবত অবচেতনভাবে সে-ও তাই চাচ্ছে।

পরের দিন সে যখন হাসপাতালে তার রুমে ঢুকল পাথরটি তার টেবিলের ওপর ছিল আর তার জন্য অপেক্ষা করছিল। যেখানে থাকবার কথা ওখানেই ছিল, আগের মতোই কালো, আগের মতোই দেখতে ঠিক কিডনির মতো।

গল্পটা লেখা শেষ হতেই জুনপেই কিরিকে ফোন করে। সম্ভবত গোটা লেখাই পড়তে চাইবে সে। এক অর্থে গল্পটা রচনার ব্যাপারে ওর অনুপ্রেরণা আছে। কিন্তু ফোনে সে কিরিকে পাচ্ছিল না। রেকর্ডকরা কণ্ঠস্বর বলছে- নম্বরটা চেক করুন তারপর আবার চেষ্টা করুন। জুনপেই বার বার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই তার লাইনে ঢুকতে পারল না। সম্ভবত ওর ফোনে কোনো কারিগরি ত্রুটি দেখা দিয়েছে।

জুনপেই বাড়িতেই অবস্থান করল আর কিরির প্রতীক্ষা করতে লাগল। এক মাস গেল, দু মাস গেল, তিন মাস গেল, কিরির সাড়া পাওয়া গেল না। ঋতু পরিবর্তিত হলো, এল নতুন বছর। তার গল্পটি একটা সাময়িকীতে প্রকাশিত হলো। জুনপেই নিজের নাম আর গল্পটির নাম 'কিডনি আকারের পাথর যা রোজই চলাফেরা করে' দিয়ে পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন ছাপাল যাতে কিরির নজরে আসে আর সে ওর সাথে প্রতিক্রিয়াটা শেয়ার করতে পারে। কিন্তু তাতেও কিছু হলো না...

ওর জীবনে কিরির অন্তর্ধানের বেদনা ওর কল্পনার চেয়েও অনেক গুণ বেশি ছিল। প্রতিদিনই সে ভাবে আহা এখন যদি কিরি এসে হাজির হয়। জুনপেই ওর হাসি, ওর বচন, ওর স্পর্শ মিস করে। ভাললাগা সঙ্গীত বা সদ্য আসা বই পেয়ে। আগের মতো আনন্দ হয় না তার। সব কিছুই দূরের আর বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়। জুনপেই ভাবে কিরি হয়ত তার জীবনে ২ নম্বর নারী।

.

এরপরে জুনপেইর সঙ্গে কিরির সাক্ষাৎ বসন্তের এক সকালে, যদিও তাকে প্রকৃত সাক্ষাৎ বলে গণ্য করা যাবে না।

সে ছিল ট্রাফিক জ্যামে আটকে পড়া একটা ট্যাক্সির ভেতর। ড্রাইভার এফ.এম. ব্যান্ডে রেডিও শুনছিল। রেডিও থেকে কিরির কণ্ঠস্বর ভেসে এল। জুনপেই প্রথমে বুঝতে পারল না ওটা কিরির গলা। তার মনে হচ্ছিল ওটা কিরির মতো কণ্ঠস্বর। পরে যখন আরও শুনল তখন ওর বলার ভঙ্গি, কণ্ঠস্বরের ওঠা-নামা, শিথিল ভঙ্গিমা আর চিন্তার ফাঁকে থেমে যাওয়ার বিশেষ ধরন দেখে বুঝতে পারে এটা কিরি। জুনপেই ড্রাইভারকে ভলিউম বাড়াতে বলল।

এক মহিলা ওর সাক্ষাৎকার নিচ্ছিল- তার মানে আপনি ছোটবেলা থেকেই উঁচু জায়গা

পছন্দ করেন?

“হ্যাঁ। যতদূর মনে পড়ে ওপরে অবস্থানের ব্যাপারটি ভাল লাগে আমার। যত বেশি ওপরে তত বেশি শান্তি। আমাকে কোনো ভবন শিখরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সব সময় বাবা-মার সঙ্গে খাচ এ্যাচ করতাম। আমি ছিলাম এক অদ্ভুত ক্ষুদ্র প্রাণী।” অতঃপর দম ফাটানো হাসি।

“আমার ধারণা ওগুলোই আপনার বর্তমান কাজের অনুপ্রেরণা।”

“প্রথমে অবশ্য আমি একটা সিকিউরিটি কোম্পানির অ্যানালিস্ট ছিলাম। তবে আমি জানতাম, ওটা আমার যথার্থ কর্ম নয়। বছর তিনেক পর ওই কাজ ছেড়ে দিয়ে উঁচু উঁচু ভবনের জানালা সাফ করার কাজ শুরু করি। আমি আসলে সুউচ্চ ভবনের চূড়ায় আরোহণ করে তা সাফাই আর মেরামতির কাজ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা তো ধরুন পুরুষদের কাজ বলে বিবেচিত। ওরা সহজে কোনো মেয়েকে ওই কাজের অনুমতি দেয় না।”

“সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট থেকে জানালা সাফ- দু’য়ের মধ্যে তো বিস্তর ফারাক?”

“সত্যি কথা যদি বলি, জানালা সাফের কাজ আমার কাছে কম কষ্টের ব্যাপার। পড়ে যাওয়ার কথা যদি ওঠান তাহলে বলতে হয় শেয়ারের দাম পড়ে, আমি পড়ি না।” আবার উচ্চ হাস্য।

“আমার মনে হয় পর্বত আরোহণেও আপনার আগ্রহ আছে।”

“ও ব্যাপারে আমার আগ্রহ নেই বললেই চলে। কয়েকবার সে চেষ্টাও করেছিলাম; কিন্তু আমার জন্য কিছুই ছিল না ওটা। আমার আগ্রহ শুধুমাত্র মনুষ্য নির্মিত দালান কোঠায় যা মাটি থেকে সোজা ওপরের দিকে উঠে যায়। কেন তা আবার জিজ্ঞেস করবেন না

যেন...।”

“এখন আপনি জানালা সাফ করার কোম্পানি পরিচালনা করছেন যেটি মেট্রোপলিটান টোকিওর হাইরাইজ ভবনের শীর্ষে কাজ করার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।”

“ঠিক তাই।”

একটু পরেই ঘোষিত হলো- এখন শুরু হচ্ছে সঙ্গীতানুষ্ঠান। গান শুরু হলে জুনপেই ড্রাইভারের দিকে ঝুঁকে বলল, “এই মহিলা আসলে করেটা কী?”

“হাইরাইজ ভবনের ওপর থেকে কাছি নামায় তারপর ওটা বেয়ে ওপরে ওঠে। ভারসাম্য রক্ষার জন্য হাতে একটা দণ্ড রাখে। এক ধরনের পারফরমার বলতে পারেন তাকে। ও সব করেই সে আনন্দ পায়। আমি তো ধরুন গ্লাসের এলিভেটরে উঠতে গিয়েই ভয়ে মরি।”

“ওটা কি তার পেশা?” জুনপেই জিজ্ঞেস করে। তখন সে খেয়াল করে তার। গলা শুকিয়ে গেছে, স্বর গেছে বদলে, মনে হচ্ছে অন্য কেউ কথা বলছে।

“হ্যাঁ। আমার অনুমান সে ম্যালা স্পন্সর পায় আর পারফরমেন্স দেখায়। সে। নাকি জার্মানির এক নামকরা গির্জায় ওই পারফরমেন্স দেখিয়েছিল। সে বলে, বড় বড় সব দালানে সে ওটা করতে চায়, কিন্তু অনুমতি পায় না।”

.

“এটার সব চেয়ে মজার দিক হচ্ছে ওপরে উঠলে আপনি মানুষ হিসেবে। পরিবর্তিত হবেন,” কিরি সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর কাছে বলেছিল, “নিজেকে বদলাতে না পারলে আপনি টিকতে পারবেন না। যখন আমি কোনো উচ্চ স্থানে যাই তখন বাতাস আর

আমি ছাড়া ওখানে আর কেউ থাকে না। বাতাস ঢেকে ফেলে আমাকে, ঝকায়। ওরা বুঝতে পারে আমি কে। একই সঙ্গে বাতাসকেও আমি বুঝতে পারি। আমরা একে অপরকে মেনে নেই, গ্রহণ করি আর একসাথে বাঁচার সিদ্ধান্ত নেই। ওই মুহূর্তটাকে আমি যে কোনো কিছুর চেয়ে বেশি পছন্দ করি। না, ভয় করে না আমার। উচ্চ স্থানে একবার পা দিলেই একটা মনোযোগের ভেতর চলে যাই, সকল ভয় কেটে যায়।”

এখন জুনপেই প্রায়ই উঁচু উঁচু ভবনের দিকে তাকায় আর মেয়েদের উড়ে যেতে দেখে। বাতাস আর ওর মাঝখানে কেউ আসতে পারে না। সে প্রচণ্ড ঈর্ষা অনুভব করে। কার প্রতি? বাতাসের প্রতি ঈর্ষা? এই দুনিয়ায় কে আছে যে বাতাসের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়?

জুনপেই আরও কয়েক মাস কিরির প্রতীক্ষায় থাকে। সে দেখতে চায় ওকে। কিডনি আকৃতির পাথর ছাড়াও আরও কয়েকটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে চায় ওর সাথে। কিন্তু কিরির ফোন আসে না। সে বার বার ডায়াল করেও টেলিফোনে কিরিকে পায় না। গ্রীষ্ম এলে হাল ছেড়ে দেয় জুনপেই। ওর সঙ্গে দেখা করার কোনো ইচ্ছেই হয়ত ওর নেই। কাজেই ওদের সম্পর্কটা নীরবেই ভেঙ্গে যায়, কোনো উচ্চবাচ্য ছাড়া, অন্য মেয়েদের সাথে যেমন করে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে।

সে কি তিন নারীর একজন ছিল যে তার জীবনে সত্যিকার অর্থ বহন করেছে। প্রশ্নটা নিয়ে ভাবিত হলো সে; কিন্তু কোনো সমাধানে পৌঁছুতে পারল না। আমি আরও ছ’ মাস অপেক্ষা করব তার জন্য তারপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব। সে ভাবল।

ছ’টি মাস সে খুব মনোযোগ দিয়ে লেখালেখি করল। বেশ কিছু গল্প লিখে ফেলল সে। নিজের টেবিলে বসে লেখাগুলো ঘষামাজা করার সময় সে ভাবে কিরি সম্ভবত এখন কোনো উঁচু দালানে অবস্থান করছে, তার সঙ্গে আছে বাতাস। আমি এখানে একা একা বসে লিখছি, আর ও আছে ওইখানে, অনেক ওপরে, সঙ্গে জীবন রক্ষাকারী দড়ি নেই। অভিনিবেশের জগতে পা রাখলেই তার সব ভয়-ডর উবে যায়। তখন সেখানে থাকে সে

আর বাতাস। জুনপেই সব সময়ই তার কথাগুলো স্মরণ করে। অনুভব করে কিরির জন্য তার বিশেষ অনুভূতি আছে। অন্য কোনো রমণীর জন্য এ রকম অনুভব করেনি সে। ওটা একটা গভীর আবেগ, স্বচ্ছ রূপরেখা আছে তার, আছে সত্যিকার ওজন। এই আবেগের কী নাম দেবে সে? কোনো কিছু দিয়েই যা বদলাবদলি করা যায় না। কিরিকে জীবনে আর কোনো দিন না দেখলেও এই অনুভব থেকে যাবে আজীবন। তার শরীরের কোনোখানে- হয়ত হাড়ের মজ্জার ভেতরে- তার অনুপস্থিতির অনুভব কোন দিন শেষ হবে না।

বছর শেষ হয়ে গেলে জুনপেই মনস্থির করে। গণনায় তাকে ২ নম্বরে ফেলে। কিরি সেই নারীদের একজন তার জীবনে সত্যিকার অর্থ বহন করেছিল। দু'জনকে ঝেড়ে ফেললে একজনই থাকে।

কিন্তু এখন সে আর ভয় পায় না। সংখ্যা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। নিজেকে নিজে বলে জুনপেই। উল্টো গণনার আর কোনো মানে নেই। এখন সে জেনেছে, আসল ব্যাপারটা হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে অন্য আর একজনকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারা। কখন সেটা করবে তুমি, সব সময়ই এটা প্রথমবার এবং শেষবার।

.

এক সকালে ডাক্তার খেয়াল করল কিডনি আকারের পাথর আর তার টেবিলের ওপর নেই। এবং সে জানে, ওটা আর কোনো দিন ফিরে আসবে না।

গরিব খালাম্মা বিষয়ক একটি গল্প

গরিব খালাম্মা বিষয়ক একটি গল্প

ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল জুলাই মাসের এক চমৎকার বিকেলে। সেটি আবার ছিল জুলাই মাসের প্রথম রোববার। দুটি অথবা তিনটি মেঘের সাদা ছোট টুকরো জমেছিল আকাশের গায়ে, ব্যতিক্রমী সতর্কতার সাথে বসানো যতি চিহ্নের মতো। বাধা না পেয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছিল পৃথিবীর গায়।

এক বান্ধবীর সাথে ঘুরতে বেরিয়েছিলাম আর ঘরে ফেরার পথে মেইজি মেমোরিয়াল পিকচার গ্যালারিতে থেমেছিলাম। জলাশয়ের কিনারে বসে আমরা অপর প্রান্তের সিংহের ল্যাজঅলা এক শৃঙ্গী অশ্বমূর্তি প্রত্যক্ষ করেছিলাম। মৃদমন্দ বাতাসে তখন ওক গাছের পতা নড়ছিল আর জলাশয়ের জলে সৃষ্টি হচ্ছিল ছোট-ছোট ঢেউ। হালকা বাতাসের সাথে সময়ও বয়ে চলেছিল। তখন ঘাসের ওপরে রাখা বিশাল একটা পোর্টেবল রেডিও থেকে গান ভেসে এসেছিল। মনে হয়েছিল সুরটা আমার চেনা; কিন্তু নিশ্চিত হতে পারিনি।

এতকিছু থাকতে গরিব খালাম্মা সেই রোবারের বিকেলে কেন আমার হৃদয় দখল করেছিলেন জানি না। আশপাশে গরিব কোনো খালাম্মার অস্তিত্ব ছিল না; কোনো কিছুই তার অস্তিত্ব কল্পনায় প্রাণিত করেনি আমাকে। তারপরও গরিব খালাম্মা এসেছিলেন,

আবার চলেও গিয়েছিলেন। এক সেকেন্ডের একশ ভাগের এক ভাগ সময়ের জন্য হলেও তিনি আমার ভেতরে ছিলেন। যাওয়ার সময় তিনি এক অদ্ভুত, মানবাকৃতির শূন্যতা রেখে গেছেন। যেন কেউ দ্রুত জানালার পাশ দিয়ে উধাও হয়ে গেল। জানালার কাছে গিয়ে উঁকি মেরেছিলাম; কিন্তু কেউ ছিল না সেখানে।

গরিব একজন খালাম্মা?

আমার বান্ধবীকে বললাম কথাটাও "একজন গরিব খালাম্মাকে নিয়ে কিছু লিখতে হবে আমাকে।"

"একজন গরিব খালাম্মা?" মনে হলো সে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়েছে।

"গরিব খালাম্মা কেন?"

কেন তা আমি নিজেও জানি না। খানিকটা সময়ের জন্য চুপ করে রইলাম। আমার ভেতরকার মানবাকৃতির শূন্যতার প্রান্তে আঙ্গুল বুলালাম।

"ওই ধরনের কোনো গল্প কেউ পড়তে চাইলে অবাকই হব আমি।" আমার বান্ধবী বলল।

"সত্যি কথা", আমি বললাম, "ভাল পাঠ বলে যা তুমি ভাবছ তা না-ও হতে পারে।"

"তাহলে এসব লিখে আর কী লাভ?"

"শব্দ দিয়ে হয়ত ভালভাবে বোঝাতে পারছি না," বললাম আমি, "কেন গরিব খালাম্মা নিয়ে গল্প লিখতে চাই তা ব্যাখ্যা করার জন্যই গল্পটা লিখতে হবে। কিন্তু গল্পটা একবার লেখা হয়ে গেলে কোনো কিছু ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়বে না।"

কুঁচকে যাওয়া একটা সিগারেট পকেট থেকে বের করে অগ্নিসংযোগ করল সে। সব সময়ই সে এরকম কুঁচকে যাওয়া সিগারেট ধরায়। মাঝে মাঝে ওগুলো এমনভাবে দুমড়ে মুচড়ে যায় যে তাতে আগুনই ধরে না- এটাতে ধরল।

"তোমার আত্মীয়দের মধ্যে এ রকম কোনো গরিব খালাম্মা আছে নাকি?" আমার বন্ধবী শুধাল।

"একজনও নেই।" বললাম আমি।

"আমার কিন্তু এ রকম একজন খালাম্মা আছে। তার সঙ্গে বেশ কটা বছর থেকেছি আমি।"

তার চোখের দিকে তাকালাম। আগের মতোই শান্ত ওগুলো। "কিন্তু তাকে নিয়ে লিখতে চাইনে," বলল সে, "এক লাইনও না ..."

পোর্টেবল রেডিওতে অন্য গান বাজছে। আগেরটার মতোই; কিন্তু কার গলা চিনতে পারলাম না।

"তোমার কোনো গরিব খালাম্মা নেই, তারপরও তাকে নিয়ে লিখতে চাচ্ছ তুমি; অথচ আমার আসল গরিব খালাম্মা থাকা সত্ত্বেও তাকে নিয়ে লেখার ইচ্ছে নেই আমার।"

আমি মাথা নাড়ি। বলি, "আমিওতো অবাক হচ্ছি সেই কথা ভেবে।" সে মাথাটা একটুখানি কাত করে, কিছুই বলে না।

সে তার পাতলা আঙ্গুলগুলো পানির ওপর ঘোরাতে থাকে। যেন আমার প্রশ্ন তার আঙ্গুলের ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর পানির ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীতে ডুবে গেছে ।

অবাক কাণ্ড, কেন? কেন? কেন?

“সত্যি কথাটা তবে বলি তোমাকে,” সে বলল, “আমার গরিব খালাম্মা সম্পর্কে কিছু বলতে চাই তোমাকে। কিন্তু সঠিক ভাষা খুঁজে বের করা অসম্ভব আমার পক্ষে। একেবারেই পারব না তার কারণ সত্যিকার একজন গরিব খালাম্মাকে আমি চিনি।”

আমি আবার অশ্বমূর্তির দিকে তাকাই। স্কার্টের ওপর আঙ্গুল মোছে সে। বলে, “গরিব খালাম্মাকে নিয়ে লিখতে চাচ্ছ; কিন্তু ভাবছি এখন তা লেখার ক্ষমতা তোমার আছে কিনা। তোমার তো ধর আসল কোনো গরিব খালাম্মাই নেই।”

আমি গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি।

“দুঃখিত,” বলে সে।

“না না, হয়ত তোমার কথাই ঠিক।”

এবং আসলেই তাই।

আহ্ যেন কোনো গানের লাইন।

আত্মীয়দের মধ্যেও যদি এ রকম একজন খালাম্মা থাকত। তখন আমাদের মধ্যে জিনিসটা কমন হতো। কিন্তু তোমাকে অন্তত কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে একজন খালাম্মার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা থাকবে হবে। প্রতিটি বইয়ের শেলভে এমন একটা বই থাকে যা কেউ কখনো পড়েনি আর প্রতিটি ক্লোসেটেই এমন কোনো একটি শার্ট থাকে যা কেউ গায়ে দেয়নি কখনো, প্রতিটি বিয়ের অনুষ্ঠানেই একজন গরিব খালাম্মা হাজির থাকেন।

কেউ তাকে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন অনুভব করে না। কেউ কথা বলে তার সাথে। তাকে কিছু বলতে অনুরোধ জানায় না। কোনো একটা টেবিলে তিনি বসে

থাকেন, শূন্য একটা পানির বোতলের মতো। নিঃসঙ্গ তিনি, বিষণ্ণতার ভেতরে ডুবে থেকে ধীরে ধীরে সামান্য একটুখানি খাবার খান। যখন তার পাতে আইসক্রিম পরিবেশিত হয় তাতে কোনো চামচ থাকে না।

বিয়ের ছবিতে তিনিও থাকেন; কিন্তু তার ভাবমূর্তি সেখানে ডুবে যাওয়া লাশের মতো।

"ডার্লিং চশমা চোখে ওই বুড়িটা কে?" নতুন বউ শুধায় হয়তো।

"না না তেমন কেউ না, আমার এক গরিব খালাম্মা।"

কোনো নাম নেই তার। শুধু গরিব খালাম্মা।

সব নামই একদিন পৃথিবী থেকে মুছে যায়। নিমেষেই যাদের নাম মুছে যায় তাদের আসলে মৃত্যু ঘটে। পরিত্যক্ত পুরনো টেলিভিশন সেটের মতো। পর্দায় জ্বলজ্বল করতে থাকে বরফের কণা, তারপর হঠাৎ একদিন দপ করে নিভে যায়। আর মৃত্যুর আগেই যাদের নাম মুছে যায় সেই দলে থাকেন গরিব খালাম্মা। প্রায়ই আমার নিজের দশাও এই গরিব খালাম্মার মতো হয়। রেলস্টেশন কিংবা বিমানবন্দরের হৈচৈয়ের মধ্যে প্রায়ই আমি আমার গন্তব্য, নাম, ঠিকানা ভুলে যাই। তবে তা খুব অল্প সময়ের জন্য, পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ডের বেশি না।

কখনো আবার এমনও ঘটে; বিশ্বাস করুন আপনার নামটা ঠিক মনে করতে পারছি না। হয়ত কেউ একজন বলে।

"না কিছু করার নেই ভাই। নাম ভুলে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।" তখন সে বলে, "কী আর বলব রে ভাই, পেটে আসছে, মুখে আসছে না।"

কিন্তু বিস্মৃত ওই নাম যায় কোথায়? নগরের গোলকধাঁধার ভেতর তাদের বেঁচে থাকার

সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তারপরও কিছু কিছু নাম শেষতক আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়, আর হারানো নামের নগরে বসতি গড়ে তোলে, একটা গোষ্ঠী তৈরি করে। ছোট্ট একট নগর, ঢুকতেই বড় বড় করে লেখা চোখে পড়ে বিনা কাজে প্রবেশ নিষেধ। কাজ ছাড়া যারা ঢোকে, সামান্য সাজা তাদের কপালে লেখা থাকে।

সেই কারণে বোধকরি ছোট্ট একটা শাস্তি আমার জন্য প্রস্তুত ছিল। গরিব খালাম্মাকে আমার পিঠে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি আমি টের পেয়েছিলাম তিনি সেখানে আছেন। বিশেষ কোনো কিছু আমাকে তার উপস্থিতি জানান দেয়নি। একদিন হালকাভাবে টের পেয়েছিলাম তিনি আমার পিঠে আছেন। ওটা কোনো অস্বস্তিকর অনুভূতি ছিল না। তেমন একটা ভারীও ছিলেন না তিনি। আমার কাঁধে তার কোনো বদ নিশ্বাসও পড়েনি। একটা ছায়ার মতো আমার পিঠের সঙ্গে সেঁটে ছিলেন। তিনি যে সেখানে আছেন তা দেখতে পাওয়াও খুব সহজ ছিল না লোকের পক্ষে। তবে একথা ঠিক যে, প্রথম কয়েকটা দিন আমার অ্যাপার্টমেন্টের বিড়ালগুলো সন্দেহের চোখে তাকাত। কিন্তু যখন তারা দেখল তার কোনো দুরভিসন্ধি নেই তখন তারা স্বাভাবিক হয়ে এলো।

তবে আমার ক'জন বন্ধু খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। টেবিলে বসে তাদের সঙ্গে মদ পান করার সময় হঠাৎ তিনি আমার কাঁধের ওপর থেকে উঁকি মারেন।

এক বন্ধু তো বলেই ফেলে, "আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে একেবারে।"

"ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। তিনি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। কারও ক্ষতি করার মধ্যে নেই।"

"জানি তো সে কথা। তবে জানতাম না, মন তার খুব খারাপ হয়ে আছে।"

"কাজেই ওদিকে তাকাবার চেষ্টাই কোর না।"

“না তা ঠিক বলেছ, তবে তোমার পিঠে এমন এক জিনিস এসে জুটল কোথা থেকে তা-ই ভাবছি।”

“এমন নয় যে কোথাও গিয়েছিলাম। শুধু চিন্তার মধ্যে এ রকম এসেছিল, এই শুধু, আর কিছু নয়।”

সে মাথা নাড়াল এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “আমার ধারণা বিষয়টা বুঝতে পেরেছি আমি। এটা তোমার ব্যক্তিত্ব। সব সময় এর রকমই ছিলে তুমি।”

“উ হুঁ।“

পরবর্তী কয়েক ঘন্টা কোনো রকম উচ্ছ্বাস উদ্দীপনা ছাড়াই সে বেশ কপেগ হুইস্কি গলাধঃকরণ করল।

“তার ভেতর মন খারাপ করা কী এমন ব্যাপার দেখলে,” জিজ্ঞেস করলাম আমি।

“জানি না সেটা। যেন মা নজর রাখছেন আমার ওপর।”

বেশ কিছু লোকের দৃষ্টিভঙ্গি বিচারে আমার পিঠে লাগানো গরিব খালাম্মা এমন কোনো একক, সেঁটে রাখা অস্তিত্ব নন, মনে হয় তিনি তার আকৃতি পরিবর্তন করেন যে ব্যক্তি তাকে দেখে সেই অনুসারে...।

একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে চিনতাম, তার গরিব খালাম্মা ছিল তার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বুড়ো শিক্ষিকা। সে আমাকে জানিয়েছিল, “ওটা ছিল ১৯৫০ সাল, কোরিয়ার যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রথম বছর। দু’বছর পেয়েছিলাম তাকে। তাকে দেখে পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে যেত। তাকে ঠিক মিস করতাম না। তিনি যে বেঁচে আছেন তা-ই আসলে ভুলে গিয়েছিলাম।”

আমার মনে হতে লাগল, আমি একটা ডেন্টিস্ট চেয়ার, ঘৃণা না করলেও সবাই এড়িয়ে চলে যাকে। রাস্তায় কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে ছুতো ছানা করে পালায় আমার কাছ থেকে। একদিন তো একটা মেয়ে বলেই বসল, "তোমার আশপাশে থাকা খুব যন্ত্রণাকর হয়ে পড়েছে আজকাল। কেন জানি না তোমার পিঠে ছাতার স্ট্যান্ড বা ওই জাতীয় কিছু থাকলেও কিছু মনে করতাম না।"

ছাতার স্ট্যান্ড । ভাবুন একবার ব্যাপারখানা।

বন্ধুরা এড়িয়ে চললেও মিডিয়ার লোকেরা প্রায়ই হেঁকে ধরে আমাকে। প্রায় প্রতিদিনই রিপোর্টাররা আমার কাছে আসে। আমার আর গরিব খালাম্মার ছবি তোলে। তারা অভিযোগ করে খালাম্মার ছবি স্পষ্ট ওঠে না। তারা আমাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে। আশা করে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করলে তারা আমাকে গরিব খালাম্মা আবিষ্কারের জন্য তুঙ্গে তুলে ফেলবে; কিন্তু তা না-করে তারা ক্রমাগত হয়রান করে ফেলছে আমাকে।

এক ভোরে আমাকে একটা টিভি অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হয়। সকাল ছ'টায় আমাকে বিছানা থেকে টেনে তুলে গাড়িতে ওঠায় ও টিভি স্টেশনে নিয়ে যায়। তারা আমাকে অসম্ভব বাজে এক কাপ চা পান করতে দেয়। অবোধগম্য কিছু লোক আমার চারপাশ দিয়ে আনাগোনা করতে থাকে। তাদের কাজকর্মও আমার বোধের সীমায় ছিল না। ওখান থেকে সটকে পড়ার মতলব আঁটছিলাম। সেই সময় একটা লোক এসে জানায় এবার আপনার পালা। ক্যামেরা অন হলে দেখি অ্যাংকর এক বদমেজাজি উদ্ধত টাইপের লোক। কিছুই জানে না কেবল লোকেদের অহেতুক আক্রমণ করে। কিন্তু ক্যামেরার লাল আলো জ্বলতেই দেখতে পাই–

এক দ্রলোক ধীরে সুস্থে ঘোষণা দিচ্ছেন, "শুরু হচ্ছে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান। এখনকার অতিথি জনাব... যিনি হঠাৎ করেই আবিষ্কার করেন তিনি তার পিঠে গরিব

খালাম্মাকে বয়ে চলেছেন। খুব বেশি লোকের কিন্তু এ ধরনের সমস্যা নেই; তাকে জিজ্ঞেস করতে চাই কেমন করে ব্যাপারটার সূত্রপাত আর কী কী সমস্যা এ বাবদে তিনি মোকাবিলা করছেন। কী জনাব, গরিব খালাম্মাকে নিয়ে কোনো অসুবিধা হচ্ছে আপনার?"

"মোটেও অসুবিধা হচ্ছে না। তার ওজন খুব বেশি নয়, আর তাকে খাওয়াতে পরাতেও হয় না।"

"পিঠে ব্যথা ট্যাথা হচ্ছে না?"

"একেবারেই না।"

"কখন পেলেন তাকে আপনার পিঠে?"

আমি সেই বিকেলের ঘটনাটা খুলে বলার চেষ্টা করলাম; কিন্তু তিনি বুঝলেন বলে মনে হলো না।

তিনি গলা পরিষ্কার করে বললেন, "আপনারা যেখানে বসেছিলেন তার অদূরে পুকুরের মধ্যে তিনি ওঁত পেতে ছিলেন এবং এক সময় আপনার পিঠটা দখল করে ফেলেন, এই তো ব্যাপার?"

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বলি, "না ওরকম ছিল না ব্যাপারটা।"

কী করে বোঝাই ব্যাটাকে। তারা জোক কিংবা লোমহর্ষক কাহিনী শুনতে চাইছে।

"গরিব খালাম্মা ভুতটুত কিছু নন," আমি বোঝানো চেষ্টা করে বলি, "তিনি কোথাও ওঁত পেতে ছিলেন না এবং তিনি কারও ওপর দখল নেননি। গরিব খালাম্মা একটি শব্দ মাত্র, শুধুমাত্র একটি শব্দ।"

কেউ কোনো কথা বলে না। আরও স্পষ্টতা প্রত্যাশা করে। “একটি শব্দ একটি বিদ্যুত্বহের মতো যা মনের সঙ্গে যুক্ত । আপনি যদি ক্রমাগত একই উদ্দীপক প্রেরণ করতে থাকেন তাহলে অবশ্যই কোনো ধরনের সাড়া, কিংবা ফল পাবেন। প্রতিটি একক সাড়াই হবে পৃথক। এবং আমার বেলায় সাড়াটির একটি স্বাধীন সত্ত্বা ছিল। আসলে আমার পিঠে লাগানো ছিল গরিব খালাম্মা শব্দটি। এ ছাড়া আর কিছুই নয়, এর কোনো অর্থ বা আকৃতি-ই আসলে ছিল না। যদি এর কোনো নাম দেয়া যায়, তাহলে বলতে হবে কাল্পনিক আকার বা ওই জাতীয় কিছু।”

অনুষ্ঠানের হোস্ট স্পষ্টতই বিভ্রান্ত। “আপনি বলতে চাইছেন এর কোনো অর্থ বা আকার নেই? কিন্তু আমরা তো স্পষ্টই দেখি... কিছু একটা... বাস্তব চিত্র আপনার পিঠের সঙ্গে সাঁটা। আর ওর একটা অর্থ তো অবশ্যই আমরা খুঁজে পাই।”

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলি, “অবশ্যই। বললাম তো কাল্পনিক কোনো নকশা বা চিহ্ন।”

“অতএব,” হোস্টের তরুণী সহকারী পরিবেশটা হালকা করার চেষ্টা নিয়ে বলল, “তাহলে তো আপনি ওটা কোনো ভাবে মুছে ফেলতে পারতেন।”

“না পারতাম না। কোনো কিছু বাস্তবে রূপ নিলে তা স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে থাকে। ঠিক স্মৃতির মতো। কোনো স্মৃতি ইচ্ছে করলেই ভুলে যাওয়া যায় । কিন্তু আপনি তা ভোলেন না। এটাও এই রকম...”

মনে হলো কথাটার প্রত্যয় জন্মালো না তার মধ্যে। “একটি শব্দকে কাল্পনিক চিহ্ন বা নকশায় পরিণত করার যে ব্যাপারটা আপনি বললেন, তা করা কী আমার পক্ষে সম্ভব?”

“কতটা কাজ করবে তা জানি না, তবে নীতিগতভাবে এটা করতে পারবেন। আপনি।” উত্তর দিলাম আমি।...

গোটা পৃথিবীই একটা প্রহসন। টেলিভিশন স্টুডিও থেকে শুরু করে জঙ্গলের একটা আশ্রম সর্বত্রই একই ব্যাপার। গরিব খালাম্মাকে পিঠে বয়ে নিয়ে ভাড়সুলভ এই পৃথিবীতে আমিই সবচেয়ে বড় ভাঁড়। মেয়েটি হয়ত ঠিকই বলেছিল ছাতার স্ট্যান্ড বয়ে বেড়ানোও ভাল ছিল। মাসে দু'বার হয়ত আমি তার রঙ বদলে খদ্দেরদের কাছে নিয়ে যেতে পারতাম।

"ঠিক আছে, তোমার ছাতার স্ট্যান্ড এ হপ্তায় গোলাপি!" কেউ বলতে পারে।

"নিশ্চয়ই," হয়ত আমার জবাব, "পরের হপ্তায় বৃটেনের রেসিং গ্রিন।"

এমন হতে পারে সংসারে এ রকম মেয়েও আছে যারা গোলাপি রঙের ছাতার স্ট্যান্ড বইছে এমন কারও সাথে বিছানায় যেতে আগ্রহী। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার পিঠে ছাতার স্ট্যান্ড না-থেকে ছিল গরিব খালাম্মা। সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে আমার ও গরিব খালাম্মার ব্যাপারে লোকের আগ্রহ কমতে থাকে। পার্কে দেখা হওয়া সেই বান্ধবী ঠিকই বলেছিল গরিব খালাম্মার ব্যাপারে কারও আগ্রহ নেই।

"তোমাকে দেখলাম টিভিতে," বান্ধবী বলল। আবার আমরা ওই জলাশয়টার ধারে বসেছিলাম। তিন মাস যাবৎ দেখা হয় না তার সাথে। এর মধ্যেই শরৎ আগত প্রায়। সময় ফুরিয়ে আসছে। আমাদের মধ্যে এতো দীর্ঘ অদর্শন আগে কখনো ঘটেনি।

"তোমাকে ক্লান্ত লাগছে খানিকটা।"

"হ্যাঁ।"

"তুমি নিজের ভেতরে ছিলে না।"

মাথা নাড়ি। সত্যিই আমি নিজের মধ্যে ছিলাম না।

“শেষমেষ গরিব খালাম্মাকে খুঁজে পেয়েছিলে?”

“হ্যাঁ।”

বান্ধবী হাসল। হাঁটুর ওপরে রাখা একটা সার্ট নাড়াচাড়া করছিল সে। যেন একটা বিড়াল ওটা।

“এখন কি তাকে আরও ভালভাবে বুঝতে পার?”

“মনে হয় পারি একটু-একটু।”

“কিছু লিখতে সাহায্য করে তোমাকে?”

“নাঃ। লেখার প্রেরণা সেখানে ছিল না। হয়ত কখনোই লিখতে পারব না।”

একটুখানি সময়ের জন্য নীরব থাকে সে।

“আমার মাথায় বুদ্ধি এসেছে একটা, “ শেষে বলল সে, “আমাকে প্রশ্ন কর কয়েকটা। তোমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করব।”

“গরিব খালাম্মা বিশারদ হিসেবে!”

“আ হা,” হাসল সে, “এখনই গরিব খালাম্মা বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই। এরপরে হয়ত আর পারবই না।”

কোথা থেকে শুরু করা উচিত জানি না।

বললাম, “কখনো কখনো ভাবি কী ধরনের মানুষ এই গরিব খালাম্মা । ওভাবেই কি তাদের জন্ম! নাকি তারা বিশেষ গরিব খালাম্মা অবস্থায় উপনীত হয়। কোনো ধরনের

ছারপোকা আছে নাকি যেগুলো মানুষকে গরিব খালাম্মায় পরিণত করে?”

আমার বান্ধবী মাথা ঝাঁকায়, যেন বলতে চায় এগুলো খুব ভাল প্রশ্ন। সে বলল, “ওই একই জিনিস।”

“একই জিনিস?”

“তাই তো। দেখ, একজন গরিব খালাম্মার হয়ত ‘গরিব খালাম্মা বাল্যকাল’ ছিল। হয়ত ছিল না। তাতে কিছু যায় আসে না। লক্ষ লক্ষ ফলের জন্য চারপাশে লক্ষ লক্ষ যুক্তি ভেসে বেড়াচ্ছে। এর কিছু বেঁচে থাকছে, কিছু মারা যাচ্ছে। যুক্তি আসাটা কঠিন কিছু নয়। কিন্তু তুমি এ ধরনের কিছুর জন্য বসে নেই, তাই না?”

“মনে হয় না।”

“কিন্তু তিনি আছেন। এটাই আসল কথা। তোমার গরিব খালাম্মা আছেন। ওই সত্য স্বীকার করতে হবে তোমাকে, মেনে নিতে হবে। এই হচ্ছে গরিব খালাম্মা। তার অস্তিত্বই হচ্ছে তার যুক্তি। ঠিক আমাদের মতো। আমরা এখানে আছি, কোনো বিশেষ যুক্তি ও কারণ ছাড়াই।”

দীর্ঘক্ষণ আমরা কারও সাথে কোনো কথা না-বলে জলাশয়ের ধারে বসে থাকি। শরতের স্বচ্ছ রোদের আলো তার মুখে ছায়া ফেলে।

বান্ধবী বলল, “তোমার পিঠে আমি কী দেখি তা জিজ্ঞেস করবে না?”

“কী দেখ?”

“কিছুই না” সে বলল, “আমি শুধু তোমাকে দেখি।”

“ধন্যবাদ তোমাকে।”

সময়ই আসলে সবকিছু ওলোট পালট করে দেয়। কিন্তু যে-মারটা আমরা অধিকাংশ লোক খাই তা ভয়ঙ্কর রকমের নরম। আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই বুঝতে পারি মার খাচ্ছি আমরা। একজন গরিব খালাম্মার মধ্যে আমরা আসলে সময়ের জুলুমবাজিই প্রত্যক্ষ করি। এটা গরিব খালাম্মাকে কমলার মতো পিষে ফেলে আর তার সবটুকু রস শুষে নেয়। যে-বিষয়টা আমাকে গরিব খালাম্মার প্রতি আকৃষ্ট করেছে তা হচ্ছে তার পরিপূর্ণতা, তার পারফেকশন।

তিনি হিমবাহতে রাখা একটা লাশের মতো, যে হিমবাহের বরফগুলো ইস্পাতের মতো কঠিন। দশ হাজার বছর ধরে রোদের তাপ লাগলেই কেবল এমন হিমবাহ গলে পানিতে পরিণত হতে পারে। কিন্তু কোনো গরিব খালাম্মাই দশ বছর জীবিত থাকেন না। কাজেই তিনি বাঁচেন তার নিখুঁত সত্ত্বার জোরে; তিনি মরেন তার নিখুঁত সত্তা নিয়ে; তিনি সমাহিত হন নিখুঁত সত্তা সমেত।

.

শরতের শেষ দিকে গরিব খালাম্মা আমার পিঠ ত্যাগ করেছিলেন। শীতের আগেই শেষ করতে হবে এমন কিছু কাজের কথা মনে পড়ায় শহরতলীর এক রেলস্টেশন থেকে গরিব খালাম্মাকে পিঠে নিয়ে ট্রেনে চেপেছিলাম। বিকেলের সব ট্রেনের মতো ওটিও ছিল ফাঁকা। ওই প্রথমবারের মতো আমি শহরের বাইরে গিয়েছিলাম, আর জানালা দিয়ে বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করছিলাম। বাতাস ছিল শীতল, দূরের পাহাড় অস্বাভাবিক রকমের সবুজ। রেল সড়কের পাশের গাছগুলোতে উজ্জ্বল লালরঙের জাম ধরেছে।

ওই সফর থেকে ফেরার সময় ট্রেনের ভেতর মধ্য তিরিশ বছরের এক মহিলাকে

দেখলাম। তার সঙ্গে দুটি শিশু সন্তান। বড়জন একটি মেয়ে। তার পরনে নেভি-বু রঙের পোশাক, মাথায় লাল ফিতের ফেল্ট হ্যাট, কোনো কিন্ডারগার্টেনের ড্রেস হয়ত। সে মায়ের বাম পাশে বসেছিল। মায়ের ডান পাশে বসেছিল তার তিন বছরের ছেলে। মা ও বাচ্চা দুটোর ভেতর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তেমন কিছুই ছিল না। তাদের চেহারা সুরত ও পোশাক আশাক খুবই সাধারণ। মায়ের হাতে বড় একটা প্যাকেট। ক্লান্ত লাগছিল তাকে; যদিও অধিকাংশ মাকেই ক্লান্ত দেখায় সব সময়। ট্রেনে চড়বার সময় লক্ষ্যই করিনি তাকে।

একটু পরেই মেয়েটির কথাবার্তা আমার কানে আসতে লাগল। ধার দেয়া কণ্ঠস্বর। কথা বলার দ্রুততা থেকে বোঝা যায় কোনো কিছুর পক্ষে বলতে চাইছে। সে। তখন তার মাকে বলতে শুনলাম, "তোকে না বলেছি ট্রেনের ভেতর চুপ থাকবি।"

"কিন্তু মামনি দেখবে তো আমার হ্যাঁটের অবস্থা কী করেছে সে।"

"চুপ কর। আর একটা কথাও নয়।"

"আমার হ্যাটটা তো বরাবাদ করে দিচ্ছে ও।" প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল মেয়েটি।

"খেলুক না একটু, কী হয়েছে।" ওর মা বলল। মেয়েটি নীরবে কিছুক্ষণ তার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল আর হঠাৎ ওর গালে কষে একটা থাপ্পড় মারল। তারপর হ্যাটটা আঁকড়ে ধরে নিজের আসনে ফিরে এল। ভাইটি কাঁদতে শুরু করলে মা তার মেয়ের উরুতে চটাস করে চটকোনা মারল একটা।

"কিন্তু ও তো আমার হ্যাটটা..."

"কোনো কথা নয়, তুই কেউ নোস আমার। যা বেরিয়ে যা এখান থেকে।"

মেয়েটি তার আসন থেকে উঠে এসে আমার পাশে বসল। মাথা নিচু করে রেখেছে

এখন।

প্রায় সন্ধ্যা তখন। ট্রেনের ছাদ চুঁইয়ে বিষণ্ণ প্রজাপতির ডানা থেকে ঝরে পড়া গুঁড়োর মতো হলুদ আলোর আভা এসে পড়েছে। হাতে বই ছিল একটা। সেটি কোলের ওপর রেখে দীর্ঘক্ষণ হাতের পাতার ওপর তাকিয়ে রইলাম। শেষ করে নিজের হাত দেখেছিলাম? ধোঁয়াটে আলোয় ওগুলোকে ময়লা আর কঠিন লাগল; এত নোংরা যে আমার নিজের হাত বলেই মনে হলো না। হাত দেখার পর মনটা আমার দারুণ বিষণ্ণ হয়ে উঠল : এ ধরনের হাত নিয়ে কেউ সুখী হতে পারে না। কাউকে রক্ষাও করতে পারে না। পাশে ক্রন্দনরত শিশুটির কাঁধে হাত রেখে আশ্বস্ত করতে চাইলাম। হ্যাটটি ছিনিয়ে এনে ভালই করেছে; কিন্তু মেয়েটিকে কিছু বলা সম্ভব হলো না আমার পক্ষে। এতে হয়ত তার ভয় আর বিষণ্ণতা বাড়ত আরও। আর হাত দুটো ছিল খুব নোংরা ।

এর মধ্যেই ট্রেন থেকে নেমে পড়েছিলাম। ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছিল। শিগগিরই সোয়েটার পরার দিন শেষ হয়ে যাবে, মোটা, ভারী কোট নামাতে হবে তোরঙ থেকে। খানিকটা সময়ের জন্য কোট নিয়ে ভাবলাম। সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করলাম একটা নতুন কোট কিনব কিনা। পিঠ থেকে গরিব খালাম্মা উধাও হয়ে গেছেন তা টের পাওয়ার আগেই গেট পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম।

ব্যাপারটা কখন ঘটেছে বুঝতে পারিনি। হঠাৎ যেমন তিনি এসেছিলেন তেমনি হঠাৎ-ই চলে গেলেন। যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানেই গেলেন তিনি। আমি ফিরে এলাম আমার আগের অবস্থায়। নিজের মূল সত্তায়।

কিন্তু আমার আসল সত্তা কী ছিল? এ ব্যাপারে আমি মোটও নিশ্চিত নই। অনুভব করা সম্ভব হলো না এটা অন্য কোনো আমি। অন্য একটি সত্তা আমার আসল সত্তার সঙ্গে যার ভাল রকমের মিল ছিল। এখন তা হলে কী করতে হবে আমাকে? চেতনা লুপ্ত হয়েছে আমার। পকেটে হাত ঢুকিয়ে ফোনে ডায়াল করলাম। নয় বার রিং হওয়ার পর

আমার বান্ধবী ধরল।

“ঘুমুচ্ছিলাম হে।” একটা বড় হাই তুলে বলল সে।

“এই ভরা সন্ধ্যায়?”

“সারা রাত জাগতে হয়েছে একটা কাজে। ঘন্টা দুয়েক আগে শেষ হয়েছে।”

“দুঃখিত, তোমাকে জাগানোর ইচ্ছে ছিল না,” আমি বললাম, “শুনতে অদ্ভুত লাগতে পারে; কিন্তু একথা জানাবার জন্যই ফোন করলাম যে, তুমি এখনও জীবিত। সত্যি বলছি...”

টের পেলাম ফোনের অপর প্রান্তে হাসছে সে।

“ধন্যবাদ,” বলল সে, “ভেবো না এখনও বেঁচে আছি। বেঁচে থাকার জন্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাজগুলো শেষ করছি। যে-কারণে এখন ভীষণ ক্লান্ত আমি। কী স্বস্তি মিলল এবার?”

“হ্যাঁ।”

কোনো গোপন বিষয় আমার সঙ্গে শেয়ার করছে এমন ভাব নিয়ে সে বলল, “জীবন বড় কঠিন হে!”

“জানি তো সে কথা,” বললাম আমি, আমার সঙ্গে ডিনার করতে হয় যে?”

টেলিফোনের অপর প্রান্তে তাকে চুপ করে থাকতে দেখে আমার কল্পনায় এল সে ঠোঁট কামড়াচ্ছে আর তার ছোট-ছোট আঙ্গুল দিয়ে ভ্রূ খুঁটছে।

প্রতিটি অক্ষরে গুরুত্ব দিয়ে সে বলল, “সে হবে ক্ষণ। এখন একটুখানি ঘুমুতে দাও।

খানিকটা ঘুম হলেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। জেগেই ফোন করব তোমাকে, ঠিক আছে?”

“ঠিক আছে। শুভরাত্রি।”

“শুভরাত্রি।”

তারপর খানিকটা দ্বিধা নিয়ে সে বলল, “জরুরি কথা আছে নাকি আমার সঙ্গে?”

“নাহ্, এমন কোনো জরুরি ব্যাপার নয়, পরে বললেও চলবে।”

এ কথা ঠিক যে, বিস্তর সময় আমাদের ছিল। দশ হাজার, বিশ হাজার বছর। অপেক্ষা করতে পারব আমি।

শুভরাত্রি জানিয়ে লাইন কেটে দেয় আমার বান্ধবী। আর সেই সময় তীব্র ক্ষুধা অনুভব করলাম আমি। কিছু না খেলে পাগল হয়ে যাব। মুখে দেওয়ার মতো একটা কিছু হলেই চলবে। কেউ খেতে ডাকলে হামাগুড়ি দিয়ে হাজির হবো তার কাছে। তার আঙ্গুল চেটে সাফ-সুতরা করে দেব। হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। তারপর দেব লম্বা একটা গভীর ঘুম।

ফোনের দিকে ঝুঁকলাম। মন শূন্য করে ফেলে চোখ বন্ধ করলাম। তখন পায়ের আওয়াজ কানে এল- হাজার হাজার পায়ের শব্দ। ঢেউয়ের মতো ওগুলো আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। চলতে লাগল পা গুলো, ক্রমাগত। গরিব খালাম্মা এখন কোথায়? অবাক হয়ে ভাবলাম। কোথায় চলে গেলেন তিনি? আর আমি-ই বা কোথায় ফিরে এলাম?

ঠিক এখন থেকে দশ হাজার বছর পরে যদি এমন এক সমাজ গঠিত হয় যেখানে শুধুমাত্র গরিব খালাম্মারা থাকবে, টাউন হল হবে গরিব খালাম্মাদের নিয়ে। সদস্যরা।

নির্বাচিত হবেন গরিব খালাম্মাদের ভোটে। গরিব খালাম্মাদের জন্য গাড়ি থাকবে, গাড়ি চালাবেনও তারাই। উপন্যাস লিখবেন তারা। তারা কি আমার জন্য দ্বার উন্মোচন করবেন?

তারপরও বলতে হয়, এগুলোর কোনো কিছু দরকার হবে না তাদের। এর বদলে তারা হয়ত নিজেদের তৈরি ভিনিগারের বোতলে বাস করতে চাইবেন। আকাশ থেকে আপনি দেখতে পাবেন লাখ লাখ ভিনিগারের বোতলে পৃথিবী ছেয়ে গেছে। দৃশ্যটা এত চমৎকার হবে যে, আপনার শ্বাস বের করে আনবে।

হ্যাঁ, সে রকমই হবে। আর সেখানে যদি কবিতার কোনো স্থান থাকে তাহলে তা সানন্দে রচনা করব আমি : গরিব খালাম্মাদের জগতের প্রথম রাজকবি। আমি সবুজ বোতলের ওপর সূর্যের আভা আর আর ঘাসের বিশাল সমুদুরের প্রশংসা করে গান গাইব।

কিন্তু সে তো অনেকদিন পরের কথা অর্থাৎ কিনা ১২০০১ সালের ব্যাপার। অপেক্ষার জন্য দশ হাজার বছর একটা দীর্ঘ সময়। সে পর্যন্ত টিকে বর্তে থাকতে অনেক শীতকাল পাব আমি!

ঘুম

ঘুম

গত সতের দিনে এক ফোঁটাও ঘুমাইনি আমি।

ইনসমনিয়ার কথা বলছিনে। ওটা কী জিনিস সে আমি জানি। কলেজ জীবনে এ-রকম একটা ব্যাপার হয়েছিল। এ-রকম একটা ব্যাপার' বললাম এ জন্য যে, সে সময় আমার ঠিক কী হয়েছিল আমি নিশ্চিত ছিলাম না, আর যা হয়েছিল লোকে তাকে ইনসমনিয়া বলে অভিহিত করে কিনা। আমার ধারণা ডাক্তার তা বলতে পারবে। কিন্তু আমি কোনো ডাক্তার দেখাইনি। জানি তাদে লাভ হতো না। ও রকম ভাবার কোনো কারণ অবশ্য নেই। এটাকে নারী সুলভ তাৎক্ষণিক উপলব্ধি বলা যায় আমার কেন যেন মনে হয়েছে ডাক্তার কিছু করতে পারবে না। কাজেই কোনো ডাক্তারের শরণাপন্ন হইনি কিংবা বাবা-মা বন্ধুবান্ধবদের ব্যাপারটা বলিনি। কারণ তারা ঠিক কী বলবে সে আমার ভাল করে জানা।

তখন থেকেই ইনসমনিয়ার মতো ব্যাপারটা মাসখানেক ধরে চলে। এই সময়টাতে এক ফোঁটাও ঘুমাতে পারিনি। রাতে বিছানায় গিয়ে শুয়েছি আর নিজেকে বলেছি, "ঠিক আছে চলো ঘুমানোর সময় হয়েছে। এই তো ব্যাপার। তারপর উঠে পড়তে হয়েছে আমাকে। তাৎক্ষণিক একটা ব্যাপার কন্ডিশন্ড রিফ্লেক্স-এর মতো। ঘুমানোর জন্য যত বেশি চেষ্টা

করেছি তত বেশি আমাকে নিঘুম থাকতে হয়েছে। মদ পান করেছি, খেয়েছি ঘুমের বড়ি; কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। শেষ পর্যন্ত যখন ভোরের আকাশ লাল হয়েছে, ভেবেছি হাল ছেড়ে দেয়া উচিত আমার। তার মানে। ঘুম আমার আসেনি। আমার আঙ্গুলের ডগা ঘুমের প্রান্তরেখাকে সামান্য একটুখানি ছুঁয়ে গেছে মাত্র। আর সে সময়টাতে আমার মন জেগে ছিল। ঝিমুনির একটা আভাস পেয়েছি; কিন্তু আমার মন তখনও সেখানে ছিল। আমার শরীরী সত্তা সকালের ক্ষীণ আলোর ভেতর ভেসে যাচ্ছে এবং সারাক্ষণ সেটা অনুভব করল আমার মন তার ঠিক পাশেই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, নিশ্বাস নিচ্ছে। ঘুমের প্রান্ত সীমায় আমি একই সাথে একটি শরীর, আর মন যে কিনা জেগে থাকতে বদ্ধ পরিকর।

এই অসমাপ্ত ঝিমুনি ক্রমাগত চলত সারাদিন। সারাক্ষণ আমার মাথাটা জ্যাম হয়ে থাকত। চারপাশের কোনো জিনিসের ওপর সঠিকভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারতাম না, নির্ধারণ করতে পারতাম না তাদের দূরত্ব অথবা পরিমাণ কিংবা সময়কাল। ঝিমুনি আমাকে হামলা করত থেমে-থেমে- সাবওয়েতে, ক্লাসরুমে আর খাবার টেবিলে। দেহ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেত মন। দুনিয়াটা নিঃশব্দে কাঁপত। জিনিসপত্র পড়ে যেত হাত থেকে। নিজের দেহখানা বিছানায় নিক্ষেপ করে ঘুমাতে চাইতাম শুধু। কিন্তু ঘুম আসত না। অনিদ্রা সব সময় আমার পাশে থাকত। দারুণ শীতল একটা ছায়ার অস্তিত্ব অনুভব করতাম। আমার নিজেরই ছায়া ছিল সেটা। ব্যাখ্যাতীত সব ব্যাপার। ঝিমুনি আমার ওপর দখল নিলে ভাবতাম, নিজের ছায়ার ভেতরেই আছি। ঝিমুনির মধ্যেই হাঁটতাম, খেতাম, লোকজনের সঙ্গে কথা বলতাম। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার ছিল যে, আমার ওজন সেই মাসে পনের পাউন্ড কমে গেলেও কেউ টের পায়নি, কেউ না। পরিবারের কেউ, বন্ধুবান্ধব, ক্লাসমেট কেউ বোঝেনি ভয়ানক এক নিদ্রাহীনতায় জীবন কাটাচ্ছি আমি।

আক্ষরিক অর্থে এটা ঠিক যে, আমি নিদ্রাহীনতায় জীবন কাটাচ্ছি। পতিত মৃতদেহের চেয়ে বেশি অনুভূতি আমার শরীরে নেই। এই পৃথিবীতে আমার অস্তিত্ব যেন একটা

হ্যাঁলুসিনেশন, প্রবল বাতাস আমাকে ভাসাবে, আমার শরীর পৃথিবীর একেবারে শেষ মাথায় উড়ে যাবে, এমন এক জায়গায় সেখানে যাইনি আমি কিংবা শুনিনি তার নাম; ওখানে আমার মন ও শরীর চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। নিজেকে বলব, শক্ত করে ধরো, কিন্তু ধরার মতো কিছুই থাকবে না।

আর রাত এলে তীব্র জাগরণ ফিরে আসে। ওই জেগে থাকা মোকাবিলা করতে আমি অক্ষম। বিশাল কোনো শক্তির দ্বারা আমি যেন বন্দি। যা আমি করতে পারি তা হচ্ছে- অন্ধকারে চোখ খোলা রেখে সকাল অবধি জেগে থাকা। এমন কী চিন্তা করার শক্তিও থাকে না। শুয়ে শুয়ে শুনতে পাই ঘড়ির কাঁটার এগিয়ে যাওয়ার শব্দ।

এবং একদিন তা শেষ হয়। কোনো রকম হুঁশিয়ারি ছাড়া, কোনো রকম বাহ্যিক কারণ ছাড়া। নাশতার টেবিলে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলি। কিছু না বলে উঠে দাঁড়াই। টেবিলে টোকা মারতে পারি। মনে হয় কেউ কিছু বলবে; কিন্তু নিশ্চিত হতে পারি না। নিজের ঘরের ভেতর টলতে-টলতে হাঁটি, হামাগুড়ি দিয়ে বিছানায় যাই, এবং তারপর গভীর নিদ্রার ভেতর ডুবে যাই। সাতাশ ঘন্টা ওইভাবে থাকি। আমার মা ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। আমাকে জাগানোর জন্য প্রবলভাবে নাড়াতে থাকেন। আমার গালে থাপ্পড় মারেন; কিন্তু কোনো রকম বিরতি ছাড়াই ঘুমের ভেতর সাতাশ ঘন্টা পার করে দেই। জেগে উঠে আবার সেই আমার আমিকে ফিরে পাই, সম্ভবত...।

কেন আমি এমন নিদ্রাহীনতার মধ্যে চলে গিয়েছিলাম, কেনই বা আবার তা সেরে যায় জানি না। ঘন কালো মেঘের মতো ছিল ওটা, বাতাসের তোড়ে ভেসে এসেছিল- পুরুষ্টু এক গাদা কালো মেঘ, ভয় জাগানিয়া সব উপাদানে ভরা, যে ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। কেউ জানে না এমন জিনিস কোত্থেকে আসে আবার কোথায় চলে যায়। আমি শুধু এইটুকু নিশ্চিত যে, ওটা আমার ওপর ভর করেছিল, তারপর চলে গিয়েছিল।

যে কোনো ভাবেই হোক, ইনসমনিয়ার মতো ওই ব্যাপারটা এখন আর আমার মধ্যে নেই। শুধু ঘুমাতে পারি না। এক সেকেন্ডের জন্যও না। ওইটুকু ছাড়া আমি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ঘুম ঘুম ভাব নেই, আর মনটা ঠিক আগের মতো পরিষ্কার। শারীরিকভাবেও আমি স্বাভাবিক: ভাল খিদে হয়; অবসন্ন হয়ে পড়ি না। সব ধরনের বাস্তবতার নিরিখে বিচার করলে দেখা যায় কিছুই নেই আমার মধ্যে। কেবল শুধু ঘুমাতে পারি না।

আমার না-ঘুমানোর ব্যাপারটা আমার স্বামী বা আমার ছেলে খেয়াল করেনি। আমিও তাদের কিছু বলিনি। ডাক্তার দেখানোর ব্যাপারেও কোনো আগ্রহ নেই আমার। জানি ডাক্তার কিছুই করতে পারবে না। আমি জানি। সেই আগের মতো। ব্যাপারটাতো আমার নিজের!

কাজেই তাদের মধ্যে কোনো সন্দেহের সঞ্চার হয়নি। ওপরে ওপরে আমাদের জীবন ধারা ছিল অপরিবর্তিত। শান্তিতে ভরা। একেবারে রুটিন মাফিক। স্বামী ও ছেলেকে সকালে নাশতা খাইয়ে বিদায় করার পর গাড়িটা নিয়ে বাজার করতে বের হই। আমার স্বামী একজন ডেন্টিস্ট। আমাদের বাসা থেকে তার অফিস মাত্র দশ মিনিটের পথ।

সে ও তার এক ডেন্টিস্ট বন্ধু মিলে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। ভালই চলছে। সেটা। তবে ব্যাংক থেকে বিস্তর টাকা ঋণ নিতে হয়েছে কারণ, দন্ত চিকিৎসার সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি জোগাড় করার জন্য প্রচুর বিনিয়োগের দরকার হয়। আর ওখানে প্রতিযোগিতাও খুব বেশি। দরজা খোলার সাথে সাথে দলবেঁধে রোগী আসে। না। রোগীর অভাবে অনেক ডেন্টাল ক্লিনিক বন্ধ হয়ে যায়।

আমাদের যৌবনকালে আমরা দরিদ্রই ছিলাম বলা যায়। সবে আমাদের ছেলেটা হয়েছে। এই কঠিন পৃথিবীতে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা কেউ আমাদের দেয়নি। তারপরেও পাঁচটি বছর কেটে গেছে। না, অভিযোগ করার কিছু নেই আমাদের, যদিও তিনভাগের দু'ভাগু ঋণ এখনও শোধ করা হয়নি।

আমি আমার স্বামীকে প্রায়ই বলি, “জানো তুমি কেন এত বেশি রোগী পাও? তোমার চেহারা খুব সুন্দর।” সামান্য ঠাট্টা আর কী। তার চেহারা মোটেও ভাল নয়। সত্যিকথা বলতে কী সে দেখতে অদ্ভুত। এখনও মাঝে মাঝে আমার মনে হয় এমন অদ্ভুত দর্শন মানুষকে আমি কেন বিয়ে করতে গেলাম। আমার কয়েকজন ছেলে বন্ধু ছিল। দেখতে তারা ওর চেয়ে অনেক ভাল ছিল।

কী কারণে তার চেহারা অদ্ভুত তা কিন্তু বলতে পারব না। সুদর্শন চেহারা নয় ওটি, আবার কুৎসিতও নয়...। একবার আমি তার ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছিলাম; কিন্তু পারিনি। স্মরণ করতে পারব না তখন দেখতে সে কেমন ছিল। খাতা-পেন্সিল নিয়ে তার সামনে বসেছিলাম শুধু, একটা আঁচড়ও দিতে পারিনি। আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। এত দীর্ঘ সময় একটা লোকের সঙ্গে থেকেও তার চেহারা মনে করতে পারিনি। কী করার ছিল আমার? শুধু একটা ব্যাপার মনে করতে পেরেছিলাম তার চেহারাটা অদ্ভুত। ওই স্মৃতি এখনও আমাকে নার্ভাস করে তোলে। তারপরও বলতে হয়, সে এমন একজন মানুষ সবাই তাকে পছন্দ করে। ওটা তার ব্যবসার বড় একটা প্লাস পয়েন্ট। তবে আমার ধারণা, যে কোনো ব্যাপারে তার সাফল্য অনিবার্য। তার সঙ্গে আলাপ করে লোকে নিরাপদ বোধ করে। এমন লোক আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। আমার সব বান্ধবী-ই তাকে পছন্দ করে। সে আমারও খুব প্রিয়। আমার বিশ্বাস তাকে আমি ভাল-ই বাসি। কিন্তু, কঠোরভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, আমি তাকে ঠিক পছন্দ করি না।

যা-ই হোক। সে স্বাভাবিকভাবে হাসে। খুব নিষ্পাপ সেই হাসি- শিশুদের মতো। অনেক পরিণত বয়স্ক লোকের পক্ষেই ওরকমভাবে হাসা অসম্ভব। আমার অনুমান সবাই ডেন্টিস্ট সাহেবের চমৎকার দাঁত প্রত্যাশা করে- তা তার আছে।

ঠাট্টা-মস্করা করার সময় সে সব সময় বলে, আমি দেখতে ভাল এটা কি আমার দোষ? আমরাই শুধু বুঝি আসলে এর প্রকৃত অর্থ কী। এটা হচ্ছে সত্যের স্বীকৃতি বেঁচে থাকার

জন্য এসব করতে হয় এবং এটা আমাদের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ আচার।

সকাল ঠিক সাড়ে আটটায় সে পার্কিং থেকে গাড়ি বের করে। আমার ছেলে ওর পাশের সিটে বসে। অফিসে যাওয়ার পথেই পড়ে ছেলের প্রাথমিক বিদ্যালয়টি। যাওযার সময় আমি বলি, "সাবধানে থেকো।" সে বলে, "ভেবো না।" সব সময় আমরা এই এক কথাই বলি। আমার স্বামী গাড়ির স্টেরিওতে হাইডেন কিংবা মোসার্টের ক্যাসেট ঢোকায় এবং সঙ্গীত শুনতে শুনতে গাড়ি চালায়।

আমার দু'জন পুরুষ' বিদায় নেয়ার সময় হাত নাড়ে। একই ভাবে তাদের হাত নড়াচড়া করে। খুবই রহস্যজনক আর অদ্ভুত একটা ব্যাপার। একই অ্যাঙ্গেলে তারা নিজেদের মাথা ঝাঁকায় আর হাত বাড়িয়ে দেয় আমার দিকে, একই ভাবে নিজেদের আসনে বসে মোড়ামুড়ি করে, যেন তারা কোনো নৃত্যশিক্ষকের কাছে প্রশিক্ষণ নিয়েছে।

আমার নিজেরও গাড়ি আছে- হোন্ডা সিভিক। বছর দুয়েক আগে এক বান্ধবীর কাছ থেকে কিনেছি। একটা বাম্পার ভাঙ্গা। পুরানো মডেলের গাড়ি। মাসে একবার দু'বার স্টার্ট নিতে চায় না। তারপরেও বলতে হয় কাজ চালিয়ে নেয়া যায়।... এই তো আমার জীবন। আমার স্বামী অবশ্য গাড়িটাকে বলে—"গাধা। কী আর করবে ওটাতো আমারই।"

সুপার মার্কেট থেকে জিনিসপত্র কিনে এনে ঘরদোর সাফ করি। কাপড় ইস্ত্রি করি। তারপর লাঞ্চ বানাই। খুব দ্রুততা আর দক্ষতার সাথে ঘর কন্যার কাজ সামলাই। সম্ভব হলে সকালের দিকেই ডিনার তৈরির কাজটা এগিয়ে রাখি। বিকেলটা সম্পূর্ণরূপে আমার।

আমার স্বামী বাইরের খাবার পছন্দ করে না। খেতে সে দুপুরে বাসায় আসে। সে বলে, রেস্তোরাঁগুলোতে ভিড় থাকে খুব আর খাবারের মানও ভাল না। কাপড় চোপড়ে

তামাকের গন্ধ লেগে যায়। যেতে-আসতে অতিরিক্ত সময় ব্যয় হলেও বাসাতেই খাওয়া পছন্দ করে সে। এখনও বাসায় আমি কোনো সৌখিন খাবার তৈরি করিনি। বেঁচে যাওয়া খাবার তুলে রাখি কিংবা একপট নুডলস সেদ্ধ করে নেই। কাজেই এসব করতে বেশি সময় ব্যয় হয় না। একা-একা কারও সঙ্গে কথা না বলে। খাবার খাওয়ার চেয়ে স্বামীর সঙ্গে খেতে আমি বেশি মজা পাই।

আগে অর্থাৎ যখন আমাদের ক্লিনিকে বেশি রোগীর আনাগোনা ছিল না, আমরা দু'জনে লাঞ্চ করে শুয়ে পড়তাম। ওটা ছিল আমাদের জীবনের সবচেয়ে চমৎকার সময়। চারপাশটা থাকত নীরব নিস্তব্ধ। বিকেলের নরম রোদ ঢুকত ঘরের ভেতর। তখন আমাদের বয়স অনেক কম ছিল, আমরা আরও বেশি সুখী ছিলাম। এখনও আমরা সুখী। সত্যিই আমি তাই মনে করি। সংসারের গোলমালের কোনো ছায়া পড়ে না আমাদের গৃহে। তাকে আমি ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি। আমি নিশ্চিত সে-ও আমার ব্যাপারে একই মনোভাব পোষণ করে। তবে আস্তে আস্তে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আর বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর মানুষের জীবনে পরিবর্তন আসে। ব্যাপারটা এমন-ই। আপনার আমার কিছু করার নেই। এখন বিকেলের অবকাশটুকু আর নেই। খাওয়া শেষ হলে আমার স্বামী কর্মস্থলে ছোটে। অসুস্থ দাঁত নিয়ে রোগীরা তার জন্য অপেক্ষা করে। এমনি করেই চলে সবকিছু। আমরা দুজনেই জানি নিজেদের মতো করে সবকিছু আমরা পাব না।

আমার স্বামী চলে যাওয়ার পর আমি তোয়ালে আর স্নানের পোশাক নিয়ে পাশের একটা স্পোর্টস ক্লাবে চলে যাই। আধা ঘন্টার মতো সাঁতার কাটি। সাঁতারের ব্যাপারে আমার উন্মাদনা নেই। শরীরটা শুধু ফিট রাখতে চাই। নিজের দেহখানা আমি খুবই ভালবাসি। তবে নিজের চেহারাটা পছন্দ নয় আমার। নেহাত খারাপও নয় আমার চেহারা; কিন্তু কখনোই আমার মনে হয়নি ওটা আমি পছন্দ করি। শরীরের ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা। আয়নার সামনে নগ্ন হয়ে দাঁড়াতে ভাল লাগে; শরীরের কোমল আকার আকৃতি পরীক্ষা

করতে চাই। সেখানে সুষম প্রাণশক্তি খুঁজে পাই। ওটা কী সে সম্পর্কে নিশ্চিন্ত নই, তবে অনুভব করি ভেতরে এমন একটা কিছু আছে যা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ওটা যা-ই হোক না কেন, হারাতে চাই না।

আমার বয়স এখন তিরিশ। তিরিশে পা দিয়ে আপনি অনুধাবন করেন জীবন এখানেই শেষ নয়। বয়স বাড়ায় আমি সুখী নই, তবে এটা কিছু ব্যাপারকে বেশ সহজ করে দেয়। এটা দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। একটা ব্যাপার নিশ্চিত জানি- তিরিশ বছরের কোনো নারী তার শরীর ঠিক রাখতে চাইলে তাকে বিস্তর চেষ্টা তদবির করতে হয়। মায়ের কাছ থেকে এটা শিখেছি। তিনি একজন হালকা পাতলা সুন্দরী মহিলা ছিলেন। কিন্তু এখন আর তা নেই। আমি চাই না আমারও এমন হোক।

সাঁতার কাটার পর বিকেলের বাকি সময় নানাভাবে অতিবাহিত করি। কখনো কখনো স্টেশন প্লাজা আর দোকানগুলোতে ঘুরে বেড়াই। কোনো সময় আবার বাসায় ফিরে গিয়ে সোফায় শুয়ে বইটই পড়ি, রেডিও শুনি কিংবা শুধুই বিশ্রাম নেই। এরমধ্যেই আমার ছেলে স্কুল থেকে ফিরে আসে। ওকে কাপড় বদলাতে সাহায্য করি। খাওয়া দাওয়া করে ও বন্ধুদের সাথে খেলতে যায়। বয়স কম বলে বৈকালিক। বিদ্যালয়ে দেইনি ওকে কিংবা পিয়ানো শিখতে দিচ্ছি না।

আমার স্বামী বলে, “খেলতে দাও ওকে। স্বাভাবিকভাবে বড় হয়ে উঠুক সে।” সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে ডিনার বানানোর কাজে লেগে যাই। ছ’টার দিকে ছেলেটা ফিরে আসে। টিভিতে কার্টুন দেখতে বসে। জরুরি কোনো রোগী না এলে আমার স্বামী সাতটার মধ্যেই ঘরে ফিরে আসে। মদ সে মোটেও খায় না, অকারণ সামাজিকতা তার পছন্দ নয়। কর্মস্থল থেকে সোজা বাসায় ফিরে আসে।

ডিনার টেবিলে বসে আমরা সারাদিনের কাজকর্ম নিয়ে গল্প করি। আমার ছেলে সবচেয়ে বেশি বলে। তার জীবনে যা কিছু ঘটে তা সব সময়ই নতুন আর রহস্যময়।

সে বলে আর আমরা মন্তব্য করি। ডিনারের পর সে টিভি দেখে, পড়ে কিংবা বাবার সঙ্গে খেলে। বাড়ির কাজ থাকলে দরজা বন্ধ করে তা করে সে। সাড়ে আটটায় ঘুমিয়ে পড়ে।

তখন আমরা স্বামী-স্ত্রী একত্র হই। সে সোফায় বসে খবরের কাগজ পড়ে আর আমার সঙ্গে কথা বলে। তারপর সে হাইডেন কিংবা মোৎসার্টের সঙ্গীত শোনে। তার ওই সঙ্গীত শ্রবণে কিছু মনে করি না আমি; কিন্তু ওই দুই সঙ্গীতজ্ঞের মধ্যে পার্থক্যের ব্যাপারটা কোনো সময় বলতে ইচ্ছে হয় না তাকে। দু'জনকে একই রকম মনে হয়। আমার। এ কথা আমার স্বামীকে বললে সে জানায়, এতে কিছু যায় আসে না।

"ওগুলো চমৎকার- শুধু ওটাই ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে।"

"ঠিক তোমার মতো।" বলি আমি।

সে বিশাল একটা হাসি দিয়ে বলে, "ঠিক আমার মতো?" মনে হয় যথার্থ খুশি হয়েছে সে।

হ্যাঁ, ওই রকমই ছিল আমার জীবন অথবা বলা যায় নিদ্রাহীনতা শুরু হওয়ার আগের জীবন ওরকম ছিল। সব সময় ডাইরি লিখতাম। দু তিন দিন লেখা বাদ পড়ে গেলে সে দিনের ঘটনা মনে রাখতে পারতাম না। গতকালের ঘটনার জায়গায় হয়ত তার আগের দিনের ঘটনা বা আগের দিনের ঘটনা গতকালের তারিখে লিখে ফেলতাম। কখনো কখনো মনে হতো এ কেমন ধারার জীবন আমার? যখনই ওরকম মনে হতো বাথরুমের আয়নায় নিজের মুখ দেখতাম- একটানা পনের মিনিট ধরে নিজের চেহারা অবলোকন করতাম। আমার মনটা পুরো ফাঁকা লাগত। শরীরী সত্তা হিসেবে নিজের চেহারা দেখতাম। ধীরে ধীরে তা আমার বাকি সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত...।

কিন্তু এখন আর আমি ঘুমাতে পারি না। নিদ্রাহীনতা শুরু হওয়ার পর থেকে আর

ডাইরি লিখি না।

প্রথম যে রাতটাতে ঘুমানোর ক্ষমতা হারিয়েছিলাম সে রাতটির কথা স্পষ্ট মনে আছে আমার। একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম যেটা ছিল গা ঘিনঘিন করা, অন্ধকার ছোট একটা স্বপ্ন। বিষয়টা ভুলে গেছি, তবে মনে আছে কী অশুভ আর ভয়ঙ্কর ছিল সেই স্বপ্ন। পরমক্ষণে জেগে উঠেছিলাম। শুরুটা সম্পর্কে পুরোপুরি সজাগ ছিলাম, যেন কোনো কিছু আমাকে পেছনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে...।

'ওটা ছিল এক স্বপ্ন,' আপন মনে বলি আমি। স্থির শুয়ে থাকি, অনুভব করি আমার হার্ট প্রচণ্ডভাবে কাজ করছে। আমার ফুসফুস হাপরের মতো সংকুচিত হয়ে অতিদ্রুততার সঙ্গে রক্ত সঞ্চালন করছে হৃদপিণ্ডে। আশ্চর্য হয়ে ভাবছিলাম কটা বাজে। বালিশের পাশে রাখা ঘড়িটা দেখতে চাইছিলাম, কিন্তু ঘাড় ঘোরাতে পারছিলাম না। ঠিক তখনই বিছানার কিনারায় অস্পষ্ট, কালো একটা ছায়া আমার চোখে পড়ল। সেই ছায়াটা দেখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালালাম। যখনই তার দিকে দৃষ্টিপাত করলাম তখনই ওটা একটা সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করতে লাগল, যেন আমার দৃষ্টি আকর্ষণের অপেক্ষায় ছিল। ওটার আকৃতি স্পষ্ট হচ্ছিল আর সারবস্তু যুক্ত হচ্ছিল তাতে, তারপর হচ্ছিল পরিপূর্ণ। ওটা ছিল এক কংকালসার এক বুড়ো, পরনে টাইট একটা কালো সার্ট। চুল ধূসর আর ছোট। চোয়াল ভেতরে ঢুকে আছে। সে আমার পায়ের কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল কিছুই বলেনি আমাকে, তবে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল স্থির চোখে। চোখগুলো বড় বড়, চোখের শিরাগুলো আমি দেখেছিলাম। বৃদ্ধের চেহারায় কোনো অভিব্যক্তি ছিল না।

ওটা কোনো স্বপ্ন ছিল না, ছিল একটা বাস্তবতা। ওই বৃদ্ধকে কোনো দিনও দেখিনি। কাজেই আমার একটা কিছু করা উচিত ছিল- বাতি জ্বালানো, আমার স্বামীকে ডেকে তোলা কিংবা চিৎকার করা; নড়াচড়া করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু পারিনি। একটা আঙ্গুল পর্যন্ত নাড়াতে পারিনি। যখন ভাবলাম নড়াচড়া করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়,

এক ধরনের আশাহত ভয় আমাকে গ্রাস করেছিল। এ রকম ব্যাপার আমার জীবনে কখনো হয়নি। চিৎকার করতে চেষ্টা করেছিলাম; কোনো রকম শব্দ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। শুধু বৃদ্ধ লোকটির দিকেই তাকিয়ে থাকতে পেরেছিলাম। তার হাতে ছিল একটা কলস। কিছুক্ষণ পরে সে কলসটি উঁচু করে ধরে আমার পায়ে পানি ঢালতে লাগল। কিন্তু পানি পড়ার শব্দ শুনলেও অনুভব করতে পারলাম না যে আমার পায়ে পানি পড়ছে। সে পানি ঢালতে ঢালতে কলসটা খালি করে ফেলল। ভয় হলো পানির চাপে আমার পা দুটো না গলে যায়। এক সময় তা আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে চোখ দুটো বন্ধ করে শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠলাম; কিন্তু ওই শব্দ বেরুল না। আমার শরীরের ভেতরে তা প্রতিধ্বনিত হতে লাগল আর ছিঁড়ে ফেলতে লাগল আমাকে...।

যখন চোখ খুলোম, বৃদ্ধ লোকটি চলে গেছে। কলসটিও নেই। বিছানার চাদর শুকনো, পায়ের পাতা ভেজার কোনো চিহ্ন নেই। ঘেমে নেয়ে উঠেছি। প্রথমে একটা আঙ্গুল নাড়ালাম, তারপর আর একটা, পরে সবক'টা। হাত-পা নাড়লাম, মাথা বাঁকালাম। আগের মতো কাজ করছিল না অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তবুও তো নাড়ানো যাচ্ছিল কিছুটা। বিছানায় উঠে বসলাম। ডিমলাইটের মৃদু আলোতে সারা ঘরে একবার চোখ বুলালাম। বৃদ্ধ লোকটি নিশ্চয়ই আশপাশে নেই।

ঘড়িতে তখন সাড়ে বারোটা বাজছিল। দেড় ঘন্টার মতো সময় ঘুমের মধ্যে ছিলাম। আমার স্বামী অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছে যথারীতি। তার নিশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। প্রায় কোনো কিছুই ওই ঘোর নিদ্রা থেকে জাগাতে পারবে না তাকে।

বাথরুমে ঢুকে ভাল করে স্নান করে পরিষ্কার কাপড় চোপড় পরে লিভিং রুমে গিয়ে আলো জ্বালালাম। পুরো এক গ্লাস ব্র্যান্ডি পান করলাম। তার মানে এই নয় যে, আমার স্বামীর মতো অ্যালকোহলের সাথে আমার শারীরিক অসামঞ্জস্য আছে। এক সময় আমি

বিস্তর পান করেছি; কিন্তু বিয়ের পর পানাভ্যাস প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। ঘুমটুম না হলে এক-আধটু খাই, তবে আজ মনে হলো পুরো গ্লাস না খেলে আমার স্নায়ু ঠাণ্ডা হবে না। আমার ঘরে সব সময়ই এক বোতল রেমি মার্টিন থাকে। উপহার হিসেবে এ-ও দেয়।

মনে হলো আমার ভেতর একটা ঘোরের সৃষ্টি হয়েছে। ঘোর লাগার ব্যাপারটা আমি আমার কলেজের এক বান্ধবীর কাছে শুনেছিলাম। আমার নিজের এই অভিজ্ঞতা ছিল না। সে বলেছিল, সব কিছুই ছিল দারুণ স্পষ্ট। বিশ্বাসই করা যায় ওটা স্বপ্ন। আমার বিশ্বাসই হয়নি ওটা স্বপ্ন, এখনও আমার মনে হয় না ওটা স্বপ্ন ছিল। স্বপ্নের মতো ছিল ওটা, তবে স্বপ্নের কোনো অনুভূতি ছিল না।

ভয় কেটে গেলেও আমার শরীরের কাঁপুনি তখনও ছিল। আমার চামড়ার ভেতরে চলে গিয়েছিল তা; ভূমিকম্পের পর জলের ওপর ঘূর্ণায়মান তরঙ্গের মতো। চোখ বন্ধ করে মুখভর্তি করে ব্র্যান্ডি নিলাম। গলা থেকে উদর অবধি উষ্ণ করে দিল, একেবারে সত্যিকারের অনুভব।

ছেলের কথা মনে হতেই হৃদকম্পন শুরু হলো। দ্রুত ওর ঘরে গেলাম। মুখের ওপর হাত রেখে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সে। আমার স্বামীর মতো সুখে নিদ্রায় ডুবে আছে। তার গায়ের কম্বলটা টেনে টুনে দিলাম। আর তখনই প্রচণ্ড ঘুম নেমে এল আমার চোখে। যেন ঘুম হামলা করল আমার ওপর।

লিভিংরুমে ফিরে গিয়ে অবাক হয়ে ভাবলাম ব্যাপারটা, কিন্তু তখন আর আমার মধ্যে সেই ঘুম ঘুম ভাবটা ছিল না। আরও এক গ্লাস ব্র্যান্ডি পানের সিদ্ধান্ত নিলাম। মনে হলো পান করে করে নার্ভগুলোকে ঠাণ্ডা করিয়ে দেই। কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর ওই সিদ্ধান্ত বাতিলের মতলব এল আমার মনে। ফ্রিজ থেকে কয়েকটা স্ট্রবেরি বের করে। খেলাম। অনুভব করলাম শরীরের কাপুনিটা অনেকাংশে কমে গেছে।

কে ছিল ওই বুড়ো লোকটা? জীবনেও তো দেখিনি তাকে। কেন সে আমার পায়ের পাতায় পানি ঢেলেছিলো? শুধু প্রশ্নই ছিল মনে, কোনো উত্তর ছিল না।

আমার বান্ধবীর সেই ঘোরের সময়টাতে ও ছিল তার বাগদত্তার বাড়িতে। ঘুমিয়ে থাকার সময় প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সের একটা লোক এসে হাজির হতো আর তাকে ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হুকুম দিত। এ সব যখন ঘটত সে তার কোনো পেশী নাড়াতে পারত না। আমার মতো তার খুব ঘাম হতো। ওর ধারণা ছিল ওই লোকটা ছিল ওর বাগদত্তার বাবা।

কিন্তু আমার মধ্যে কোনো ঘোর নেই। আর আমি আছি নিজের বাড়িতে। এখানে। ধমক ধামকি দেয়ার মতো কেউ নেই। তাহলে ঘোর লাগবে কেন আমার?

তখন নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করি ওটা সত্যিই একটা স্বপ্ন। এর বেশি কিছু নয়। সম্ভবত অবসাদে আক্রান্ত হয়েছি। সেদিন যে টেনিস খেলেছিলাম তার প্রভাবে নিশ্চয়ই হয়েছে এটা। তারপর থেকেই আমার হাত ও পা কেমন যেন অবশ হয়ে আসছিল।

স্ট্রবেরি খাওয়া শেষ হলে সোফার ওপর গা এলিয়ে দিলাম। ঘুম ঘুম লাগছিল না মোটেও। ভাবলাম আবার ক্লান্ত হয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত একটা বই পড়ি। বেডরুমের সেলফ থেকে একটা উপন্যাস বের করে আনলাম। আলো জ্বালানোর সময় আমার স্বামী একবার এদিক-ওদিকও সরলো না। যে বইটি বের করলাম তার নাম 'অ্যানাকারনিনা। একটা দীর্ঘ উপন্যাস পড়ার মুড তৈরি হয়েছিল আমার মধ্যে। ওই বইটি অবশ্য স্কুল জীবনে একবার পড়েছি। বইয়ের একটি লাইন আমার স্পষ্ট 16 OC All happy families resemble one another, every uphappy family is unhappy in its own way. উপন্যাসের নায়িকা শেষে ট্রেনের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সোফায় শুয়ে বইটি খুলি। বিকেলের দিকে অবসর থাকলে অবশ্য এক-আধ ঘন্টা বই

পড়ি। সেটাকে ঠিক পড়া বলা চলে না। তখন সংসারের নানা কথা মাথায় এসে ভিড় জমায়। এসব ভাবতে ভাবতে সময় দ্রুত ফুরিয়ে যায়, তখন আর বইয়ের পাতায় মনোনিবেশ করা যায় না। এভাবেই বইটই না পড়ে জীবন চলছে আমার। আশ্চর্যের ব্যাপার না। এখন আমার মনে হয় সেই কথা। তরুণ বয়সে বই ছিল আমার জীবনের বড় একটা ব্যাপার। লাইব্রেরি থেকে নিয়ে পড়তাম আবার বই সংগ্রহের জন্য আমার মাসিক বরাদ্দের বড় একটা অংশ খরচ হয়ে যেত। এমন কী বই কেনার জন্য নাশতা খাওয়া বাতিল করতে হতো অনেক সময়। আমার পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে এ রকম বই পড়ার নেশা আর কারও ছিল না। বাবা-মা দুজনেই। কাজ করতেন; আমার ওপর কারও মনোযোগ ছিল না। বই পড়ার জন্য অনেক পুরস্কার আর সার্টিফিকেট পেয়েছি। কলেজে আমার বিষয় ছিল ইংরেজি সাহিত্য। ভাল গ্রেডও পেয়েছিলাম। গ্রাজুয়েশন করার সময় ক্যাথরিন ম্যান্সফিল্ডস-এর ওপর থিসিস করেছিলাম। অনার্সে জুটেছিল ভাল ফল। গাইড আমাকে আরও পড়াশুনা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমিও পৃথিবীটা দেখতে বেরিয়ে পড়তে চেয়েছিলাম। তবে জানতাম পাণ্ডিত্য আমার মধ্যে নেই, শুধু পড়তে আমার ভাল লাগত এই আর কী...।

কবে আমার এই পড়ার জীবনের অবসান ঘটে? কেন মানুষের জীবনের এমন আমূল পরিবর্তন ঘটে? আর ওইসব আবেগের কী মূল্য ছিল আমার জীবনে?

তবে ওই রাতে অখণ্ড মনোযোগের সাথে অ্যানাকারনিনা পাঠের মনোবল আমার ভেতর ছিল। মস্কো রেল স্টেশনে অ্যানা আর ভ্রনস্কির মধ্যে কেমন করে পরিচয় ঘটে এক বসায় ওই পর্যন্ত পড়ে ফেলেছিলাম। ওই জায়গাটিতে বুকমার্ক লাগিয়ে আর এক গ্লাস ব্র্যান্ডি ঢালোম। কী অদ্ভুত উপন্যাস। আঠার নম্বর অধ্যায়ের আগে নায়িকার উপস্থিতি নেই। তখন খেয়াল করলাম রাত তিনটা বাজে আর আমার চোখে ঘুমের চিহ্নমাত্র নেই। কী করব আমি? পড়া চালিয়ে যাব? পরে কী ঘটবে তা জানার আগ্রহও আমার প্রবল; কিন্তু ঘুমাতে তো হবে?

অতীতের সেই ইনসমনিয়ার কথা মনে পড়ল। কী ভয়াবহ-ই না ছিল ব্যাপারটা। তখন তো ছাত্রী ছিলাম। একন আমি সংসারী। একজনের স্ত্রী, একজনের মা। আমার দায়িত্ব এখন অনেক। এ অবস্থায় এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে চলবে কেমন করে? এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে। ঘুম যখন আসছেই না, বইয়ের বাকি অংশ পড়ে ফেলতে চাই।

সূর্য ওঠার পূর্ব পর্যন্ত বই পড়া অব্যাহত রেখেছিলাম। অ্যানা আর ভ্রনস্কি একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ ধরে তারপর বাঁধা পড়ল সর্বগ্রাসী ভালবাসার জালে। প্রনস্কির ঘোড়া যখন ঘোর দৌড়ের রাস্তায় (ঘোড় দৌড়ের) একটা দৃশ্য ছিল ওখানে) পড়ে গেল, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল আর অ্যানা স্বামীর প্রতি আনুগত্যহীনতার কথা স্বীকার করল। তীব্র বেগে ছোটার জন্য ঘোড়াকে যখন তাড়া দিচ্ছিল অনস্কি তখন তার সঙ্গে আমিও ছিলাম। আমি শুনেছিলাম জনতা চিৎকার দিয়ে উৎসাহিত করছে তাকে। জানালায় যখন সূর্যের আলো এসে পড়ল, বই রেখে কফি বানাতে গেলাম। দু টুকরো রুটি নিয়ে মাখন আর পনির লাগিয়ে তড়িঘড়ি স্যান্ডউইচ বানিয়ে ফেললাম। খিদের জ্বালাটা ছিল অসহনীয়। এই ধরনের খিদে। লাগার ব্যাপার সহজে ঘটে না। ওই স্যান্ডউইচ আমার ক্ষুন্নিবৃত্তিতে ব্যর্থ হলে আর একটা স্যান্ডউইচ এবং আর এক কাপ কফি বানিয়ে নিলাম।

আমার ঘোর লাগা বা নিদ্রাহীনতার কথা স্বামীকে জানালাম না। ব্যাপারটা তাকে লুকানোর জন্য না বরং তাকে এসব বলে কোনো লাভ হবে না এই মনোভাব থেকে বিষয়টা তার কাছে চেপে গেলাম। তাছাড়া মোটে তো একদিন ঘুম হয়নি, যে কোনো সময় যে কারও এমন হতে পারে।

আমার স্বামীকে যথারীতি এক কাপ কফি আর ছেলেকে এক গ্লাস দুধ বানিয়ে দিলাম। নাশতায় আমার স্বামী টোস্ট আর ছেলে এক বাটি কর্নফ্লেক খেল। তারপর সেন্ট্রায় চড়ে

বিদায় নিল। স্বামীকে বললাম, “সাবধানে যেও,” সে বলল, “ভেবো না।”

তারা চলে গেলে ভাবলাম, সারাটা দিন কী ভাবে কাটাবো? কী করা উচিত আমার? অতঃপর আমি কিচেনে ঢুকে দেখতে লাগলাম কী আছে, কী নেই। রুটি, দুধ, ডিম, মাংস সবই আছে। আছে প্রচুর সবজি। কাল লাঞ্চ পর্যন্ত আর কিছুই লাগবে না। ব্যাংকে কিছু কাজ আছে, পরে করলেও চলবে।

অতএব, সোফায় ফিরে গিয়ে আবার অ্যানাকারনিনার বাকি অংশ পড়তে লাগলাম। পড়া শুরু করার পর টের পেলাম আগে পড়া সব কিছু ভুলে গেছি। কী আশ্চর্য! মনে হচ্ছে পুরো বইটা আবার নতুন করে পড়ছি। পড়া বন্ধ করে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে বসলাম। এর কোনো মানেই ছিল না। কী ভাবছিলাম অচিরেই তার খেই হারিয়ে ফেললাম। বুঝলাম জানালার বাইরে একটা গাছের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। আবার পড়ায় ফিরে গেলাম।

তৃতীয় খণ্ডের মাঝামাঝি স্থানে বইয়ের পৃষ্ঠার ফাঁকে কিছু চকোলেটের গুঁড়ো পড়ে আছে। হাইস্কুলে পড়ার সময় এই উপন্যাস পাঠের সময় নিশ্চয়ই চকোলেট খেয়েছিলাম। খেতে-খেতে পড়তে ভাল লাগে আমার। বিয়ের পর অবশ্য চকোলেট ছুঁয়ে দেখিনি; আমার স্বামী চায় না আমি মিষ্টি জাতীয় জিনিস খাই। আমাদের ছেলেকেও ওসব খুব একটা খেতে দেই না, বাড়িতে তেমন একটা আনিও না। এক দশক আগের ওই চকোলেটের গুঁড়ো দেখে অ্যানাকারনিনা পড়তে পড়তে চকোলেট খাবার তীব্র বাসনা আমার মধ্যে জেগে উঠল। এক মুহূর্তও তর সইছিল না।

গায়ে একটা কার্ডিগান চাপিয়ে দ্রুত নিচে নেমে গেলাম। কাছের একটা দোকান থেকে সবচেয়ে মিষ্টি কিছু চকোলেট বার কিনে ফেললাম। দোকান থেকে বেরিয়েই প্যাকেট ছিঁড়ে চকোলেট খাওয়া শুরু করলাম। চকোলেটের স্বাদ আমার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। এর মিষ্টতা ছড়িয়ে পড়ল আমার সারা শরীরে।

ফিরে এসে সোফায় গা এলিয়ে দিলাম, তারপর চকোলেট খেতে খেতে অ্যানা কারনিনা পড়তে লাগলাম। আমার ভেতর তখন ঘুমের লেশমাত্র নেই। শারীরিক অবসাদও নেই। তৃতীয় খণ্ড পড়তে পড়তে চকোলেটগুলোর গোটাটাই সাবাড় করে দিলাম। ঘড়ির দিকে তাকাতে দেখলাম- বেলা সাড়ে এগারটা।

শিগগিরই আমার স্বামী ঘরে ফিরবে। তার জন্য লাঞ্চ বানিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলাম আর ব্রাশ করে মুখ থেকে চকোলেটের ঘ্রাণ তাড়িয়ে দিলাম। আমরা এক সঙ্গে বসে নুডলস্ খেলাম। আমার স্বামী তাদের ক্লিনিকের জন্য নতুন একটা মেশিন আমদানির কথা বলল যা দিয়ে আরও কম সময়ে দাঁতের ময়লা সাফ করা যায়। ওই যন্ত্রের দাম খুব বেশি। তবে ওটা আনলে রোগীও অনেক বেশি পাওয়া যাবে।

"তোমার কী মত?" আমার স্বামী জানতে চাইল, লোকের দাঁতের ময়লার বিষয়ে ভাবার বা শোনার কোনো ইচ্ছেই আমার ছিল না বিশেষ করে খাবার সময়ে তো নয়ই। আমার মনে তখন এনস্কির ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার দৃশ্যটি ভাসছিল। কিন্তু তাকে তো আর এসব বলা যায় না। সে এইসব যন্ত্রপাতি আর সরঞ্জামের বিষয়ে খুবই সিরিয়াস। ফলে আমাকে বলতে হলো, প্রয়োজন থাকলে অবশ্যই কিনবে।" বাইরে তখন একটা গাছের ডালে বসে একটা বড় পাখি কিচির মিচির করছিল। অর্ধ চেতন অবস্থায় আমি তা দেখলাম। ঘুমঘুম ভাব আমার ভেতর ততটা ছিল না। কিন্তু কেন? আমি যখন টেবিল পরিষ্কার করছিলাম সে সোফায় গিয়ে বসল আর খবরের কাগজ পড়া শুরু করল। পাশেই রাখা ছিল অ্যানাকারনিনা বইটি। আমার স্বামী খেয়ালই করল না। আমি কী পড়ি-না-পড়ি সে ব্যাপারে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই।

ধোয়া মোছার কাজ শেষ হলে সে বলল, "দুপুরে প্রথম রোগী তার সিডিউল ক্যানসেল করেছে। দেড় ঘন্টা পরে গেলেই চলবে।" এ কথা বলে হাসল সে। একটু পরেই সে উঠে দাঁড়াল। আমাকে কাছে টেনে বেডরুমের দিকে পা বাড়াল। তার মনে কী আছে

বুঝতে বাকি রইল না আমার। ওসব মুড আমার একেবারেই ছিল না। এই সময় কেন মিলতে হবে মাথায় এল না আমার। আমি বইয়ে মন লাগাতে চাইছিলাম। কপালে আঙ্গুল ছুঁইয়ে আমি বললাম, "ভীষণ দুঃখিত, এমন প্রচণ্ড মাথা ধরেছে না..."

এ রকম মাথা ব্যথা আমার প্রায়ই হয়, কাজেই কোনো কথা না বলে সে আমার ব্যাখ্যা মেনে নিল।

"তাহলে বরং শুয়ে একটু রেস্ট নাও, অনেক খাটুনি যাচ্ছে তোমার। আমার স্বামী বলল।

সোফায় শুয়ে শুয়ে সে আবার খবরের কাগজে মন দিল আর সঙ্গীত শুনতে লাগল। দন্ত বিষয়ক যন্ত্রপাতির কথা ওঠাল আবার।

সে চলে যাওয়ার পর ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলালাম; কিন্তু ঘুম কেন আসছে না? অতীতে এত দীর্ঘ সময় জেগে থাকতে হয়নি আমাকে। সাধারণত বেশ ক' ঘন্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পর ঘুম এসেছে অথবা ঘুম হয়নি, এসেছে অসম্ভব ক্লান্তি।...

কিচেনে ঢুকে এক কাপ কফি বানালাম। ভাবলাম, এখন কী করব? একথা সত্য যে, আমার পুরো ইচ্ছে অ্যানাকারনিনা পড়ার; তবে সাঁতার কাটতে সুইমিং পুলেও যেতে চাই। বেশ খানিকটা উদ্বেগ উৎকণ্ঠার পর সাঁতার কাটতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। ব্যাপারটাকে কী ভাবে ব্যাখ্যা করব জানি না। তবে আমি নিজের দেহটাকে শুদ্ধ করে তুলতে চাই। কিন্তু কী থেকে শুদ্ধ করব? এ নিয়ে ভেবে ভেবে খানিকটা সময় পার করলাম।

সে যা-ই হোক, সাঁতারের পোশাক ব্যাগে পুরে ক্লাবে চলে গেলাম। পুলে তখন। মাত্র দু'জন লোক। এক যুবক আর মাঝ বয়সী এক দ্রলোক, কাউকে চিনি না। বিরক্তিকর চেহারার এক লাইফ গার্ড ডিউটিতে ছিল তখন। প্রতিদিনকার মতো তিরিশ মিনিট

সাঁতরালাম। যথেষ্ট মনে না-হওয়ায় আরও পনের মিনিট সাঁতার কাটা গেল। দম ফুরিয়ে আসছিল; অনুভব করলাম শরীরের ভেতর শক্তি তৈরি হচ্ছে।

তখনও তিনটা বাজেনি, কাজেই কিছুক্ষণের জন্য ব্যাংক-এ গেলাম আর কাজ শেষ করে ফিরে এলাম। কিছু কেনাকাটা করার দরকার ছিল। ওই সিদ্ধান্ত বাতিল করে সোজা বাড়ি ফিরে এলাম। অ্যানাকারনিনা বইটি খুলে পড়তে পড়তে চকোলেটের বাকি অংশ খেতে লাগলাম। ছেলে স্কুল থেকে ফিরলে ওকে এক গ্লাস জুস দিলাম। তারপর ডিনার বানাতে বসে গেলাম। এতসব করলাম যান্ত্রিকভাবে। তারপর আবার ফিরে গেলাম অ্যানাকারনিনার পাতায়। ক্লান্ত লাগছিল না মোটেও।

ঘুমাতে যাওয়ার ভান করে স্বামীর পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাতি নেভানোর সঙ্গে সঙ্গে ও ঘুমিয়ে পড়ল, যেন বাতির সঙ্গে ওর মস্তিষ্কের যোগাযোগ আছে অদৃশ্য কোনো সুতোর মাধ্যমে। খুবই আশ্চর্য ব্যাপার। এ রকম লোক খুব কমই পাওয়া যায়। অধিকাংশ লোকই খুব সহজে ঘুমের রাজ্যে যেতে পারে না। আমার স্বামী একবার ঘুমালে কোনো কিছুই সকালের আগে তাকে জাগাতে পারে না।

মিনিট দশেক তার পাশে শুয়ে থেকে লিভিং রুমে গেলাম; এক গ্লাস ব্র্যান্ডি গ্লাসে ঢেলে সোফায় গিয়ে পড়তে লাগলাম। একটু পরেই সকাল হবে। তখন বই বন্ধ করে কফি বানিয়ে স্যান্ডউইচের সঙ্গে খাব।

ঠিক এ ভাবেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে আমার জীবন। তাড়াহুড়ো করে ঘরের কাজকর্ম সারি আর সকালের বাকি সময় কাটাই বই পড়ে। দুপুরের খানিক আগে বই রেখে স্বামীর জন্য লাঞ্চ তৈরি করি। খেয়ে দেয়ে সে চলে গেলে আমি ক্লাবে গিয়ে পুরো এক ঘন্টা সাঁতার কাটি। কারও সঙ্গে দেখা হলে সাধারণ সৌজন্য রক্ষার বাইরে আর কিছুই করি না। সব ধরনের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করি। বলি, “দুঃখিত, বাড়িতে একটা জরুরি কাজ আছে।” কারও সঙ্গে জড়াতে চাই না।

আমার সবকিছুতেই এখন প্রচন্ড গতি- বাজার করা, রান্নাবান্না, ছেলের সঙ্গে খেলা, স্বামীর সঙ্গে যৌনসঙ্গম। যা আমাকে করতে হয় তা হচ্ছে মন ও শরীরের মধ্যকার সম্পর্ক ভেঙে দেয়া। শরীর যখন কাজ করে মন তখন তার ভেতরের জায়গায় ভাসতে থাকে। মাথার ভেতরে কোনো রকম ভাবনা না নিয়েই সংসারটা চালাই, ছেলেকে খাওয়া-দাওয়া করাই, স্বামীর সঙ্গে গল্প করি।

ঘুম ছেড়ে দেয়ার পর থেকে আমার মনে হয় বাস্তবতা খুব সাধারণ একটা জিনিস আর তা মোকাবিলা করা কত সহজ। এটাই একটা বাস্তবতা। গৃহকর্ম-ঘর-বাড়ি। সাধারণ একটা মেশিন চালানোর মতো একটা ব্যাপার। একবার যদি শিখে ফেলেন তখন দেখবেন, পুনরাবৃত্তি ছাড়া কিছুই নেই এতে।

তারতম্য যে নেই তা নয়। আমার শ্বাশুড়ি আমাদের সঙ্গে ডিনার করেছিলেন। রোববার আমরা চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম। আমার ছেলে প্রচণ্ড ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল। এই ঘটনাগুলোর কোনো প্রভাব আমার মধ্যে ছিল না। নীরব বাতাসের মতো তা আমার জীবনের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে।

কেউ খেয়ালই করেনি ঘুমানো আমি পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছি আর পুরো সময় ব্যয় করছি বই পড়ে; মন আমার বাস্তবতার মাটি থেকে শত শত মাইল দূরে অবস্থান করছে। যতই আমি যান্ত্রিকভাবে কাজকর্ম সারি না কেন কিংবা বাস্তবতা মোকাবিলায় কম আবেগ নিয়োজিত করে চলেছি তাতে কিছুই যায় আসেনি। স্বামী-শ্বাশুড়ি বা ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক আছে আগের মতোই; তারা আমার ব্যবহারে আগের চেয়েও বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করে।

এ ভাবে চলে যায় এক সপ্তাহ। উপর্যুপরি জাগরণের এই ব্যাপারটি দ্বিতীয় সপ্তাহে পড়লে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। ব্যাপারটাতো আসলে স্বাভাবিক না। বাঁচতে হলে সবাইকেই ঘুমাতে হয়। বছর কয়েক আগে নির্যাতনের ধরন সম্পর্কে পড়েছিলাম। সেখানে ঘটনার

যে শিকার তাকে ঘুমাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হতো। ঠিক নাৎসীদের মতো। তারা মানুষকে ছোটছোট ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখত, চোখ বেঁধে ফেলত, আলো ফেলত মুখের ওপর আর বিরতিহীনভাবে জোরে জোরে শব্দ করত। স্বভাবতই এতে কোনো মানুষ পাগল হয়ে যেত কিংবা মারা যেত। ওটা হতে কত দিন লাগত তা মনে নেই, তবে তিন চার দিনের বেশি হবে না। আমার বেলায় তো গোটা একটা সপ্তাহই কেটে গেছে। বাড়াবাড়িই হয়েছে ব্যাপারটা। তারপরও আমার স্বাস্থ্যের কোনো হানি হয়নি। আগের চেয়ে বেশি শক্তি পাচ্ছি।

একদিন গোসলের পর উদোম হয়ে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। অবাক হয়ে আবিষ্কার করি আমার শরীর প্রাণশক্তিতে ফেটে পড়তে চাইছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করি, কোথাও কোনো বাড়তি মেদ নেই, নেই কোনো ভজ বা বলিরেখা। মনে হচ্ছিল আমার অনুমানের চেয়েও আমি বেশি সুন্দরী। নিজেকে অতীব বিরক্তিজনক রকম সতেজ আর তরুণ লাগছিল। সম্ভবত চব্বিশ অতিক্রম করছিলাম। আমার ত্বক মসৃণ, চোখ উজ্জ্বল, ঠোঁট ভেজা-ভেজা। বসে বসে তিরিশ মিনিট ধরে নিজের চেহারা দেখলাম। প্রত্যক্ষ করলাম বিভিন্ন কোণ থেকে বস্তুনিষ্ঠতার সঙ্গে। না, কোনো ভুল হয়নি- সত্যিই আমি সুন্দরী!

কী ঘটছে আমার জীবনে?

ডাক্তার দেখানোর কথা ভাবলাম। একজন ডাক্তার ছিলেন যিনি ছোটবেলা থেকে আমার চিকিৎসা করে আসছেন। তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও আছে। কিন্তু তিনি কি বিশ্বাস করবেন আমার কথা? তাকে যদি বলি এক সপ্তাহ ধরে ঘুমাই না তাহলে তিনি হয়ত ভাববেন আমি আস্তো খ্যাপা। কিংবা নিউরোটিক ইনসমনিয়া বলে উড়িয়ে দেবেন ব্যাপারটা; আর যদি তিনি বিশ্বাস করেন পরীক্ষার জন্য আমাকে বড় কোনো রিসার্চ হাসপাতালে পাঠাবেন। তখন কী হবে?

ও সব আমার সইবে না। আমি আমার মতো থাকতে চাই। নীরবে পড়তে চাই আর রোজ সাঁতার কাটতে চাই ঘন্টাখানেক ধরে। স্বাধীনতা চাই আমার, অন্য কোনো কিছুর চেয়ে ওটা বেশি দরকার আমার। হাসপাতালে যেতে চাইনে। কী করবে ওরা? পাহাড়-পাহাড় টেস্ট করাবে আর পর্বত পরিমাণ অনুমান দাঁড় করাবে। তারপর সব খতম। ও রকম একটা জায়গায় গিয়ে বন্দি হতে চাইনে।

এক বিকেলে লাইব্রেরিতে গিয়ে ঘুমের ওপর ক'টা বই পড়লাম। কিছু বই আছে। যার ভেতর একেবারেই কিছু নেই। বাকিগুলোর মধ্যে যা পেলাম তার সারকথা হচ্ছে- ঘুম হইতেছে বিশ্রাম। গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করিবার মোন একখানা ব্যাপার। একখানা গাড়ি যদি অনবরত চলিতে থাকে তাহা হইলে আজ কিংবা কাল তাহা বসিয়া যাইবে।... ইঞ্জিনকে বিশ্রাম দিতে হইবে। উহাকে ঠাণ্ডা রাখিতে হইবে। এক সময় তাহা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। এই যে বন্ধ করিবার কথা বলা হইতেছে, তাহাই আসলে ঘুম।...

অন্য এক পুস্তিকায় এক লেখক বলেছেন, ভাবনা চিন্তার প্রক্রিয়ায় আর শারীরিক নড়াচড়ায় মানুষ তার স্বভাবের কারণেই নিজস্ব ধরনের কর্মোদ্যম থেকে বেরিয়ে আসতে অক্ষম। অন্য কথায় বলতে গেলে মানুষ তার নিজের কর্মোদ্যমের কারাগারে বাস করে।

কিন্তু কর্মোদ্যম জিনিসটা কী? নিজেকেই প্রশ্ন করি। আমার দৃষ্টিতে এটা হচ্ছে। গৃহকর্ম-যা অনুভূতিহীন যন্ত্রের মতো আমি প্রতিদিন করে থাকি। রান্নাবান্না করি, বাজারে যাই, কাপড়-চোপড় ইস্ত্রি করি আর মা হিসেবে যাবতীয় কাজ করে যাই–এই 'কর্মোদ্যম' যদি না থাকত তাহলে কী হতো? তাহলে হয়ত চোখ বন্ধ করে রাখতে পারতাম। বোতাম টিপতাম, লিভার টানতাম, শিগগিরই টের পেতাম বাস্তবতা দূরে চলে যাচ্ছে। সারাক্ষণ শুধু একই শারীরিক নড়ন চড়ন। কর্মোদ্যম। ক্ষয় করে চলেছে শুধু, জুতোর হিলের মতো। এসবের সঙ্গে সমন্বয়ের জন্য ঘুম দরকার আমার। প্রয়োজন নিজেকে ঠাণ্ডা করার। ...লাইব্রেরির টেবিলে বসে মাথা নাড়ালাম আমি।

ঘুমের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে আমার! যদি পাগল হয়ে যাই তাহলে কী হবে? কাজেই 'সত্তার ভিত্তি' হারালে কী হবে আমার? কর্মোদ্যম গ্রাস করে ফেলবে না আমাকে। ঘুম জিনিসটা যদি আমার শরীরের ক্ষয় হয়ে যাওয়া জীবনীশক্তি সময়কালিন ক্ষয়পূরণ ছাড়া কিছুই না হয়, তাহলে ওটার আর দরকার নেই আমার। আমার শরীর ক্ষয় হয়ে যেতে পারে; কিন্তু মন জিনিসটা একান্ত আমার। নিজের জন্য এটাকে রাখতে চাই। কাউকে দিতে চাই না। সারাই কিংবা মেরামতি' হতে চাই না আমি। ঘুমাব না সে-ও ভাল।

নতুন এক দৃঢ়তা মনের ভেতর নিয়ে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে আসি।

না ঘুমানোর জন্য কোনো ভয় এখন আর আমার মনের মধ্যে নেই। ভয়ের কী আছে? সুবিধার দিকগুলো ভাবলেই তো হয়। রাত দশটা থেকে সকাল ছ'টা পুরো সময়টার মালিক আমি একা। নিজের মতো করে সময়টা ব্যয় করতে পারি। কেউ বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। কেউ কিছু দাবি করবে না। আমি আমার জীবনটাকে প্রসারিত করেছি।

আপনি হয়ত বলবেন জৈবিকভাবে এটা অস্বাভাবিক। হয়ত আপনার কথা ঠিক। হয়ত এর জন্য ভবিষ্যতে আমাকে মূল্য দিতে হবে। খুব অকপটে বলতে পারি, অল্প বয়সে মরলেও কাউকে অভিশাপ দেব না।

আমার স্বামী ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা পরীক্ষা করে আমি সোফায় গিয়ে বসি আর খানিকটা ব্র্যান্ডি পান করি। তারপর বইটা খুলি। অ্যানাকরনিনা তিনবার পড়েছি। যতবারই পড়েছি ততবারই এর ভেতর নতুন একটা কিছু আবিষ্কার করেছি। এই উপন্যাসটিতে আছে চমকপ্রদ সব ব্যাপার আর রহস্য। চীনা বাক্সের মতো এ উপন্যাসে আছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জগত; আর এগুলোর ভেতর আছে আরও ছোট জগত। আমি যথাযথভাবে জানি মহান লেখক টলস্টয় কী বলতে চেয়েছেন আর ওই বই থেকে পাঠকের কাছে থেকে কী প্রত্যাশা করেছেন।

যতবার সম্ভব অ্যানাকারনিনা পড়া শেষ করে আমি দস্তয়েভস্কি পড়ি। প্রচণ্ড মনোযোগ সহকারে একটার পর একটা বই পড়তে পারি, কখনোই ক্লান্ত হই না। জটিল সব অনুচ্ছেদগুলো চেষ্টা ছাড়াই বুঝে ফেলি আর গভীর আবেগের সঙ্গে সেগুলোতে সাড়া দেই।

মনে হয় বরাবরই আমি এমন ছিলাম। ঘুম ছেড়ে দিয়ে আমি বরং নিজেকে অনেক প্রসারিত করতে পেরেছি। কোনো বিষয়ে পূর্ণ মনোযোগ স্থাপনের ক্ষমতা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই ক্ষমতা অর্জন না করে জীবন যাপন মানে চোখ খোলা রেখে কিছু না দেখা।

আমার ব্র্যান্ডির বোতলটা শেষমেষ খালি হয়ে যায়। পুরো বোতল একাই সাবাড় করে দিয়েছি। দোকান থেকে আরেক বোতল রেমি মার্টিন কিনে আনলাম।

বই পড়ার সময় মাঝে মাঝে আমি অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ি। এ রকম হলে বই রেখে একটুখানি ব্যায়াম করি কিংবা ঘরের ভিতর পায়চারি করি। ইচ্ছে হলে নৈশ-গাড়ি চালনায় বেরিয়ে পড়ি। কফি পানের জন্য কখনো বা সারারাত খোলা থাকে এমন ফাস্টফুডের দোকানে যাই। তবে লোকজন সামলাতে বিস্তর ঝামেলা হয় বলে গাড়িতেই বসে থাকি। নিরাপদ কোনো জায়গায় গাড়ি থামিয়ে মনটাকে এদিক ওদিক পরিক্রমা করতে দেই। অথবা সোজা বন্দরে চলে যাই আর নৌকা দেখি।

এক রাতে তো পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদে পড়তে হয় আমাকে। তখন রাত আড়াইটে। রাস্তার একটা বাতির নিচে গাড়ি পার্ক করে গাড়ির স্টিরিওতে গান শুনতে শুনতে চলমান একটা জাহাজের বাতির দিকে তাকিয়েছিলাম। তখন পুলিশটি আমার গাড়ির কাঁচে টোকা মারে। আমি কাঁচ নামাই। দেখতে হ্যান্ডসাম ছিল সে। আমি ব্যাখ্যা করে বললাম রাতে আমার ঘুম আসে না। সে আমার লাইসেন্স পরীক্ষা করে বলল, “দেখুন গত মাসেই এখানে একটা খুন হয়েছে। তিন যুবক এক দম্পতির ওপর হামলা চালায়;

পুরুষটিকে খুন করে মহিলাকে রেপ করে তারা। এই ঘটনা কাগজে পড়েছেন হয়ত।" আমি মাথা নাড়াই। "কোনো কাজ না থাকলে রাতে এখানে না আসাই ভাল।" বলল সে। আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওখান থেকে চলে এসেছিলাম।

ওই একবারই রাতে আমার সঙ্গে কথা হয়েছিল কারও সঙ্গে। সাধারণত রাতের বেলায় ঘন্টাখানেক বা তার চেয়ে কিছু বেশি সময় ধরে রাস্তায় ঘুরে বেড়াই, কেউ আমার দিকে ফিরেও তাকায় না। তারপর বাড়ি ফিরে গাড়িটা আমার স্বামীর গাড়ির পাশে রাখি। তখন সে তার বিছানায় গভীর ঘুমে অচেতন।

ঘরে ফিরে পরীক্ষা করি আমার স্বামী ঘুমিয়ে আছে কিনা। সব সময়ই ঘুমন্ত অবস্থায় পাই তাকে। আমার ছেলের কাছেও যাই- তাকেও সব সময় ঘুমুতে দেখি। তারা আমার ব্যাপারে কিছুই জানে না; ভাবে পৃথিবীটা যেমন ছিল তেমনই আছে। কিন্তু তাদের ধারণা ভুল ছিল। আমি এমনভাবে বদলে যাচ্ছিলাম যে, তারা কিছু আন্দাজই করতে পারেনি। দ্রুত বদলে যাচ্ছিলাম আমি। কিছুতেই আগের মতো হতে পারব না।

এক রাতে ধড়াস করে কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনে স্বামীর ঘরে ছুটে গেলাম। ঘুমের মধ্যে সম্ভবত ঘড়িটা ফেলে দিয়েছে হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে। কী ঘটেছে টেরও পায়নি। ঘড়িটা উঠিয়ে টেবিলে রেখে স্বামীর মুখের দিকে তাকাই। কতদিন যাবৎ বছরের পর বছর? বিয়ের পরপর এভাবে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতাম আমি। ওটা স্বস্তির একটা ব্যাপার ছিল আমার। একটা শান্তির আবহ তৈরি করত- নিজেকে বলতাম এমন শান্তিতে যতক্ষণ সে ঘুমাবে ততক্ষণ নিরাপদ থাকব আমি। এ কারণেই তার ঘুমন্ত চেহারা দেখার জন্য অনেকটা সময় ব্যয় করেছি। পরে অবশ্য এ অভ্যাস ছেড়েছি। কিন্তু কবে থেকে? সম্ভবত সেই সময় থেকে যখন ছেলের নাম দেয়া নিয়ে শ্বাশুড়ির সঙ্গে আমার একটুখানি ঝগড়া মতোন হয়েছিল। কিছু উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়েছিল আমাদের মধ্যে; কিন্তু আমার স্বামী কাউকে কিছু বলতে পারেনি। সে শুধু আমাদেরকে শান্ত করার

চেষ্টা নিয়েছিল। সেদিন থেকেই আমার ভেতর এই অনুভূতির সঞ্চার হয় যে, আমার স্বামী আমার রক্ষাকর্তা নয়। সে অবশ্য অনেক দিন আগের ব্যাপার। শ্বাশুড়ির সঙ্গে আমার আপসরফা হয়ে গিয়েছিল; আমার ইচ্ছে অনুযায়ী ছেলের নাম দিয়েছিলাম। স্বামীর সঙ্গেও কোনো সমস্যা বাঁধেনি এসব নিয়ে।

তাকে প্রায়ই ঘুমুতে দেখি। শান্তিতেই ঘুমায় সে। সব সময়। তাকে দেখতে দেখতে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে আমার ভেতর থেকে। খুব বড় একটা শ্বাস। তাতে খানিকটা শব্দও ছড়ায়; কিন্তু একটু নড়াচড়াও করে না সে। পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘ আর শব্দময় কোনো শ্বাসও জাগাতে পারবে না তাকে।

বেডরুম থেকে বেরিয়ে লিভিং রুমে যাই। গ্লাসে খানিকটা ব্র্যান্ডি ঢেলে নিয়ে পড়তে শুরু করি। কিন্তু পাঠে মন বসাতে পারি না কেন যেন। বই রেখে ছেলের ঘরে যাই। বাইরে থেকে চুঁইয়ে আসা আলোয় তার দিকে তাকাই। আমার স্বামীর মতো সে-ও গভীর নিদ্রায় অচেতন। সব সময়ই এ রকম নিবিড় নিদ্রায় ডুবে থাকে সে। আমি তাকে ঘুমাতে দেখি। তারপরও ওর ঘুমন্ত মুখ দেখে উদ্বিগ্ন হই। এমন তো হয়নি আগে? কেন হচ্ছে এমন? হাত ভাঁজ করে ওর শয্যা পাশে দাঁড়িয়ে থাকি। হ্যাঁ, ভীষণ ভালবাসি ওকে। তার পরেও কী যেন একটা আমার ভেতর খটকার সৃষ্টি করে। স্নায়ুকে আঘাত করে। চোখ বন্ধ করে ফেলি। চোখ খুলে আবার ওর দিকে তাকাই। তখনই আঘাতটা আসে। যে ব্যাপারটা আমাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে তা হচ্ছে, ওর চেহারাটা ঠিক আমার স্বামীর মতো। ঠিক আমার শ্বাশুড়ির মতো। এক খুঁয়ে আর জেদী। আত্মতুষ্ট। এক ধরনের ঔদ্ধত্য ওদের রক্তের ভেতরই আছে। একথা সত্য আমার স্বামী আমার কাছে খুব ভাল। সে ভদ্র, শান্তশিষ্ট আমার প্রতি যত্নবান, অন্য স্ত্রীলোকদের প্রতি আসক্তি নেই; কঠোর পরিশ্রম করে। আমার বান্ধবীরা সব সময়ই বলে এ রকম একজন স্বামী পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। কেননা ব্যাপারে কখনো দোষ দিতে পারি না ওকে। আসলে এটাই আমার মর্মপীড়ার কারণ।...

ছেলেটাকে আমার আগন্তুক মনে হয় শেষ অবধি। বড় হওয়ার পরও সে মনে হয় আমাকে বুঝতে পারবে না। যেমন বুঝতে পারে না আমার স্বামী। ছেলেকে যে ভালবাসি তাকে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু আমার মনে হয় এ রকম তীব্রতা নিয়ে কোনো দিন ওকে হয়ত ভালবাসতে পারব না। মা সুলভ ভাবনা নয় এটা। অধিকাংশ মা-ই এমন ভাবতে পারবে না। কিন্তু ঘুমন্ত ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়, একদিন নির্ঘাত ওকে আমি ঘৃণা করব।

এই ভাবনা আমাকে প্রচণ্ডভাবে বিষণ্ণ করে তোলে। দরজা বন্ধ করে দিয়ে লিভিংরুমে ফিরে আসি। কয়েক পাতা বই পড়ে ঘড়ির দিকে তাকাই, তিনটে বাজতে অল্প কিছু বাকি।

অবাক হয়ে ভাবি, কতদিন ঘুমাই না? গত সতের দিনে এক ফোঁটাও ঘুমাইনি; সতের দিন সতের রাত। ফেলে দেয়ার মতো সময় না। ঘুম জিনিসটা কী কল্পনাও করতে পারি না এখন। চোখ বন্ধ করে ঘুমের অনুভূতিটা স্মরণে আনার চেষ্টা করি; কিন্তু জাগ্রত-অন্ধকার ছাড়া কিছুই অনুভূত হয় না। মৃত্যুর মতো মনে হয় এটাকে।

তাহলে কী আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে?

এখন যদি মারা যাই, তাহলে আমার জীবনের হিসাব কী করে গণনা করা হবে? এর উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। ঠিক আছে, তাহলে কোন মৃত্যু এসে হানা দেবে?

এখন পর্যন্ত ঘুমকে মৃত্যুর একটা মডেল বলে মনে হয় আমার কাছে। মৃত্যুকে ঘুমের প্রসারণ বলে কল্পনা করেছি। সাধারণ নিদ্রার চেয়ে আরও অনেক বেশি গভীর নিদ্রা। সম্পূর্ণ চেতনাবিহীন ঘুম। চিরন্তন বিশ্রাম। সম্পূর্ণ আঁধার।

কিন্তু আমার মনে হয় ভুল ছিল আমার ধারণা। মৃত্যু এমন এক অবস্থা যা ঘুমের মতো নয়, এর প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা- গভীর, অফুরান, জাগ্রত অন্ধকারের মতো যা এখন

আমি প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু মৃত্যু কেমন কেউ জানে না। কে দেখেছে তা? কেবল মৃতদের পক্ষেই তা দেখা সম্ভব হয়েছে। জীবন্ত কেউই মৃত্যু সম্পর্কে জানে না, শুধু অনুমান করতে পারে...।

আমার চোখ দুটো এখনও বন্ধ। চোখ খোলার শক্তি আমি হারিয়ে ফেলেছি। আমার সামনে দণ্ডায়মান গভীর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছি। একা। মনে গভীর অভিনিবেশ আর প্রসারমানতা। ইচ্ছে করলেই পৃথিবীর গভীরতম প্রদেশে চলে যেতে পারি। কিন্তু শিগগির যেতে চাই না সেখানে।

মৃত্যু যদি এমন-ই হয়, মৃত্যু যদি হয় অনন্ত জেগে থাকা আর এইভাবে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকা, তাহলে কী করব আমি?

শেষ পর্যন্ত চোখ দুটো খুলতে সক্ষম হলাম। গ্লাসের অবশিষ্ট ব্র্যান্ডিটুকু পান করতে পারলাম।

পাজামা খুলে জিন্সের প্যান্ট আর টিশার্ট পরলাম। চুল বিন্যস্ত করে মাথায় দিলাম আমার স্বামীর একখানা ক্যাপ। আয়নায় দেখলাম আমাকে ছেলেদের মতো লাগছে। নরম সোলের জুতো পরে গ্যারেজে এলাম। স্টার্ট দিয়ে রাস্তায় গাড়ি নামালাম।

রাত তখন তিনটে। তবুও রাস্তায় গাড়ির কমতি নেই। গাড়ির রেডিও শুনতে শুনতে বন্দরের দিকে এগুলাম। ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীত শুনতে ইচ্ছে করছিল; কিন্তু কোনো স্টেশনই তা বাজাচ্ছে না। বাজছে অতিবাজে জাপানি রক সঙ্গীত। কান। পচানোর জন্য প্রেমের গান খুব ভাল। বাধ্য হয়েই ওসব শুনতে হচ্ছিল। আমি অনেক দূরের কোনো জায়গায় চলে এসেছি; মোৎসার্ট আর হাইডেন থেকে অনেক দূরে।

অর্ধ চৈতন্যের ভেতর আমি আশপাশের অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। কলেজে পড়বার সময় এক ছেলে বন্ধুর সঙ্গে গাড়ি চালিয়ে কোথাও যাবার ঘটনা হঠাৎ

মনে পড়ে গেল। গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমরা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগলাম। সে আমার ভেতরে প্রবেশ করতে চেয়েছিল; আমি রাজি হইনি। স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে গান শুনতে শুনতে সেই দৃশ্য মনে আনার চেষ্টা করলাম; কিন্তু তার মুখটি কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। মনে হলো ওই ঘটনাটা ঘটেছে। অনেক-অনেক দিন আগে। ঘুম আমার জীবন থেকে বিদায় নেয়ার আগে আমার যে স্মৃতি আছে তা যেন অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে মিলিয়ে যাচ্ছে, এমন অদ্ভুত লাগছে যে, যে- আমি প্রতিরাতে ঘুমাতে যেতাম সেই আমি প্রকৃত আমি নই। আর সেই স্মৃতিগুলো যেন আমার নয়। মানুষের মধ্যে এভাবেই পরিবর্তন আসে; কিন্তু কেউ তা বুঝতে পারে না। কেউ তা খেয়ালও করে না। কেবল আমিই জানি কী ঘটেছে। আমি সেগুলো বলার চেষ্টা করেছি; কিন্তু তারা বোঝেনি। তারা বিশ্বাস করেনি আমাকে। বিশ্বাস করলেও আমি কী অনুভব করেছি সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ছিল না। তারা তাদের আবেশমূলক বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে আমাকে হুমকি বলে মনে করেছে।

তবে আমার ভেতর পরিবর্তন ঘটছে, সত্যিই ঘটছে তা। স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে চোখ বন্ধ করে কতক্ষণ যাবৎ আমি এসইব ভেবে চলেছি? কতক্ষণ ধরে তাকিয়ে আছি নিঘুম অন্ধকারের দিকে।

হঠাৎ মানুষের সাড়া পেয়ে নিজের মধ্যে ফিরে আসি। কে যেন আছে বাইরে। চোখ খুলে চারদিকে তাকাই। গাড়ির বাইরে মানুষের অস্তিত্ব অনুভব করছি। গাড়ির দরজা লক করা। দু'পাশে গভীর অন্ধকার। বাইরে আছে যারা তাদের চেহারা বা পোশাক-আশাক দেখা যাচ্ছে না; শুধু দু'টি অন্ধকার ছায়া দাঁড়িয়ে আছে।

ওদের দুজনের মাঝখানে আমার হোন্ডা-সিভিক গাড়িটাকে ক্ষুদ্রাকার পেস্ট্রির বাক্সের মতো মনে হচ্ছে। দু'দিক থেকে দুলছে গাড়িটা। ডানের জানালায় ঘুষি মারার শব্দ হচ্ছে। জানি পুলিশের লোক নয় ওরা। তারা গাড়ির জানালায় কখনো। এভাবে কিল

ঘুষি মারে না কিংবা গাড়ি আঁকায় না। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে আমার। এখন কী করব? ভাবতেই পারি না। বোগলের নিচটা ঘামে ভিজে যাচ্ছে। এখান থেকে দ্রুত চলে যেতে হবে। চাবি খুঁজি। ডানদিকে মোচড় দেই। স্টার্ট নেয় না। আমার হাত কাঁপতে থাকে। চোখ বন্ধ করে আবার চাবি ঘোরাই। কোনো কাজ হয় না। লোকগুলো অন্ধকারের মধ্যে আমার গাড়ি ঝাঁকিয়ে চলেছে ক্রমাগত। উল্টে ফেলে দিতে চাচ্ছে।

কোনো ভুল হচ্ছে না তো? শান্ত হও, ভাবো, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। ভাবো, একটুখানি ভাবো। ধীরে ধীরে। সতর্কতার সাথে। কোথাও ভুল হচ্ছে। নির্ঘাত। কিন্তু কী? জানি না। গাঢ় অন্ধকার মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। হাত দুটো কাঁপছে। একবার চাবি ঢোকাচ্ছি আবার বের করে আনছি। কিন্তু কীহোলে যথাযথভাবে ঢুকছে না চাবিটা। বার বার চেষ্টা করি, চাবিটা পড়ে যায়। তুলতে চেষ্টা করি। পারি না। গাড়িটা আগুপিছু করে দুলছে। স্টিয়ারিং হুইলের সঙ্গে মাথাটা ঠুকে গেল। চাবিটা আর খুঁজেই পেলাম না। দু'হাতে মুখ ঢেকে সিটের পেছনে এলিয়ে পড়লাম। কাঁদতে লাগলাম। এ ছাড়া করার আর কিছুই ছিল না। চোখ থেকে টপ টপ করে পানি পড়ছে। যেন একটা বাক্সের ভেতর আটকা পড়েছি, বেরুতে পারছি না। এখন মধ্যরাত। লোক দুটো তখনও গাড়িটা ঝাঁকিয়ে চলেছে, এক সময় হয়ত উল্টে ফেলবে।

জন্মদিন ও মেয়েটি

জন্মদিন ও মেয়েটি

নিজের বিশতম জন্মদিনেও রোজকার মতো তার টেবিলে অতিথিদের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে তাকে। শুক্রবারগুলোতে সব সময়ই সে কাজ করে, কিন্তু পরিকল্পনামাফিক সবকিছু এগুলে নির্দিষ্ট এই শুক্রবারটাতে ছুটি নিতে পারত সে। পার্টটাইম কাজ করে অন্য যে মেয়েটি তার সঙ্গে কাজের পালা বদলাতে রাজি ছিল স্বাভাবিক নিয়মে; কারণ নিজের বিশতম জন্মদিনে ক্রুদ্ধ বাবুর্চির হুকুম তামিল করে খদ্দেরের টেবিলে খাবার বয়ে নিয়ে যাওয়াটা নিতান্তই অস্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু সেই মেয়েটি আকস্মিকভাবেই প্রচণ্ড ডায়রিয়া আর জ্বরে আক্রান্ত হয়, ফলে আগে ভাগেই চলে যেতে হয় তাকে।

সে অসুস্থ মেয়েটিকে একটুখানি আয়েশ দিতে এগিয়ে যায়। মেয়েটি ক্ষমা প্রার্থণা করে তার কাছে। “আমাকে নিয়ে ভেবো না,” বলে সে, “বিশতম জন্মদিনে বিশেষ কিছু করতে যাচ্ছি না।”

সত্যিকথা বলতে কী সে তেমন হতাশও হয়নি ব্যাপারটা নিয়ে। এর একটা কারণ অবশ্য আছে। দিন কয়েক আগে ছেলে বন্ধুর সাথে তার প্রচণ্ড তর্ক বেঁধে যায়। ওই রাতে মেয়েটার সঙ্গে থাকবার কথা ছিল তার। স্কুল জীবন থেকেই তাদের সম্পর্ক।

তর্কটা বেঁধেছিল তুচ্ছ একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে। শেষ পর্যন্ত তা খুব খারাপের দিকে গড়ায় আর তিক্ততা, চিৎকার চেঁচামেচির মধ্য দিয়ে এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যে, মেয়েটি নিশ্চিত হয়ে পড়ে যে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। ভেতরে ভেতরে মেয়েটি খুব শক্ত থাকে আবার গলেও যায়। ওই ঘটনার পর থেকে ছেলেটি তার সঙ্গে দেখা করছে না, আর মেয়েটিও যাচ্ছে না তার কাছে।

মেয়েটি টোকিওর রোপাঙ্গি এলাকার একটি ইতালিয়ান রেস্তোরাঁয় কাজ করে। ষাটের দশকের শেষ দিকে রেস্তোরাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়। নেতৃস্থানীয় না হলেও এর সুনাম যথার্থই ছিল বলা যায়। বারবার আসে এ ধরনের অনেক খদ্দের এই। রেস্তোরাঁটির আছে আর তারা কখনো এর আতিথেয়তায় অসন্তুষ্ট নয়। এর ডাইনিং রুমের পরিবেশ খুব শান্ত। ফলে তরুণদের চেয়ে বয়স্ক খদ্দেররা বেশি আকৃষ্ট হন। এদের মধ্যে নাট্যজগতের কিছু বিখ্যাত ব্যক্তি আর লেখক রয়েছেন।

পূর্ণকালিন দু'জন ওয়েটার সপ্তাহে ছয় দিন কাজ করে ওই রেস্তোরাঁয়। ওই মেয়েটি আর পার্টটাইম ওয়েট্রেস দু'জনই ছাত্রী। এ ছাড়াও একজন ফ্লোর ম্যানেজার আছেন। কাউন্টারে একজন মধ্য বয়সী মহিলা বসে। সারাক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকে সে। তার প্রধান দুটি কাজের একটি হচ্ছে অতিথিদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা গ্রহণ আর ফোন এলে তা রিসিভ করা। দরকারের সময়ই সে শুধু কথা বলে। সব সময়ই তার পরনে থাকে একই কালো পোশাক।

ফ্লোর ম্যানেজারের বয়স চল্লিশের শেষের কোঠায়। লম্বা তিনি আর চওড়া তার কাঁধ। শরীরের গাঁথুনি থেকে বোঝা যায় যৌবনে তিনি খেলোয়াড় ছিলেন। তবে ইদানীং পেট ও চিবুকে মেদ জমতে শুরু করেছে। তিনি খুব দক্ষতার সঙ্গে তার দায়িত্ব পালন করেন। তার একটা বিশেষ কাজ আছে- রেস্তোরাঁর মালিকের রুমে ডিনার পৌঁছে দেওয়া।

“রেস্তোরাঁ ভবনের ছতলায় মালিকের নিজের একটা রুম আছে,” সে বলল, “অ্যাপার্টমেন্ট অথবা অফিস কিংবা ওই জাতীয় কিছু।”

যে কোনো ভাবেই হোক সে আর আমি আমাদের বিশতম জন্মদিনের ব্যাপারে আলোচনায় মেতে উঠি। আমাদের দুজনের জন্য কেমন ছিল ওই দিনটি। অধিকাংশ লোকই বিশে পা-দেয়ার বিষয়টি মনে রাখে।

“রেস্তোরাঁয় তিনি কখনোই আসেন না। শুধু ম্যানেজারই তাকে দেখেছে। তার রুমে ডিনার পৌঁছে দেয়ার কাজটি কঠোরভাবে তারই। তিনি দেখতে কেমন অন্য কর্মচারীরা জানে না।”

“বস্তুত নিজের রেস্তোরাঁ থেকে হোম ডেলিভারি পাচ্ছেন মালিক।” “হ্যাঁ,” বলল সে, “প্রতিদিন রাত আটটায় ম্যানেজার তার রুমে খাবার নিয়ে যান। ওটা রেস্তোরাঁর সবচেয়ে ব্যস্ত সময়। ম্যানেজারের অনুপস্থিতিতে আমাদের সবার সমস্যা। হয়; কিন্তু কারও কিছু করার নেই। কেননা সব সময় ও ভাবেই হয়ে আসছে। রুম সার্ভিসের জন্য ব্যবহৃত ট্রলিটাতে খাবার সাজিয়ে দেয়া হয়। ম্যানেজার তার চেহারায় ভক্তির ভাব ফুটিয়ে তুলে ট্রলিটা ধাক্কিয়ে এলিভেটরে তোলেন। পনের মিনিট পরে খালি হাতে ফিরে আসেন। ঘন্টা খানেক পর গিয়ে ট্রলিটা ফিরিয়ে আনেন তিনি। প্রতিদিন একইভাবে কাজটি তিনি করেন, ঘড়ির কাটা যেভাবে চলে সেই ভাবে। “প্রথম দিনে ব্যাপারটি দেখার পর খুব রহস্যজনক মনে হয়েছিল আমার। এক ধরনের ধর্মীয় আচারের মতো। পরে অবশ্য আমি এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি আর ব্যাপারটা নিয়ে দ্বিতীয়বার ভাববার অবকাশ থাকে না।”

মালিকের খাবারের তালিকায় প্রতিদিন মুরগির মাংস থাকেই। সবজির বেলায় এক-আধটু পরিবর্তন হয়, কিন্তু মুরগি থাকবেই। এক তরুণ বাবুর্চি তাকে বলেছিল, কী হয় তা পরখ করার জন্য সে ক্রমাগত এক সপ্তাহ তাকে শুধু মুরগির রোস্ট পরিবেশন

করে; কিন্তু কোনো অভিযোগ আসেনি।

১৭ নভেম্বর তার বিশতম জন্মদিনে যথারীতি কাজ শুরু করতে হয় তাকে। বিকেল থেকেই থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছিল আর তা মুষলধারে চলে সন্ধ্যা পর্যন্ত। পাঁচটার সময় দিবসের বিশেষ বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করার জন্য ম্যানেজার সব কর্মচারীদের একত্র করেন।

রেস্তোরাঁর গেট খোলা হয় ছ'টায়। কিন্তু বৃষ্টির কারণে অতিথিরা আসতে দেরি করে। অনেক রিজারভেশন বাতিল করা হয়। মহিলারা জল কাদায় তাদের পোশাক বরবাদ করতে নারাজ। ম্যানেজার চুপচাপ পায়চারি করেন। ওয়েটাররা লবণদানি, মশলাদানি সাফ করে কিংবা বাবুর্চিদের সাথে গল্প জুড়ে দেয়। সে ডাইনিং রুমে চোখ বুলায়। একটা মাত্র দম্পতি সেখানে বসে আছে। স্পীকার থেকে ভেসে আসা সঙ্গীত শুনছে তারা। রেস্তোরাঁর ভেতর খেলা করছে বিলম্বিত শরতের বৃষ্টির ঘ্রাণ।

সাড়ে সাতটার দিকে ম্যানেজার অসুস্থ বোধ করতে থাকেন। কাঁপতে কাঁপতে তিনি পেট ধরে একটা চেয়ারে বসে পড়েন, যেন হঠাৎ গুলি খেয়েছেন। কপালে জমে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। "হাসপাতালে যাওয়া উচিত আমার।" বিড়বিড় করে বলেন তিনি। এ ধরনের শারীরিক অসুস্থতা তার জন্য অস্বাভাবিক ঘটনা। দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি এই রেস্তোরাঁয় কাজ করছেন; কিন্তু এক দিনের জন্যও অনুপস্থিত থাকেননি। তার জন্য গর্বের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, অসুস্থতার জন্য একদিনও কামাই করেননি। ব্যথায় বিকৃত হয়ে যাওয়া তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে। তার অবস্থা খুব খারাপ।

সে ছাতা নিয়ে রাস্তায় গেল আর একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এল। ট্যাক্সিতে ওঠার আগে ম্যানেজার তাকে বললেন, "আমি চাই রাত ঠিক আটটায় ৬০৪ নম্বর রুমে তুমি ডিনার নিয়ে যাবে। বেল বাজিয়ে শুধু বলবে, আপনার খাবার নিয়ে এসেছি' খাবার রেখেই চলে আসবে।"

বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না। অতিথিরা আসছিল অনেকক্ষণ পর পর।

মালিকের খাবার তৈরি হয়ে গেলে সে ট্রলিটা এলিভেটরে নিয়ে তুলল আর সই করে চলে গেল ছ'তলায়। সাধারণ মাপের খাবার। আধা বোতল রেডওয়াইন, কফি, সেদ্ধ সবজির সঙ্গে মুরগির তরকারি, ডিনার রোল আর মাখন। খাবারের সুবাসে তখন এলিভেটর ভরপুর। বৃষ্টির ঘ্রাণের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। স্মৃতির ভেতর সে রুম নম্বর বার বার চেক করল। গলা পরিষ্কার করল, তারপর বেল টিপল। কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার বেল টেপার কথা ভাবল আর তখনই ভেতর থেকে হালকা-পাতলা এক বৃদ্ধ দরজা খুলে দিলেন। তিনি ওর চেয়ে চার-পাঁচ ইঞ্চি খাটো, পরনে কালো স্যুট আর নেকটাই।

"আপনার ডিনার এনেছি স্যার।" খানিকটা কর্কশ কণ্ঠে বলল সে, তারপর আবার গলা সাফ করল। কোনো রকম টেনশন হলেই তার গলার স্বর কর্কশ হয়ে ওঠে।

"ডিনার?"

"হ্যাঁ, স্যার। ম্যানেজার সাহেব হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমি এনেছি।"

"ও তাই বলো।" যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছিলেন; তখনও তার হাত দরজার নবে।

"অসুস্থ, তাই বললে না?"

"হঠাৎ পেট ব্যথা শুরু হলে হাসপাতালে নেয়া হয় তাকে, তার ধারণা ওটা অ্যাপেন্ডিসাইটিসের ব্যথা।"

"তাই নাকি? সে তত ভাল কথা নয়।"

সে গলা পরিষ্কার করে বলল, "আপনার খাবার ভেতরে আনব স্যার?"

“হ্যাঁ নিয়ে এসো, অবশ্যই যদি তোমার মর্জি হয়, সেই তো ভাল আমার জন্য।”

যদি আমার মর্জি হয়? ভাবল সে। কী অদ্ভুত প্রকাশ ভঙ্গি। আমার আবার মর্জি কী?

বৃদ্ধ দরজাটা ভাল করে খুললে সে ট্রলিটা ভেতরে ঢোকাল। ঘরের প্রথম দিকটায় একটা বড় স্টাডি, যেন বসবাসের অ্যাপার্টমেন্ট শুধু নয় ওটা একটা কাজ করার। জায়গাও। জানালা দিয়ে টোকিও টাওয়ার নজরে আসছে। বৃদ্ধ সোফার সামনে রাখা প্লাস্টিকের টেবিলের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করলে সে ওই টেবিলের ওপর খাবার সাজিয়ে দিল।

“খাওয়া শেষ হলে বাসন-কোসনগুলো বারান্দায় রেখে দেবেন দয়া করে, ঘন্টা খানেক পরে এসে নিয়ে যাব।”

“ঠিক আছে।”

“আর কোনো কিছু কি লাগবে স্যার?”

একটুখানি ভেবে তিনি বললেন, “মনে হয় লাগবে না কিছু।”

“ঠিক আছে স্যার, আমি তাহলে অন্য কাজ করি গিয়ে।”

“না, একটুখানি দাঁড়াও।” বললেন তিনি।

“কী স্যার?”

“তুমি কী পাঁচটা মিনিট সময় দেবে আমাকে? তোমাকে কিছু বলার আছে আমার।”

ওই অনুরোধে এত নম্রতা ছিল যে, সে একটু লজ্জা পেল। “না না ঠিক আছে স্যার কোনো অসুবিধা নেই।” পাঁচ মিনিটের ব্যাপারই তো, তাই না? শত হলেও

পছ মানর ই, তিনি তার নিয়োগকর্তা। ঘন্টা চুক্তিতে মজুরি দিচ্ছেন। আর এই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দেখে মনে হয় না তিনি তার কোনো ক্ষতি করবেন।

তার চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললেন, "সে যা-ই হোক, তোমার বয়স কত মেয়ে?"

"আমার বয়স এখন বিশ।"

"বিশ?" পুনরাবৃত্তি করে তিনি বললেন, "কখন থেকে বিশ বছর?" তিনি তার চোখ দুটো এমনভাবে সংকুচিত করলেন যেন কোনো ফাটলের ভেতর দিয়ে তাকাচ্ছেন।

"এই মুহূর্তে আমার বয়স বিশ। আজ আমার জন্মদিন স্যার।"

"তাই নাকি, আজ তোমার বিশতম জন্মদিন?"

সে ঘাড় নাড়িয়ে সম্মতি জানাল।

"ঠিক বিশ বছর আগের এই দিনে পৃথিবীতে তোমার জীবন শুরু হয়।"

"ধ্রুব সত্যি কথা এটা।"

"বেশ বেশ। চমৎকার। হ্যাপি বার্থ ডে।"

"ধন্যবাদ স্যার।" তখনই তার মনে পড়ল সারাদিনে তিনিই শুধু তাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ওইটা থেকে তার বাবা-মা শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়ে থাকলে বাসায় ফিরে অ্যানসারিং মেশিনে দেখতে পাবে সে।

"তাহলে তো জন্মদিনটা উদ্যাপন করতে হয়," বললেন তিনি, "এস একটু খানি রেড ওয়াইন পান করা যাক।"

“ধন্যবাদ স্যার, এখন তো সম্ভব নয়, এটা আমার কাজের সময়।”

“শুধু একটুখানি খেলে কেউ তোমার দোষ ধরতে যাবে না। উদ্যাপনের জন্য প্রতীকী পান, আর কিছু নয়!”

তারা গ্লাস ঠোকাঠুকি করলেন।

“জন্মদিনের শুভেচ্ছা,” তিনি বললেন, “তোমার জীবন ঋদ্ধ আর ফলপ্রসু হোক। সেখানে যেন কোনো অশুভ ছায়া না পড়ে।” সে নিজে নিজে কথাটার পুনরাবৃত্তি করল। জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে তিনি এ রকম অস্বাভাবিক বাক্য বেছে নিলেন কেন?

“বিশতম জন্মদিন মানুষের জীবনে একবারই আসে হে মেয়ে। দিনটি কখনো বদলানো যায় না। বুঝলে?”

সতর্কতার সঙ্গে সামান্য একটু মদ গলায় ঢেলে সে বলল, “জ্বি স্যার, আমি জানি।”

“আমার জীবনের এই বিশেষ দিনে হৃদয়বতী পরীর মতো আমার ডিনার নিয়ে এসেছ।”

“আমার কর্তব্য করছি মাত্র স্যার।”

“তারপরও...হে আমার তন্বী তরুণী।”

বৃদ্ধ লোকটি চেয়ারে বসে তাকে পর্যবেক্ষণ করছেন। আর সে বসে আছে একটা সোফার কিনারায়, হাতে ওয়াইনের গ্লাস। এক হাঁটুর ওপর আরেকট হাঁটু স্থাপিত। গলা পরিষ্কার করে সে তার স্কার্ট টেনে ঠিকঠাক করল। জানলার কপাটে বৃষ্টির ছাঁট এসে পড়ছে। ঘরময় অদ্ভুত নৈঃশব্দ্য।

“এটার একটা বিশেষ সমকেন্দ্রিকতা থাকা উচিত, না কী বল তুমি?”

কোনো মতেই দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে পারল না সে, তবে সম্মতিসূচক মাথা নাড়াল। রঙ জ্বলে যাওয়া নেক টাই স্পর্শ করে তিনি বললেন, "সেই কারণে, আমি মনে করি তোমাকে একটা উপহার দেয়া আমার জন্য জরুরি। একটা বিশেষ জন্মদিন একটা বিশেষ স্মারক উপহারের দাবি রাখে।"

খানিকটা বিচলিত হয়ে মাথা নাড়ল সে। বলল, দয়া করে দ্বিতীয়বার আর ওকথা বলবেন না স্যার। ওদের হুকুম তামিল করতে আমি আপনার ডিনার এখানে নিয়ে এসেছি।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক তার দু'হাতের পাতা তুলে বললেন, "এমন কথা বলো না মেয়ে। তোমার জন্য যে উপহারের কথা আমি ভেবেছি তা কোনো দৃশ্যমান বস্তু নয়। এমন। জিনিসও নয় যার গায়ে দাম লেখা থাকবে...।" তিনি টেবিলে হাত রেখে ধীরে ধীরে শ্বাস নিলেন, তারপর বললেন, "তোমার মতো সুন্দরী একটা মেয়ের জন্য আমি যা করতে চাই তা হলো- তোমার কোনো আকাক্ষা আমি পূর্ণ করব। যে কোনো ইচ্ছে,

যে কোনো সাধ, ধরে নাও এ ধরনের কোনো কামনা আছে তোমার।

"যে কোনো ইচ্ছে, যে কোনো আকাক্ষা?" গলা শুকিয়ে এল তার।

"যে কোনো ইচ্ছে, যাকে বাস্তবে রূপ দিতে চাও তুমি। তোমার যদি কোননা ইচ্ছে বা আকাঙ্ক্ষা থাকে বলো আমাকে। তবে একটি মাত্র ইচ্ছের কথাই বলতে। হবে, যা আমি পূর্ণ করব। শুধু একটি মাত্র ইচ্ছে, পরিবর্তন করতে পারবে না আর। ফিরিয়ে নেয়া যাবে না- এই আমার শর্ত।"

"কোনো কিছু পাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করতে হবে আমাকে আর আপনি তা পূরণ করবেন তাই-তো?"

ওই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বৃদ্ধ মুচকি মুচকি হাসলেন। খুব আন্তরিকতার সঙ্গে আর স্বাভাবিকভাবে কাজটি করলেন তিনি।

“কী মেয়ে তোমার কোনো আকাক্ষা আছে? না নেই?” কোমল সুরে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

.

“সত্যি তাই হয়েছিল, সে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “বানিয়ে বলছি না কিন্তু।”

“না, তা বলবে কেন।” আমি বললাম। সে এমন মেয়ে নয়, যে হাওয়া থেকে পেয়ে একটা ফালতু গল্প ফেঁদে বসবে। “তা ইচ্ছেটা কি ব্যক্ত করেছিলে?”

সে আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ছোট্ট একট শ্বাস ছাড়ল। “আমাকে ভুল বুঝো না,” সে বলল, “তার ওই কথা একশ ভাগ সিরিয়াসলি নেইনি আমি। বিশ বছর বয়সে তো কেউ কল্পনার রাজ্যে বাস করতে পারে না। ওটা যদি তার কোনো ঠাট্টা মস্করার আইডিয়া হতো তাহলে হয়ত আমি ওখানে বসেই বলে দিতাম। তিনি ছিলেন চৌকশ এক বুড়ো। চোখ দুটো পিট পিট করত। কাজেই তার সঙ্গে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। যা-ই বল না কেন ওটা ছিল আমার বিশতম জন্মদিন। আমি চাইনি ও রকম একটা দিনে আমার জীবনে সাদামাটা কিছু ঘটুক। বিশ্বাস করা বা না করার ব্যাপার ছিল না ওটা।”

কিছু না বলে আমি মাথা নাড়লাম।

“বুঝতেই পারছ কেমন লাগছে আমার। বিশতম জন্মদিন শেষ হয়ে যাচ্ছে বিশেষ কোনো ঘটনা ছাড়াই। কেউ হ্যাপি বার্থডে বলে উইশ করছে না আর আমি হেরিং মাছের চাটনিসহ ‘টরটিলিনি’ নামক খাবার লোকের টেবিলে টেবিলে পৌঁছে দিচ্ছি।”

আমি আবার মাথা নেড়ে বলি, “ভেবো না, বুঝতে পেরেছি।”

“অতএব আমার ইচ্ছের কথা প্রকাশ করেছি।”

.

বৃদ্ধ লোকটি কোনো কথা না বলে ওর দিকে শুধু তাকিয়ে থাকেন। হাত দুটি টেবিলে রাখা তখনও। টেবিলের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মোটা মোটা ফোল্ডার, হতে পারে হিসেবের খাতা, লেখার সরঞ্জাম, ক্যালেন্ডার আর সবুজ শেডঅলা একটা। ল্যাম্প। জানালার কাঁচে তখনও বৃষ্টির ছাট এসে লাগছে। সাটার গলিয়ে ঢুকে পড়েছে টোকিও টাওয়ারের আলো।

বৃদ্ধ লোকটির কপালের ভাজ একটুখানি গম্ভীর হয়েছে। “তাহলে ওটাই তোমার ইচ্ছে।”

“হ্যাঁ, ওটাই...।”

তিনি বললেন, “ তোমার বয়সী মেয়ের জন্য ওটা অস্বাভাবিক। অন্য রকম কিছু প্রত্যাশা করেছিলাম আমি।”

“থাক তাহলে, অন্য কিছু চাই আমি,” গলা পরিষ্কার করে সে বলল, “কিছু মনে করিনি আমি, অন্য কিছু না হয় কামনা করব, বুঝলেন কিনা?”।

হাত দুটো পতাকার মতো দুলিয়ে তিনি বললেন, “না না কোনো অসুবিধা নেই ওটাতে। বলছিলাম কী, এমন কিছু চাইতে পার না? এই যেমন তুমি আরও সুন্দরী বা স্মার্ট হতে চাও, কিংবা চাও অনেক ধনদৌলত। ও সব না চেয়ে ভালই করেছ, সাধারণ কোনো মেয়ে হয়ত ওরকম চাইত।”

সঠিক শব্দ চিন্তা করে বের করার জন্য খানিকটা সময় নিল সে। বৃদ্ধ নীরবে অপেক্ষা

করছেন শুধু। তার হাত জোড়া টেবিলের ওপর।

“অবশ্যই আমি আরও সুন্দরী, আরও স্মার্ট আর ধনী হতে চাই। কিন্তু আমি জানি না ওগুলোর কোনো একটা সত্যি হলে আমার দশা কী হবে। হতে পারে তা আমার প্রত্যাশারও বেশি যা সামলানো সম্ভব হবে না আমার পক্ষে। এখনও জানিনা কী আছে এই জীবনে আর তা কীভাবে চলে।”

“ও আচ্ছা।” নিজের এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলে জড়িয়ে এবং বের করতে করতে তিনি বললেন, “ও আচ্ছা।”

“তাহলে আমার ইচ্ছেটা ঠিক আছে তো?”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই।”

বৃদ্ধ দ্রলোক হঠাৎ তার দৃষ্টি শূন্যে স্থাপন করলেন। তার কপালের ভাঁজ আরও গম্ভীর হলো। কপালের ওই ভঁজ গিয়ে পড়তে পারে তার মস্তিষ্কেও, কেননা এটা তার ভাবনায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

তিনি বললেন, “তোমার প্রত্যাশা মঞ্জুর হয়েছে। যা চেয়েছ তা-ই পাবে তুমি।”

“সত্যিই?”

“হ্যাঁ, কোনো সমস্যাই হয়নি তন্বী তরুণী। জন্মদিন শুভ হোক। এখন কাজে ফিরে যেতে পার। ভেবো না, তোমার ট্রলি আমি পাঠিয়ে দেবো।”

এলিভেটরে চড়ে সোজা রেস্তোরাঁয় নেমে এলো সে। বিরক্তিজনক হালকা অনুভব করছিল সে, যেন রহস্যময় নরম পেঁজা তুলোর ওপর দিয়ে হাঁটছে। তরুণ ওয়েটারটি তাকে দেখে বলল, “ঠিক আছেন তো আপনি? কেমন নেশাগ্রস্তের মতো লাগছে

আপনাকে।”

দুর্বোধ্য একটা হাসি দিয়ে সে বলল, “তাই নাকি? কিন্তু আমি তো ভালই আছি।”

“আমাদের মালিক সম্বন্ধে কিছু বলুন। দেখতে কেমন তিনি?”

“সে তো জানি না, তার দিকে ভাল করে আমি তাকাইনি।” আলাপ সংক্ষিপ্ত করে বলল।

ঘন্টা খানেক পরে ট্রলিটা আনতে ওপরে গেল সে। রুমের বাইরে ছিল ওটা। বাসন-কোসনগুলো ওপরে রাখা। মুরগির তরকারি, সবজি এসব নেই। ওয়াইন আর কফির পাত্র খালি। ৬০৪ নম্বর রুম বন্ধ- নির্বিকার। একবার ঘরটার দিকে তাকাল সে। তার মনে হলো যে কোনো সময় দরজা খুলে যেতে পারে; কিন্তু খুলল না। সে এলিভেটরে করে ট্রলিটা নিচে নামিয়ে এনে ডিশওয়াশের কাছে রাখল।

.

“আমি আর কোনোদিন মালিককে দেখিনি,” সে বলল, “একবারও না। ম্যানেজারের অসুস্থতাটা ছিল সাধারণ পেট ব্যথা। হাসপাতাল থেকে ফিরে পরের দিন থেকেই তিনি মালিকের রুমে খাবার পৌঁছাতে শুরু করেন। নতুন বছরের সূচনালগ্নে আমি ওই চাকরি ছেড়ে দেই, আর কখনো ওখানে যাইনি। আমার মনে হয়েছে ওখানে না যাওয়াই ভাল। এক ধরনের পূর্বাশঙ্কার মতো ছিল ব্যাপারটা।”

নিজের ভাবনায় ডুবে থেকেই সে আবার বলল, “কখনো কখনো আমার মনে হয়, আমার বিশতম জন্মদিনে যা ঘটেছে তা ছিল এক ধরনের ভ্রান্তি বা মায়া। ব্যাপারটা এমন ছিল যে, ওটা ঘটেছে আমাকে এই বোঝাতে যে, যা কিছু ঘটে তা সব সত্য নয়। তবে আমি নিশ্চিত যে, ওটা ঘটেছিল। এখনও আমি রুম নম্বর ৬০৪ এর প্রতিটি

আসবাবপত্রের কথা স্পষ্ট মনে করতে পারি। যা কিছু ওখানে ঘটেছিল সব ছিল সত্য, আমার কাছে এর একটা গুরুত্বপূর্ণ অর্থও আছে।”

নিজেদের ভাবনা ভাবতে ভাবতে আর নিজেদের পানীয়তে চুমুক দিতে দিতে কিছুক্ষণ নীরব রইলাম আমরা দুজন।

“একটা জিনিস যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি তাহলে মাইন্ড করবে তুমি?” আমি বললাম, “একটা কথা নয় ধরো দুটো ব্যাপার জানতে চাই।”

“ঠিক আছে জিজ্ঞেস কর। আমার অনুমান সেদিন আমি কী চেয়েছিলাম তা জানতে চাও তুমি। ওটি তোমার প্রথম জিজ্ঞাসা।”

“কিন্তু তোমার কথা থেকে মনে হচ্ছে ও কথা তুমি কাউকে বলতে চাও না।”

“তাই মনে হচ্ছে নাকি?”

আমি মাথা নাড়ি।

দূরের কোনো বস্তু দেখতে গিয়ে লোকে যেমন চোখ সংকুচিত করে তেমনি চোখ ছোট করে সে বলল, “ওই ইচ্ছের কথা কাউকে জানানো কি ঠিক।”

“ওসব তোমার কাছ থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে আনার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। আমার জানার বিষয় একটিই, ওটা বাস্তবে রূপ নিয়েছিল কিনা। আর যা তুমি চেয়েছিলে তা না চেয়ে অন্যকিছু চাওনি বলে তোমার দুঃখ আছে কিনা।”

“প্রথম প্রশ্নের জবাব হচ্ছে হ্যাঁ একই সঙ্গে না।... শেষে ব্যাপারটা কীভাবে সমাধান করা হবে তা আমাকে দেখানো হয়নি।”

“তার মানে এটা এমন ইচ্ছে যা বাস্তবায়নের জন্য সময়ের প্রয়োজন?” “তা বলা যেতে পারে।”

“নির্দিষ্ট কোনো খাবার রান্না করার মতো ব্যাপার?”

সে মাথা নাড়ল।

“আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর কী?”

“কী যেন ছিল ওটা?”

“যা চেয়ে ফেলেছ তার জন্য কোনো দুঃখ আছে নাকি?”

কয়েক মুহূর্তের নীরবতার পর সে বলল, “আমি এখন বিবাহিতা। আমার স্বামী আমার চেয়ে তিন বছরের বড়। আমার দুটি সন্তান- একটি ছেলে, একটি মেয়ে। আমাদের একটা শিকারি কুকুর আছে। আমি একটা অডি গাড়ি চালাই। সপ্তাহে দু’দিন বান্ধবীর সাথে টেনিস খেলি। এই তো আমার জীবন এখন।”

“শুনতে খুব ভাল লাগছে আমার।” আমি বললাম।

“যদিও আমার অডি গাড়ির বাম্পারের দুটি জায়গা তুবড়ে গেছে।”

“ওহে, বাম্পার তো থাকে তুবড়ানোর জন্যই।”

“আচ্ছা একটা কথা বলে আমাকে, আমার জায়গায় তুমি থাকলে কী করতে?”

“বিশতম জন্মদিনের কথা বলছ তো?”

“আরে তা-ই তো।”

তার ওই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য কিছুটা সময় নিলাম; কিন্তু একটি মাত্র ইচ্ছে তালাশ করে পেলাম না।

“কোনো কিছুই ভাবতে পারছি না আমি; স্বীকার করে নিয়ে আমি বললাম, “বিশতম জন্মদিন থেকে আমি অনেক দূরে...।”

“আসলে কিছু ভাবাই সম্ভব নয় তোমার পক্ষে।” আমি মাথা নাড়লাম।

“কিছুই না?”

“না, কিছুই না।”

সে সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, “কারণ এর মধ্যেই তুমি তোমার ইচ্ছে ঠিক করে ফেলেছ।”

টনি টাকিটানি

টনি টাকিটানি

টনি টাকিটানির আসল নাম সত্যি-ই টনি টাকিটানি।

কোঁকড়া চুল আর মূর্তির মতো শারীরিক গড়নের কারণে সব সময়-ই তাকে শংকর বালক বলে ভুল করা হতো। যুদ্ধের পরে অনেক শিশুই চোখে পড়ত যাদের শরীরে মার্কিন রক্তের অস্তিত্ব ছিল। তবে টনির বাবা-মা দুজনেই খাঁটি জাপানি। ওর বাবা শোজাবুরো টাকিটানি ছিলেন জাজ দলের একজন সফল বংশীবাদক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার বছর চারেক আগে নারী ঘটিত এক সমস্যার কারণে তাকে টোকিও ছাড়তে বাধ্য করা হয়। তখন সে তার বাদ্যযন্ত্রটি সঙ্গে নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে চীনে চলে যায়। তখনকার সময় নাগাসাকি থেকে একদিনের মধ্যেই নৌকায় করে সাংহাই যাওয়া যেত। শোজাবুরোর এমন কোনো সম্পদ টোকিও বা জাপানের কোথাও ছিল না যা হারানোর ভয় তার ছিল। কোনো রকম অনুশোচনা ছাড়াই সে জাপান ত্যাগ করে। তখন তার বয়স ২১।

যুদ্ধের উত্থান আর জাপানের চীন অভিযান থেকে শুরু করে পার্ল হারবারে হামলা আর বোমা বর্ষণ সবকিছুকেই টনি খুব সহজভাবে গ্রহণ করেছিল। সাংহাইয়ের নাইট ক্লাবগুলোতে সে বাঁশি বাজাত। তার চাওয়া-পাওয়া খুব বেশি ছিল না। বাঁশি বাজানো,

দিনে তিনবেলা খাবার আর দু'একজন নারীর সঙ্গ পেলেই বর্তে যেত সে। একই সঙ্গে সে ছিল নরম আর উদ্ধত। প্রচণ্ডভাবে আত্মকেন্দ্রিক হলেও তার আশপাশের লোকদের প্রতি সব সময়ই দয়ামায়া প্রদর্শন করত, ফলে অধিকাংশ লোকই পছন্দ করত তাকে। তরতাজা, সুদর্শন আর প্রতিভাবান এই বাদ্যযন্ত্রী যেখানেই যেত বরফ ভেজা দিনের দৃঢ় একটা কাকের মতো লাগত তাকে। কতজন নারীর সঙ্গে বিছানায় যেত তার হিসাব রাখা সম্ভব হতে না তার পক্ষে। যাকে কাছে পেত তার সঙ্গেই রাত কাটাত টনি। হোক সে জাপানি, চীনা, সাদা চামড়ার রুশ মেয়ে, বেশ্যা, বিবাহিত মহিলা, বর্ণাঢ্য নারী, কিংবা অসুন্দরী মহিলা। অতি মনোহর বাঁশি, প্রচণ্ড সক্ষমতা আর বিশালাকৃতির লিঙ্গের জন্য সাংহাই নগরীতে খ্যাতি ছিল তার। কেজো বন্ধুত্ব' তৈরিতে সব সময়ই আনুকূল্য লাভ করত; যদিও সেটা জানত না সে। উচ্চ পদের সামরিক কর্মকর্তা, কোটিপতি, যুদ্ধকালীন ফায়দা লুটত এমন সব গোপন কারবারিদের সাথে ভাল সম্পর্ক ছিল তার। যে-কোনো কারণেই হোক শোজাবুরো টাকিটানি ও তাদের মধ্যে খুব ভাল ব্যাটে-বলে সংযোগ ঘটে গিয়েছিল। ফলে কোনো সমস্যা হলে তারা ওর ভালরকম দেখভালই করত।

কিন্তু মেধাও কখনো আপনার বিপক্ষে যেতে পারে। যুদ্ধ শেষ হলে তার ওই সম্পর্কগুলোর কারণে চীনা আর্মিদের কোপানলে পড়ে যায় সে এবং দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ থাকতে হয় তাকে। তার মতো আরও যাদের আটক করা হয়েছিল ক'দিন পর পর সেল থেকে বাইরে নিয়ে বিনা বিচারে হত্যা করা হতো। তেমন কিছু না, একজন গার্ড আসত কয়েদীকে বের করে নিয়ে পিস্তল দিয়ে মাথার খুলিটা উড়িয়ে দিত। শোজাবুরো ভেবেছিল কারগারেই মরণ হবে তার। কিন্তু মৃত্যুর সম্ভাবনা তাকে কোনো ভাবেই বিচলিত করতে পারেনি। মাথায় একটা গুলি করলেই তো সব শেষ হয়ে যাবে। কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার। এতোগুলো বছর যেমন ইচ্ছে তেমন জীবন যাপন করেছি। টনকে টন মেয়ে মানুষের সঙ্গে বিছানায় গেছি, ভাল-ভাল খাবার খেয়েছি, যাপন করেছি চমৎকার সময়, এমন জিনিস কমই আছে যা থেকে বঞ্চিত হয়েছি। তাছাড়া এমন অবস্থায় আমি নেই যে, মৃত্যুর ব্যাপারে অভিযোগ করতে পারি। যা হয় হবে। হাজার-

হাজার জাপানি প্রাণ হারিয়েছে যুদ্ধে, তাদের অনেকের জীবন গেছে খুব ভয়ঙ্কর ভাবে। এসব কথা টনি ভাবছিল।

অপেক্ষা করতে করতে শোজাবুরো ছোট্ট জানালা দিয়ে দেখল মেঘেরা উড়ে যাচ্ছে। মনে মনে সে তার সেলের দেয়ালের একটা মানসিক চিত্র আঁকল আর স্মরণ করল সেই সব মেয়েদের মুখ আর শরীর যাদের সঙ্গে সে বিছানায় গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সে দুই সৌভাগ্যবান জাপানিদের একজন ছিল যারা কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে স্বদেশে ফিরে যেতে পেরেছিল। অন্যজন উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল।

শোজাবুরো বোটের ডেকে দাঁড়িয়ে সাংহাইয়ের ছোট হয়ে আসা অ্যাভিনিউয়ের দিকে তাকাল দূর থেকে, ভাবল : আহারে জীবন, এ জন্মে তোকে আমি বুঝতে পারলাম না।

.

শোজাবুরো রোগা হয়ে পড়েছিল, কথা বলার শক্তি ছিল না তার। যুদ্ধ শেষ হওয়ার নয় মাস পরে ১৯৪৬ সালের বসন্তে সে জাপানে ফিরে আসে। ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসের বিমান হামলায় টোকিওতে অবস্থিত তাদের পৈত্রিক বাড়িটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মা-বাবা দুজনেই মারা গেছে ওই হামলায়। একমাত্র ভাই বার্মা সীমান্তে নিখোঁজ হয়েছে। শোজাবুররা এখন এই পৃথিবীতে একা। যদিও এটা তার জন্য কোনো বড় আঘাত নয়। এইসব ব্যাপার তাকে বিশেষভাবে বেদনার্ত করে তুলেছে। তা-ও নয়। হ্যাঁ দুঃখ অবশ্য আছে, আছে হারানোর বেদনা; তবে তার বিশ্বাস আগে হোক পরে হোক একদিন সবাইকে চলে যেতে হয়। তার বয়স তিরিশের কোঠায়, একাকিত্ব নিয়ে অভিযোগ করার বয়স পেরিয়ে গেছে। তার মনে হয় হঠাৎ তার বয়স কয়েক বছর বেড়ে গেছে। আর কোনো আবেগ তার মনে দানা বাঁধেনি। যে কোনো ভাবেই হোক শোজাবুরো রক্ষা পেয়েছে, এখন সে বেঁচেবর্তে থাকতে চায় এই ধরাধামে।

বাঁশি বাজানো ছাড়া আর কিছু জানত না বলে সে ওই কাজের জন্য পুরনো কিছু বন্ধুবান্ধবকে খুঁজে বের করে এবং একটা জাজ ব্যান্ড দাঁড় করিয়ে ফেলে যেটি একটি মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে বাজাতে শুরু করেছে। লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে পারদর্শিতার কারণে সে জাজ ভালবাসে এমন একজন মার্কিন মেজরের সঙ্গে বন্ধুত্ব। পাতাতে সক্ষম হয়। অবসরে তারা দুজন একত্র হয়। মেজর তাকে সব ধরনের খাবার- দুধ, তরল খাবার সরবরাহ করে যা এই বাজারে জোগাড় করা দুষ্কর। শাজাবুরো ভাবে খারাপ নয়, বেঁচে থাকার জন্য খারাপ সময় নয় এটা মোটেও।

১৯৪৭ সালের দিকে এক দূর সম্পর্কের খালাত বোনকে বিয়ে করে সে। একদিন তারা একসাথে বসে চা পান করে, আত্মীয়স্বজনদের খোঁজখবর করে আর পুরনো দিনের নানা স্মৃতি নিয়ে আলাপ করে। শেষে তারা একসাথে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেয় সম্ভবত এ কারণে যে, খালাত বোনটি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছিল। তার জন্মের ব্যাপারে। টনি টাকিটানি তার বাবার কাছ থেকে এমনটাই শুনেছিল। তার মা খুবই সুন্দরী ছিল, শান্তশিষ্ট মেয়ে ছিল সে, তবে স্বাস্থ্য ভাল ছিল না খুব একটা। বিয়ের এক বছর পর টনির জন্ম হয় আর এর তিন দিন পর মারা যায় সে। তাকে নীরবে ও দ্রুততার সাথে দাহ করা হয়। তার কোনো জটিলতা বা ভোগান্তির অভিজ্ঞতা হয়নি। যেন হঠাৎ করেই শূন্যে মিলিয়ে যায় সে।

বিষয়টি কী ভাবে অনুভব করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা শোজাবুরোর ছিল না। এই আবেগের কাছে সে যেন এক আগন্তুক। একটা অবিসংবাদিত ঘটনা হিসেবে ওটিকে হজম করে ফেলা ছাড়া আর কী-ই বা করার আছে তার? সে টের পায় অস্বস্তিকর কী একটা যেন তার বুকের ওপর চেপে বসে আছে। ওটা কী, আর ওখানে কেন তা সে বলতে পারে না। হাসপাতালে পড়ে থাকা শিশুটার কথা পর্যন্ত ভুলে বসে শোজাবুরো।

মেজর তাকে বুকে তুলে নেয় আর সম্ভাব্য সবরকম ভাবে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা পায়। তারা একসঙ্গে মদ পান করে। মেজর প্রায়ই তাকে বলে, "শক্ত হতে হবে। তোমাকে। শিশু সন্তানটিকে পালন করে বড় করতে হবে। এসব কথার কোনো মানেই খুঁজে পায় না সে। নীরবে শুধু মাথা নাড়ে। একদিন মেজর তাকে বলে, "তোমার ছেলেকে আমি লালন পালন করব, আমি হবো তার পালক পিতা। তার নামটাও আমি রাখব।" শোজাবুরো ভাবল, ছেলেটার একটা নাম রাখতেও ভুলে গেলাম আমি।

মেজর সাহেব পরামর্শ দিলেন-ডাকনাম থাক টনি; যদিও কোনো জাপানি শিশুর নাম সচরাচর টনি রাখা হয় না। কিন্তু এ রকম কোনো চিন্তা তার মনে কদাপিও উদিত হয়নি। ঘরে ফিরে শোজাবুরো একটা কাগজের ওপর লিখল- টনি টাকিটানি, তারপর ওটি টানিয়ে রাখল ঘরের দেয়ালে। পরবর্তী কয়েকদিন সে ওই কাগজটির দিকে বার বার তাকাল। টনি টাকিটানি, খারাপ না, চলে নামটা। মার্কিনীদের জাপানে অবস্থান আরও কিছু দিন স্থায়ী হবে, আমেরিকান ধাঁচের নামটি বাচ্চাটার জন্য বেশ লাগসই হবে, তাছাড়া নামটা বেশ ছোট।

.

ওই নামটা নিয়ে চলাফেরা করা শিশুটির জন্য নিতান্ত মস্করা মাত্র ছিল না। স্কুলে সবাই তাকে 'আধা-জাপানি' বলে অভিহিত করত। যখনই নিজের নামটি কারও কাছে বলত সবাই অবাক হয়ে তাকাত তার দিকে। কেউ কেউ মনে করত ঠাট্টা করছে বুঝি ছেলেটি; অন্যরা রেগে যেত।

এ ধরনের অভিজ্ঞতা বালকটিকে পৃথিবীর সবার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখছিল। ওর বাবা সঙ্গীত দলের সঙ্গে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াত আর একজন হাউসকীপার তার দেখাশোনা করত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার মতো বয়সে পৌঁছালে সে একাই থাকতে পারত। নিজে রান্না করত, ঘরে তালা লাগাত আর ঘুমাতেও যেত একা।

শোজাবুরো পুনর্বিবাহ করেনি, যদিও বিস্তর বান্ধবী তার ছিল। তবে তাদের কাউকে সে বাড়িতে আনত না। ছেলের মতো সে-ও নিজের দেখভাল নিজেই করত। পিতা আর পুত্র একে অন্য থেকে খুব বেশি একটা ভিন্ন ধরনের ছিল না। উভয়ে নিত্য নিঃসঙ্গতায় ভুগলেও দু'জনের একজনও তাদের হৃদয়টা একে অপরের কাছে মেলে ধরার কোনো উদ্যোগই নেয়নি। এর কোনো প্রয়োজনীয়তাও তারা অনুভব করেনি।

টনি আঁকতে ভালবাসত। ঘরের দরজা বন্ধ করে প্রতিদিন ছবি আঁকত সে। সবচেয়ে বেশি পছন্দ করত মেশিনের ছবি আঁকতে। পেন্সিলের সিস খুব চোখা করে সে বাইসাইকেল, রেডিও, ইঞ্জিন বা এ ধরনের ছবি আঁকত। কোনো চারাগাছের ছবি আঁকলে পাতার শিরা উপশিরা পর্যন্ত ফুটিয়ে তুলত। এ ভাবেই সে ছবি আঁকার কলাকৌশল রপ্ত করত। অন্য বিষয়ের চেয়ে আঁকাআঁকিতে বরাবরই ভাল করত সে, সাধারণত প্রথম পুরস্কার পেত আর্ট কম্পিটিশনে।

অতএব হাইস্কুলের পাঠ শেষ করে ইলাস্ট্রেটর হিসেবে নিজের ক্যারিয়ার গড়ার জন্য আর্ট স্কুলে ভর্তি হবে এটাই ছিল স্বাভাবিক। অন্য কোনো সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার কোনো দরকারই ছিল না। ভবিষ্যতে কী করবে তা নিয়ে অন্যরা যখন উদ্বিগ্ন টনি তখন ধুমছে মেকানিক্যাল ড্রইং নিয়ে ব্যস্ত রাখত নিজেকে। স্কুলের শিক্ষকগণ বাঁকা হাসি দিয়ে তার কাজের মূল্যায়ন করতেন, বন্ধুরা তার চিত্রকর্মে আদর্শিক বিষয়ের অভাব আবিষ্কার করত। নিজের কাছে তার ছবি ছিল অপরিপক্ক, কুৎসিত আর অযথার্থ।

গ্রাজুয়েট হয়ে বেরুবার পর তার সবকিছুই বদলে গিয়েছি। তার বাস্তবভিত্তিক কাজের কারণে চাকরি পেতে মোটেও অসুবিধা হয়।ন। সবাই বলত তার কর্ম 'বাস্তবের চেয়েও বেশি বাস্তব। হঠাৎ করেই সে এমন একজন ইলাস্ট্রেটরে পরিণত হলো যার চাহিদা প্রবল। সে কাজ করতে ভালবাসে এবং বিস্তর কামায়। টোকিওর অভিজাত শহরতলী সেতাগায়াতে সে বড় একটা বাড়ি কেনে। আরও কয়েকটা ফ্ল্যাটের মালিক হয়। ফলে

মোটা ভাড়া পেতে থাকে। একজন হিসাবরক্ষক সবকিছু দেখভাল করে।

জীবনের এই পর্যায়ে এসে বেশ ক'জন নারীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে তার। কিছু সময়ের জন্য একজনের সঙ্গে থাকে সে। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারটা বিবেচনায় আনার কথা ভাল না মোটেও। রান্নাবান্না, ঘরদোর সাফ-সুতরা কিংবা কাপড় ইস্ত্রির মতো কাজগুলো নিজেই সে করে, অসুবিধা হলে হাউসকীপার রাখে। সন্তান লাভের ইচ্ছা জাগে না তার মনে। তার পিতার ভেতর যে সব বিশেষ আকর্ষণ ছিল তা ওর নেই। সত্যিকার কোনো বন্ধুও নেই তার যে তাকে বুদ্ধি পরামর্শ দিতে পারে কিংবা যার কাছে সে মনের সবকিছু অকপটে বলতে পারে বা এক সঙ্গে বসে পান করতে পারে। অথচ প্রতিদিন যেসব লোকের সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাৎ হয় তাদের সঙ্গে চমৎকার সম্পর্ক বজায় রাখে। তার ভেতর কোনো অহংকার বা ঔদ্ধত্য নেই। পরিচিত সবাই তাকে পছন্দ করে। এক দু বছর বা তিন বছরে বাবার সঙ্গে দেখা হয় তার কোনো কাজ-টাজ থাকলে। কাজ শেষ হয়ে গেলে একে অপরকে বলার মতো কিছুই থাকে না তাদের। আর এভাবেই নীরবে নিভৃতে বয়ে চলে টনির জীবনের স্রোত।

কিন্তু একদিন কাউকে কেনো রকম জানান টানান না দিয়েই প্রেমে পড়ে টনি। মেয়েটি একটা প্রকাশনা সংস্থায় পার্টটাইম কাজ করত। একটা ইলাস্ট্রেশন নিতে সে টনির অফিসে গিয়েছিল। শান্তশিষ্ট আর গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে। বয়স বাইশের মতো। মুখে সব সময় হাসি লেগে থাকে। দেখতে শুনতে খারাপ নয়, তবে তাকে চোখ ধাঁধানো সুন্দরী বলা যায় না। তারপরও মেয়েটির ভেতর এমন কিছু একটা আছে যা টনিকে নাড়া দিয়েছে। প্রথম যখন মেয়েটিকে দেখে সে এমনভাবে মোহাবিষ্ট হয় যে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে তার। এ রকম আন্দোলিত সে কেন হলো তা-ও বলা সম্ভব ছিল না তার পক্ষে।

আকৃষ্ট হওয়ার দ্বিতীয় প্রধান কারণ ছিল মেয়েটার পোশাক। লোকজনের কাপড় চোপড় নিয়ে সে যে খুব মাথা ঘামায় তা-ও নয়। কিন্তু মেয়েটার পোশাকে এমন চমৎকার কিছু

একটা সে খুঁজে পেয়েছে যা তাকে মুগ্ধ করেছে। তার পাশে যে সব মেয়ে সে দেখে তাদের পোশাক পরিচ্ছদও চমৎকার; কিন্তু এই মেয়েটা সবার থেকে আলাদা। এমন স্বাভাবিক সুন্দর উপায়ে সে তার কাপড়-চোপড় পড়ে যে, মনে হয় একটা পাখি উড়বার মুহূর্তে নিজেকে ডানার ভেতর লুকিয়ে রেখেছে, যেন সে উড়ে যাবে অন্য কোনো জগতে। এমন স্বচ্ছন্দে আর সুন্দর কাপড় পড়তে কোনো মেয়েকে সে দেখেনি আগে। মেয়েটা চলে যাওয়ার পর সে স্তম্ভিত হয়ে তার টেবিলের পেছনে বসে থাকে। সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত সে কোনো কাজ করতে পারে না।

পরের দিন সে ওই প্রকাশককে ফোনে নানা ছুতোছা করে মেয়েটাকে তার অফিসে পাঠাতে বলে। কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর সে মেয়েটাকে লাঞ্চের আমন্ত্রণ জানায়। খাবার সময় তারা খুব বেশি কথা বলে না। তাদের মধ্যে বয়সের ব্যবধান পনের বছর হলেও আশ্চর্য হয়ে তারা লক্ষ্য করে অনেক কিছুতেই তাদের ভেতর বিস্তর মিল। প্রতিটি ব্যাপারেই তারা একমত হয়। দু'জনের কারও আগে এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয়নি। মেয়েটার মধ্যে প্রথমে খানিকটা নার্ভাস ভাব ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে তা কেটে যায় আর সে ভোলামেলাভাবে হাসতে ও কথা বলতে সক্ষম হয়।

বিদায় নেয়ার সময় টনি বলে, "সত্যিই তুমি কাপড়-চোপড় পড় খুব সুন্দরভাবে।"

সলজ্জ হেসে মেয়েটা বলে, "নানা ধরনের পোশাক পরতে ভালবাসি আমি। আমার বেশির ভাগ টাকাই কাপড়-চোপড় কিনতে চলে যায়।"

সেদিনের পর আরও কয়েকবার সাক্ষাৎ হয় তাদের মধ্যে। কোথায়ও যায় না তারা। একটা নির্জন স্থানে বসে নিজেদের অতীত, তাদের কাজকর্ম, ভাবনা-চিন্তা ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ করে। কথা বলতে বলতে কখনো তারা ক্লান্ত হয় না। মনে হয় তারা যেন একে অপরের শূন্যতা পুরণ করে যাচ্ছে।

যখন তাদের মধ্যে পঞ্চমবারের মতো সাক্ষাৎ ঘটে টনি বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু স্কুল জীবন থেকে মেয়েটার একটা ছেলে বন্ধু আছে। মেয়েটি স্বীকার করে যে, সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে ওই সম্পর্কের আদর্শিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে, এখন দেখা হলে শুধু তুচ্ছ জিনিস নিয়ে নানা সংঘাত মোকাবিলা করতে হয় তাদের। সত্যিকথা বলতে গেলে টনির সঙ্গে সাক্ষাতে যে স্বাচ্ছন্দ্য ও মজা সে পেয়েছে ওর সঙ্গে তা পায়নি। তার মানে এই নয় যে, ওই সম্পর্কটা সে ভেঙে দেবে। যা-ই থাকুক

কেন মেয়েটির হাতে দেখানোর মতো অনেক যুক্তি আছে। আর তাছাড়া দু'জনের ভেতর বয়সের ব্যবধান পনের বছরের। মেয়েটি এখনও যুবতী, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা কম। সে ভাবে ভবিষ্যতে বয়সের ওই ব্যবধান কি কোনো সমস্যা সৃষ্টি করবে? ভাববার জন্য কয়েকটা দিন সময় চায় সে।

ভাববার জন্য যে সময় মেয়েটি অতিবাহিত করছে তার প্রতিটি দিনকে টনির কাছে নরক-যাপনের মতো মনে হচ্ছে। কোনো কাজকর্মই করতে পারছে না সে। একা বসে বসে শুধু মদ পান করে। এই একাকিত্বের যন্ত্রণা থেকে তার ভেতর চরম উদ্বেগ দেখা দেয়। মনে হয় সে যেন কারাগারে বাস করছে। সে ভাবে, আগে কখনো এমন হয়নিতো! প্রচণ্ড হতাশা নিয়ে সে চারদিকের দেয়ালের দিকে তাকায় আর চিন্তা করে, মেয়েটা যদি না করে দেয় তাহলে আত্মহত্যা ছাড়া কোনো রাস্তা খোলা থাকবে না তার সামনে।

টনি একদিন মেয়েটার সাথে দেখা করে আর যা সে ভাবছে হুবহু তাকে বলে। সে জানায় সে খুব একা, আর বিগত বছরগুলোতে অনেক কিছুই সে হারিয়েছে। এখন কেমন করে সে সবকিছু তাকে বোঝাবে।

সে বুদ্ধিমতী মেয়ে। টনিকে সে পছন্দও করে। শুরু থেকেই সে ওকে নিয়ে ভেবেছে। ওর সঙ্গে প্রতিটি সাক্ষাতের পর থেকেই ওর প্রতি তার ভাললাগা উত্তরোত্তর বেড়েছে।

সে বুঝতে পারে না এই ভালোগাকে ‘ভালবাসা’ বলে অভিহিত করা যায় কিনা। তবে সে বুঝতে পারে তার ভেতরে চমৎকার এক অনুভূতির সঞ্চার হয়েছে। ওর সঙ্গে জীবন গড়তে পারলে সে সুখীই হবে। অতঃপর তারা বিয়ে করে ফেলে।

.

তাকে বিয়ে করার মাধ্যমে টনির নিঃসঙ্গ জীবনের সমাপ্তি ঘটল। ঘুম থেকে উঠেই সে স্ত্রীর দিকে তাকায়। তার পাশে ওকে ঘুমাতে দেখে সে স্বস্তি অনুভব করে। বিছানায় সে না-থাকলে উদ্বিগ্ন হয় আর সারা বাড়ি তাকে খুঁজতে থাকে। নিঃসঙ্গতার বোধ না থাকাটাই তার কাছে অদ্ভুত লাগে এখন। নিঃসঙ্গতার বোধ না থাকায় তার ভেতর এই আশংকার সৃষ্টি হয় যে, সে আবার না নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। এই ব্যাপারটি তাকে তাড়া করে ফেরে। এখন কী করবে সে? এই ভয় তার দেহে শীতল ঘামের সৃষ্টি করে। যেহেতু সে তার নতুন জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, তার স্ত্রীর আকস্মিক চলে যাওয়ার ভয় কমে আসছে। কাজেই তার উৎকণ্ঠাও ধীরে ধীরে কমে আসে। শেষ পর্যন্ত সে সুস্থির হয় আর নিজেকে সুখ আর শান্তির ভেতর মুড়িয়ে ফেলে।

তার শ্বশুর সাহেব কী ধরনের সঙ্গীত সৃষ্টি করেন একদিন সে শুনতে চায়। বলে, “তার বাজনা শুনতে চাইলে তিনি কি মাইন্ড করবেন?”

“সম্ভবত না।” বলল টনি।

তার এক রাতে গিনজা নাইট ক্লাবে গিয়ে হাজির হলো যেখানে শোজাবুরো টাকিটানি বাজিয়ে থাকে। ছোটবেলার পর এই প্রথম সে তার বাবার বাজনা শুনতে এল। শোজাবুরো টাকিটানি সেই বাজনাই বাজাচ্ছিল যা সে অতীতে বাজাত, সেই একই জিলিস যা টনি তার বাল্যকালে রেকর্ডে শুনেছে। শোজাবুরোর রীতি সরল, চমৎকার আর মিষ্টি একে হয়ত শিল্প বলা যায় না, তবে তা খুব দক্ষতা আর পেশাদারিত্বের সঙ্গে

বানানো। এই সঙ্গীত দর্শক-শ্রোতাদের দারুণ এক মুডের ভেতর নিয়ে যেতে পারে।

তারপরও টনির মনে হলো এখন যে সঙ্গীত সে শুনছে তা আগের থেকে একটু হলেও ভিন্ন। বেশ কয়েক বছর আগে সে এই বাজনা শুনেছে, শুনেছে শিশুর কান দিয়ে, তবুও তার মনে হলো, যে ভিন্নতাটুকু এখন সে অনুভব করছে তার গুরুত্ব অপরিসীম। তা নিতান্ত সামান্য হলেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তার খুব ইচ্ছে হলো স্টেজে উঠে বাবাকে বলতে, "এটা কী বাবা? বদলেছে কোনটা?" কিন্তু সে পারলো না। তার মনে কী আছে কোনো দিন বলতে পারবে না সে। তার পরিবর্তে সে বসে বসে বাবার অনুষ্ঠান উপভোগ করল মদ পান করতে করতে। অনুষ্ঠান শেষে খুব হাততালি টালি দিয়ে বউকে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

.

এই দম্পতির বিবাহিত জীবনে কোনো ছায়া ছিল না। তারা ঝগড়া ফ্যাসাদ করেনি আর এক সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা সুখের সময় কাটিয়েছে, একসঙ্গে হেঁটেছে, বেড়িয়েছে, সিনেমায় গেছে। কর্মক্ষেত্রে টনির সাফল্য অব্যাহত আছে আর তার স্ত্রী। খুব যযাগ্যতার সাথে তাদের সংসার চালিয়েছে। তবে একটা ব্যাপার টনিকে খানিকটা উদ্বিগ্ন করেছে, তাহলে পোশাকের প্রতি ওর স্ত্রীর অসম্ভব আসক্তি। ভাল কোনো পোশাক চোখে পড়লে না কিনে ছাড়ে না সে। তখন তার চোখে-মুখে অদ্ভুত এক অভিব্যক্তির সৃষ্টি হয়, গলার স্বর পর্যন্ত বদলে যায়। প্রথম যখন ব্যাপারটা টনি লক্ষ্য করে, ভেবেছিল ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বিয়ের আগেই সে খেয়াল করেছে জিনিসটা। তবে হানিমুনের পর থেকে ব্যাপারটা প্রকট আকার ধারণ করেছে। ইউরোপ ভ্রমণের সময় সে বিপুল পরিমাণ জিনিসপত্র কেনে। মিলান ও পারীতে সে এক বুটিক থেকে আর এক বুটিক, সকাল থেকে রাত আচ্ছন্নের মতো ঘুরে : বেরিয়েছে। কোনো দর্শনীয় স্থানে পর্যন্ত যায়নি। দুমো কিংবা লুভে না গিয়ে তারা ভ্যালেনটিনো, মিসোনি, সেন্ট লরেন্ট, গিভেঙ্গি,

ফেরাগামো, আরমানি, মেরুত্তি, গিয়ানফ্রাঙ্কো ফের-এ গেছে। মহাবিষ্টের মতো সে হাতে যা যা ধরেছে কিনেছে। টনি শুধু তাকে অনুসরণ করেছে, আর বিল পরিশোধ করেছে। সে উদ্বিগ্ন হয়ে ভেবেছে কখন তার ক্রেডিট কার্ডের ব্যালেন্স শেষ হয়ে যায়।

জাপানে ফেরার পরও তার ওই 'ক্রয়-জ্বর' প্রশমিত হয়নি। প্রায় প্রতিদিনই কাপড়-চোপড় কিনছে সে। বাড়িতে এখন তার জামা-কাপড়ের বিশাল স্তূপ। ওগুলো রাখার জন্য টনিকে বিশাল-বিশাল কয়েকটি পোশাকাগার বানাতে হয়েছে। ওর জুতো রাখার জন্যও একটা ক্যাবিনেট বানিয়েছে টনি। তারপরও জিনিসপত্র রাখার জায়গা হচ্ছে না। শেষে রুমজুড়ে বড় একটা ক্লোসেট বানাতে হয়েছে তাকে। তাদের বাড়িতে অবশ্য ঘরের অভাব নেই আর টাকা-পয়সা তো কোনো সমস্যাই নয়। নতুন পোশাক পরলে তাকে দারুণ খুশি খুশি লাগে, ফলে টনি সেসব নিয়ে কোনো অভিযোগ-অনুযোগ না তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। এই পৃথিবীতে কেউ-ই ত্রুটিহীন নয় টনি ভাবে।

এক সময় তার কাপড়-চোপড়ের পরিমাণ এত বেশি হয়ে যায় যে, বিশাল সে ঘরটিতে শুধু ওর কাপড়ই রাখা হতো সেখানেও স্থান সংকুলান হলো না আর। টনি নিজেও তখন সন্দেহ প্রবণ না হয়ে পারল না। একদিন সে যখন বাইরে ছিল টনি তার পোশাক গণনা করল। হিসাব করে দেখল, দিনে দু'বার কাপড় পাল্টালে ওই পোশাকে সে দু'বছর কোনো রকম রিপিটেশন ছাড়াই ব্যবহার করতে পারবে। সে শুধু পাগলের মতো ওগুলো কিনেছে, পরার সময় করে উঠতে পারেনি। টনি তখন ভাবল কোনো মানসিক সমস্যা সৃষ্টি হলো নাকি ওর। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে তো ওর ওই অভ্যাসটির পায়ে শেকল পরাতে হবে।

এক রাতে টনি ডিনারের সময় বলল, "তোমার পোশাক কেনার বাতিকটা তো একটুখানি কমাতে হয় হে। টাকা-পয়সার প্রশ্ন অবশ্য এটা নয়। তোমার কেনা কাটার ব্যাপারে তো আমার আপত্তি থাকবার কথা নয়, তাছাড়া সুন্দর পোশাকে তোমাকে

দেখতে ভালও লাগে আমার, তবে কথা কি জানো এতো এতো দামি পোশাকের কী দরকার আছে?”

ওর স্ত্রী চোখ নামিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর ওর দিকে তাকিয়ে বলল, “তুমি ঠিকই বলেছ। এতো পোশাকের আমার কোনো দরকার নেই। আমি নিজেও তা জানি। তা সত্ত্বেও আমি নিজেকে সংযত করতে পারি না। সুন্দর পোশাক দেখলেই কিনতে ইচ্ছে হয় আমার। দরকার আছে কি নেই সেই বিচারে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। মোদ্দা কথা আমি নিরুপায় হয়ে পড়ি।”

সংযত হওয়ার শপথ করে সে বলল, “এভাবে কাপড়-চোপড় কিনলে সারা বাড়ি আমার পোশাকে-পপাশাকে সয়লাব হয়ে যাবে।”

কাজেই সে সপ্তাহখানেক বাড়ি থেকে বেরুল না এবং পোশাক কেনা থেকে বিরত থাকল। এই সময়টা সত্যিই তার জন্য ছিল দুর্ভোগের। তার মনে হলো, সে কোনো গ্রহের উপরিতল দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে যেখানে বাতাসের স্বল্পতা রয়েছে। ঘরেই কাটায় সে। একটা করে পোশাক বের করে আর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওটার দিকে। ওটা হাতে নিয়ে দলাই মলাই করে, গন্ধ শোঁকে। দু’চারটে আবার পরেও ফেলে। পরে সে আয়নায় নিজেকে দেখে। যত যত বেশি নিজেকে দেখে ততবেশি নতুন পোশাকের আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে জন্ম নেয়। এক সময় নতুন পোশাকের জন্য তার তৃষ্ণা প্রবল হয়ে ওঠে। সে আর সইতেই পারে না ...

তবে স্বামীকে সে গভীরভাবে ভালবাসে। শ্রদ্ধাও করে খুব। সে জানে ও ঠিকই বলেছে। একদিন সে তার প্রিয় এক পোশাক বিক্রেতাকে তার বাড়িতে ডেকে পাঠায়। এবং জানায় যেসব কাপড় সে দশ বারো দিন আগে কিনেছে, কিন্তু এখনও পরেনি সেগুলো সে ফেরৎ নেবে কিনা। দোকানদার জানায় অবশ্যই ফেরৎ নেবে। তিনি হচ্ছেন ওদের একজন ভাল খদ্দের। তার জন্য এইটুকু করতে পারবে না? তখন সে দ্রুত তার রেনাল্ট

চিঙ্ক গাড়িটাতে চেপে বসে, আয়োমাতে অবস্থিত অভিজাত কাপড়ের দোকানে গিয়ে পোশাকগুলো ফেরৎ দেয় এবং ক্রেডিট স্লিপ নিয়ে দ্রুত গাড়িতে ফিরে আসে। দোকানের অন্য কোনো পোশাকের দিকে না তাকানোর চেষ্টা করে। পোশাকগুলো ফেরৎ দিতে পেরে অনেকখানি হালকা বোধ করে। নিজেকে বোঝায়, ওগুলোর কোনো দরকারই আমার ছিল না। বাকি জীবন চালিয়ে নেয়ার মতো কাপড় চোপড় আমার আছে। কিন্তু রাস্তায় যখন সে সবুজ সিগন্যাল বাতির জন্য অপেক্ষা করে তখন ফেরৎ দেয়া পোশাকগুলোর কথা মনে পড়ে তার। ওগুলোর রঙ, কাটিং, বুনোট ইত্যাদির কথা স্পষ্ট মনে পড়ে তার। তার মনে হয় ওগুলো তার চোখের সামনে ঝুলে আছে। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে। দু'হাত দিয়ে স্টিয়ারিং শক্ত করে ধরে দীর্ঘ একটা শ্বাস গ্রহণ করে চোখ বুজে ফেলে। সেই মুহূর্তেই চোখ খুলে দেখে সবুজ বাতি জ্বলে উঠেছে। এক্সলেটরে চাপ দেয়। একটা ট্রাক হলুদ বাতি জ্বালিয়ে মোড় অতিক্রম করার চেষ্টা করছিল তখন। সেটি সজোরে রেনাল্টটাকে আঘাত করে। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই সব শেষ হয়ে যায়।

.

টনি টাকিটানির ঘরে এখন শুধু পোশাক আর পোশাক। এ ছাড়াও আছে ১১২ জোড়া জুতো। এগুলো দিয়ে কী করবে সে এখন? তার সব পোশাক তো আর সে সারা জীবন রেখে দিতে পারবে না। সে একজন ডিলারকে তলব করে হ্যাট ও অন্য কিছু আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র বিক্রি করতে রাজি হলো। মোজা ও অন্তর্বাসগুলো পুড়িয়ে ফেলবে সে। তারপরও বাকি থাকবে বিপুল পরিমাণ কাপড়-চোপড় আর জুতো। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর টনি পোশাকের ঘরে দরজা দিয়ে ওগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পার করল ক'টা দিন।

দিন দশেক পরে মহিলা সহকারী চেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিল টনি। পোশাকের সাইজ

২, উচ্চতা ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি, জুতোর মাপ ৬, বেতন ভাল, কাজের পরিবেশ ও শর্তাবলী উত্তম। বেতন যেহেতু খুব বেশি ছিল ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য ১৩জন মহিলা এসে হাজির হলো। এদের মধ্যে কমপক্ষে পাঁচজন পোশাকের সাইজের ব্যাপারে মিথ্যে বিবৃতি দাখিল করেছিল। বাকি আটজনের মধ্যে থেকে একজনকে নির্বাচন করল সে।

গড়নের বিচারে মেয়েটি তার স্ত্রীর কাছাকাছি। বয়স মধ্য পঁচিশ। চেহারা বৈশিষ্ট্যহীন। তার পরনে ছিল সাদা ব্লাউজ আর নীল স্কার্ট। পোশাক-আশাক পরিচ্ছন্ন কিন্তু পুরনো।

টনি টাকিটানি মেয়েটিকে বলল, "তোমার কাজ কঠিন নয়। নটা-পাঁচটা অফিস করবে, টেলিফোন রিসিভ করবে, আমার করা ইলাস্ট্রেশন ডেলিভারি দেবে, আমার হয়ে নানা জিনিস রাখবে, ফটোকপি করবে এইসব আর কী। তবে একটা শর্ত আছে। সম্প্রতি আমার স্ত্রী মারা গেছে, বাড়িতে তার প্রচুর জামা কাপড় পড়ে আছে। এগুলোর বেশির ভাগই নতুন অথবা নতুনের মতো। ইউনিফর্মের মতো তুমি এগুলো পরে অফিস করবে। জানি শুনতে অদ্ভুত লাগছে তোমার কাছে; কিন্তু বিশ্বাস কর আমার কোনো খারাপ মতলব নেই। আমার স্ত্রী যে নেই তা বুঝতে আমাকে সময় দেয়া আর কী। তার কাপড়-চোপড় পরে থাকলে আমার শেষ পর্যন্ত ধারণা জন্মাবে আমার স্ত্রী আসলেই মারা গেছে।"

ঠোঁট কামড়াতে-কামড়াতে প্রস্তাবটি নিয়ে ভাবছিল মেয়েটি। অনুরোধটি অদ্ভুত তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তবে বিষয়টা বোধগম্য হলো না তার। তার স্ত্রী বিয়োগের ব্যাপারটা বুঝলো। এ-ও বুঝলো তার স্ত্রী অনেক কাপড়-চোপড় রেখে গেছে। কিন্তু এটা কিছুতেই বুঝতে পারল না তার কাপড়-চোপড় পরে অফিস করতে হবে কেন। তবে তার মনে হলো, লোকটাকে দেখে খারাপ মনে হচ্ছে না। স্ত্রী বিয়োগের কারণে তার মনের মধ্যে কিছু একটা তৈরি হয়েছে। কিন্তু তিনি এমন ধরনের লোক নন যার দ্বারা কারও কোনো ক্ষতি হতে পারে। সে যা-ই হোক না কেন, কাজটা তার দরকার; অনেক দিন ধরেই

একটা কাজ খুঁজছে সে। বেকারত্ব সংক্রান্ত ইন্সিওরেন্সের মেয়াদও ফুরিয়ে আসছে। এরকম ভাল বেতনের চাকরি আর সে না-ও পেতে পারে।

সে বলল, "মনে হয় আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি। আমার ধারণা আপনার কথা মতো কাজ করতে পারব আমি। তবে কোন জামা কাপড়গুলো আমাকে পরতে হবে তা যদি একবার দেখাতেন, তাহলে চেক করতে পারতাম আমার গায়ে লাগবে কিনা।"

"অবশ্যই"। টনি বলল। সে মেয়েটিকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কাপড় চোপড়গুলো দেখতে দিল। কোনো ডিপার্টমেন্ট স্টোর ছাড়া এক সঙ্গে এক জায়গায় এত পোশাক-আশাক জীবনেও দেখেনি সে। প্রতিটি পোশাকই দামি ও উন্নত মানের। রুচিও নিখুঁত। সে এত অবাক হলো যে নিঃশ্বাসই নিতে পারছিল না। বুক ধড়ফড় করতে লাগল তার। বুঝতে পারল কামজ উত্তেজনা ঘিরে ধরেছে তাকে।

ঘরের ভেতর তাকে একা রেখে টনি বেরিয়ে গেল। মেয়েটি নিজে নিজেই কয়েকটা পোশাক পরার চেষ্টা করল। কয়েক জোড়া জুতো পছন্দ করে পরে দেখল। সবকিছুই ঠিক মতো লাগছে, যেন তার জন্যই বানান হয়েছে। একটার পর একটা পোশাক সে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। ওগুলোর গায়ে হাত বুলাল আর গন্ধ শুকলো। শত শত পোশাক থরেথরে সাজান। তার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। কিছুতেই সে তার অশ্রু সম্বরণ করতে পারছিল না। যে নারীর পোশাক পরে এখন সে দাঁড়িয়ে আছে সে এই পৃথিবীতে নেই। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল সে তখনও, নিজেকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করছিল। তখনই টনি ঢুকল সেখানে।

"কী ব্যাপার কাঁদছ কেন তুমি?"

মাথা নাড়িয়ে সে বলল, "জানি না। এত সুন্দর সুন্দর পোশক আগে কখনো দেখিনি। ব্যাপারটা আমাকে বিচলিত করে তুলেছে। দুঃখিত, ক্ষমা করবেন আমাকে।" একটা

রুমাল দিয়ে চোখ মুছল সে।

“না না ঠিক আছে। আমি চাই কালই কাজে যোগ দাও তুমি,” ব্যবসায়ী সুলভ কণ্ঠে বলল টনি, “সপ্তাহখানেক চলে এই পরিমাণ জামা কাপড় আর জুতো নিয়ে যাও।” সপ্তাহের কাপড় আর জুতো পছন্দ করতে অনেকটা সময় ব্যয় করল মেয়েটি। তারপর একটা স্যুটকেসে ভরে নিল।

টনি বলল, “একটা কোটও নিও, ঠাণ্ডা লাগতে পারে।”

একটা গরম কাশ্মিরী কোট পছন্দ করল সে। ওটি খুবই হালকা, মনে হয় পালকের তৈরি। এ রকম হালকা কোট কখনো পরেনি সে।

.

মেয়েটি চলে যাওয়ার পর উনি আবার পোশাকের ঘরে গিয়ে ঢুকল আর শূন্য দৃষ্টিতে ওগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। সে কিছুতেই ভেবে পেল না পোশাকগুলো দেখার সময় কেন মেয়েটি কেঁদেছিল। তার কাছে ওগুলোকে ছায়া বলে মনে হলো যা তার স্ত্রী রেখে গেছে। তার স্ত্রীর সাইজ ২ এর ছায়া সারিবদ্ধভাবে রাখা আছে এ ঘরে। এক সময় এগুলো ওর শরীরের সঙ্গে সেঁটে থাকত। যা তাদেরকে জীবনে উষ্ণতা যোগাত, দিত চলার গতি। তার সামনে টাঙ্গানো এই কাপড়গুলো এখন নোংরা ছায়া ছাড়া আর কিছুই নয়। জীবনের শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন, শুকনো বিবর্ণ বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়, যার কোনো মানেই এখন আর নেই। এখন সে ঘৃণা করে এগুলোকে। দেয়ালের উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে হাত দুটি ভাঁজ করে চোখ বন্ধ করে ফেলে সে। আবার নিঃসঙ্গতা এসে ঘিরে ধরে তাকে। সব শেষ। যা-ই করে থাকি কেন সব শেষ হয়ে গেছে।

সে মেয়েটিকে ডেকে পাঠায় এবং বলে এই চাকরির ব্যাপারটি যেন ভুলে যায় সে। ক্ষমা চেয়ে জানায়, তার জন্য কাজ করবার দরকার নেই আর।

অবাক হয়ে মেয়েটি বলে, “কী করে হয় স্যার?”

“আমি দুঃখিত। অবস্থা বদলে গেছে,” বলল টনি, ‘তুমি এই জামা কাপড় জুতো স্যুটকেস ভরে নিয়ে যেতে পার। আমি চাই ব্যাপারটা তুমি ভুলে যাও, আর কাউকে বোল না কিছু...।।

মেয়েটির কিছুই করার ছিল না। এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে কোনো লাভও নেই, কাজেই সে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

.

মুহূর্তের জন্য মেয়েটি টনির ওপর ক্ষিপ্ত হলো; কিন্তু শিগগিরই বিষয়টা অনুধাবন করল সে নিশ্চয়ই এর চেয়ে ভাল কোনো সমাধান সে খুঁজে পেয়েছে। শুরু থেকেই ব্যাপারটা ছিল অদ্ভুত। চাকরিটা হলো না বলে খুব মন খারাপ হলো তার। শেষে ভাবল, অন্য কোনো কাজ নিশ্চয়ই জুটে যাবে।

টনি টাকিটানির বাড়ি থেকে আনা পোশাকগুলো সে ইস্ত্রি করে ওয়ারড্রবে ঢুকিয়ে রাখল। আর জুতো রাখল দরজার পাশের ক্যাবিনেটে। সদ্য আনা পোশাকগুলোর তুলনায় তার কাপড় জামাগুলো কত্তো মলিন আর জীর্ণ। সে তার ব্লাউজ ও স্কার্ট খুলে জিন্স আর শার্ট পরে নিল। তারপর বিছানায় বসে ঠাণ্ডা বিয়ার পান করতে লাগল। টনির বাড়িতে দেখা পোশাকগুলোর কথা মনে করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। কত্তো সুন্দর সুন্দর পোশাক। আর ওগুলো রাখবার ক্লোসেটটা তার এই অ্যাপার্টমেন্টের চেয়েও বড়। ওগুলো কিনতে না জানি কত টাকা খরচ হয়েছে। আর সেই মহিলাই জীবিত নেই এখন। এত কাপড়-চোপড় রেখে মরে যাওয়া, অবাক লাগে না..

ওই মহিলার বান্ধবীরা ভাল করেই জানত সে ছিল গরিব, তারা প্রতিদিন ওকে নতুন নতুন দামি ও উন্নত ব্র্যান্ডের পোশাক পরতে দেখে অবাক হতো।

“এতো দামি-দামি পোশাক পাও কোথায়?” হয়ত জিজ্ঞেস করত তারা।

সে হয়ত উত্তর দিত, “না বলার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি, আর যদি বলিও বিশ্বাস করবে না তোমরা।”

শেষ পর্যন্ত টনি টাকিটানিকে আবারও একজন কাপড়ের ডিলারের শরণাপন্ন হতে হয় যে কিনা তার স্ত্রীর রেখে যাওয়া সব কাপড়-চোপড় কিনে নেয়। সে অবশ্য আসল দামের বিশ ভাগের এক ভাগ দিয়েছিল। কিন্তু টনির কিছু যায় আসেনি। ওগুলোকে সে এমন জায়গায় নিয়ে যাবে তাকে আর কোনো দিন দেখতে হবে না।

মাঝে মধ্যে কোনো দিন হয়ত সে ওই ফাঁকা ঘরটাতে ঢুকবে আর শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে। মেঝেতে বসে দেয়ালের দিকে তাকাবে, চোখ মেলে দেবে তার স্ত্রীর ছায়ার দিকে। কিন্তু কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর ওই ঘরটিতে কী ছিল তা স্মরণে আনার ক্ষমতা হারাতে থাকে সে। ওগুলোর রঙ আর গন্ধের স্মৃতি সে বুঝে ওঠার আগেই ভুলে যায়। তার ভেতরে যে সুস্পষ্ট আবেগ অনুভূতি ছিল তা-ও পিছু হটে। যেন মনের গহন থেকেই বিদায় নিয়েছে তা। প্রতিটি স্মৃতিই এখন ছায়ার ছায়া এবং তার ছায়া। শুধু বাস্তব একটা জিনিসই আছে- না থাকার অনুভব।

কখনো কখনো স্ত্রীর মুখখানা সে মনেই করতে পারে না। শুধু এক মহিলার মুখ মনে পড়ে, সেই মহিলাকে মনে হয় আগন্তুক। সে শুধু শূন্য ঘরখানায় বসে চোখের জল ফেলে। দিন অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে সব কিছুই ভুলে গেছে সে, তার নাম; তার ইমেজখানা সে শুধু আশ্চর্যজনকভাবে মনে রেখেছে।

টনির স্ত্রীর মৃত্যুর দু’ বছর পরে লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে তার বাবা মারা গেছে। বেশিদিন অবশ্য ভোগেনি শোজাবুরো টাকিটানি। হাসপাতালেও ছিল অল্প ক’টা দিন। মৃত্যুর পর তাকে দেখে মনে হয়েছে যেন ঘুমিয়ে আছে। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে

তার শেষ জীবনটা সে কাটিয়েছে হাসি খুশির মধ্য দিয়ে। সামান্য নগদ ক'টা টাকা আর স্টক শেয়ার রেখে গেছে সে, যাকে সম্পত্তি বলে অভিহিত করা যায় না। কিছু বাদ্যযন্ত্র আর জাজ সঙ্গীতের বড় একটা সংগ্রহ অবশ্য রেখে গেছে সে। টনি ওগুলো একটা ঘরের ভেতর বাক্সবন্দী করে রেখেছে কারণ ওগুলো থেকে। ছাতলার গন্ধ বেরুতে পারে। নিয়মিত তাকে ও ঘরের জানালা খুলতে হবে। তা না হলে ঢোকাই যাবে না সেখানে।

বাক্স ভর্তি ওই রেকর্ডগুলো এখন দারুণ ভোগাচ্ছে তাকে। ওই ঘরে ঢুকলেই দম বন্ধ হয়ে আসে তার। মাঝে মাঝেই মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে যায়। পরে আর ঘুম আসে না। ক্ষীণ হয়ে আসছে স্মৃতির পর্দা, তবে এখনও আছে, আগে যেখানে ছিল সেখানে সব ভার সমেত স্মৃতির যা থাকতে পারে। রেকর্ডগুলোর জন্য আবার ডিলারের শরণাপন্ন হতে হয় তাকে। অনেক মূল্যবান আর আউট অব প্রিন্ট রেকর্ড সেখানে থাকায় ভাল দাম পাওয়া যায়, যা দিয়ে ছোট একটা গাড়ি কেনা যায়। তার কাছে অবশ্য টাকার কোনো মানেই নেই। রেকর্ডগুলো ওর বাড়ি থেকে অপসারিত হওয়ার সাথে সাথে টনি সত্যিই একা হয়ে পড়ে।

তুষার-মানব

তুষার-মানব

একজন তুষার-মানবকে বিয়ে করেছি আমি।

তার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল একটা স্কী-অবকাশ যাপন কেন্দ্রে। তুষার মানবের সঙ্গে সাক্ষাতের ওটাই সম্ভবত প্রকৃষ্ট স্থান। ওকানকার হোটেল লবীতে প্রাণবন্ত সব তরুণ-তরুণীদের ভিড়। কিন্তু তুষার-মানব ফায়ার প্লেস থেকে অনেকটা দূরে একটা সোফায় বসে একা একা বই পড়ছিলেন। যদিও তখন প্রায় দুপুর, কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের আলো তার ওপর এসে পড়েছিল।

"ওই দেখ তুষার-মানব," ফিসফিস করে বলে আমার বান্ধবী। সেই সময়টাতে তুষার-মানব সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। বান্ধবীও জানত না তেমন কিছু। "নির্ঘাত ভদ্রলোক বরফ দিয়ে তৈরি বুঝলি? যে কারণে লোকে তাকে তুষার মানব বলে ডাকে।" চোখ-মুখের ভঙ্গিতে সিরিয়াসনেস প্রকাশ করে এমনভাবে কথাগুলো বলেছিল, যেন সে ভুত-প্রেত কিংবা ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত কারও সম্বন্ধে বিবৃতি দিচ্ছে।

তুষার-মানব ছিলেন লম্বা। দেখে মনে হচ্ছিল যুবক। তবে তারের মতো ছোট ছোট তার চুলের ওপর ছোপ-ছোপ সাদা, যেন গলে না যাওয়া বরফ। চোখের নিচের হাড়গুলো

জমাট পাথরের মতো চোখা। তার আঙ্গুলগুলো সাদা তুষারে ঘেরা, মনে হচ্ছে কোনো দিনও গলবে না ওগুলো। ওসব বাদ দিলে ভদ্রলোক খুব সাদাসিধে সাধারণ একজন মানুষ। তাকে খুব সুদর্শন বলা না-গেলেও আকর্ষণীয় বলতে বাধা নেই, তবে তা নির্ভর করবে আপনি তাকে কী দৃষ্টিতে দেখছেন তার ওপর।

যে ভাবেই হোক তার কিছু জিনিস আমার হৃদয়কে প্রচণ্ডভাবে বিদ্ধ করল। অন্য কোনো জায়গার চেয়ে তা সবচেয়ে বেশি অনুভব করলাম তার চোখে। তার দৃষ্টি নির্বাক ও এমন স্বচ্ছ যেন শীতের সকালে তুষারিকার ভেতর দিয়ে ঢুকে যাওয়া আলোর রেখা।...

কিছুক্ষণের জন্যে ওখানে দাঁড়ালাম আর দূর থেকে তুষার-মানবকে প্রত্যক্ষ করলাম। চোখ তুলে তাকালেন না। নড়াচড়া না করে বই পড়তে লাগলেন, যেন তার আশপাশে কেউ নেই।

পরের দিন সকালে তুষার-মানবকে একই জায়গায় বসে একই ভাবে গ্রন্থপাঠরত অবস্থায় দেখা গেল। লাঞ্চ সেরে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে স্কীইং করে সন্ধ্যায় যখন ফিরলাম দেখা গেল তখনও তিনি সেখানে বসে ওই একই বই পড়ছেন। তারপরের দিনও সেই একই ব্যাপার। সূর্য পাটে বসল, সময় গেল বয়ে; তিনি বাইরের শীতের দৃশ্যাবলীর মতো চেয়ারে বসে রইলেন।

চতুর্থ দিন কিছু ছুতো-ছল করে স্কীইং করতে বেরুলাম না। হোটেলের লবীতে পায়চারি করতে লাগলাম একা একা। সেখানে তখন ভৌতিক নীরবতা। বাতাস খানিকটা ভেজা-ভেজা। ঘরের ভেতর কেমন যেন বিষণ্ণতার ঘ্রাণ। মনে হয় লোকজনের জুতোর তলায় করে আসা বরফের গন্ধ ওটা। ওই বরফের কণাগুলো ফায়ারপ্লেসের সামনের জায়গাটাতে গলছিল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। তারপর একটুখানি নার্ভ শক্ত করে তুষার-মানবের কাছে গিয়ে কথা বললাম।

যথার্থ কারণ ছাড়া অপরিচিত লোকেদের সামনে গেলে বরাবরই আমি লজ্জা বোধ করি। অচেনা মানুষের সাথে সাধারণত আমি কথা বলি না। কেন জানি না তুষার মানবের সঙ্গে আলাপ করার জন্য নিজের ভেতর চাপ অনুভব করলাম। ওটা ছিল হোটেলে আমার শেষ রাত আর এখন যদি না করি তাহলে হয়ত জীবনে আর কোনো তুষার-মানবের সঙ্গে আলাপ করা হবে না।

"আপনি স্কীইং করেন না?" যতখানি স্বাভাবিকভাবে বলা যায় ততখানি স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম।

তিনি এমনভাবে ধীরে ধীরে আমার দিকে তাকালেন যেন দূরে কোনো গোলমাল শুনতে পেয়েছেন। তারপর মাথা নাড়িয়ে বললেন, "স্কীইং আমি করি না। এখানে বসে বসে বই পড়ি আর বাইরের তুষারের দিকে তাকিয়ে থাকি।" তার কণ্ঠনিঃসৃত বাক্য তার ওপরে মেঘের সৃষ্টি করল। কমিক-স্ট্রিপ ক্যাপশনের মতো। বাতাসের ওপর কথাগুলো দেখতে পেলাম যতক্ষণ না তিনি ওগুলো তুষার ঘেরা আঙ্গুল দিয়ে সরিয়ে দিলেন।

তারপর কী বলতে হবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না আমার। লজ্জায় আরক্তিম আমি শুধু দাঁড়িয়ে রইলাম ওখানটায়। তুষার-মানব আমার চোখের দিকে তাকালেন, মনে হলো মুচকি হাসলেন।

"বসতে চাও আমার পাশে?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি, "আমার প্রতি তোমার আগ্রহ আছে, তাই না? তুমি জানতে চাও তুষার-মানব বস্তুটা আসলে কী।" তিনি হাসলেন অতঃপর। "ভাবনার কিচ্ছুটি নেই। আমার সঙ্গে কথা বললে ঠাণ্ডা লাগবে না তোমার।"

লবীর এক কোণায় স্থাপিত একটা সোফায় পাশাপাশি বসলাম আমরা তারপর জানালা দিয়ে বাইরের তুষার নৃত্য অবলোকন করতে লাগলাম। গরম কোকাকোলা আনিয়ে পান করলাম আমি; কিন্তু তুষার-মানব কিছুই খেলেন না। মনে হলো আলাপ সালাপে তিনি

আমার থেকে খুব বেশি একটা পটু নন। শুধু তা-ই নয় কথা বলবার মতো কোনো কমন বিষয়ও আমাদের ছিল না। প্রথমে আমরা আবহাওয়া নিয়ে আলাপ করলাম। তারপর হোটেল বিষয়ে। "একা এসেছেন এখানে?" জিজ্ঞেস করলাম আমি। "হ্যাঁ।" বললেন তিনি। স্কীইং আমি পছন্দ করি কিনা শুধালেন। আমি বললাম, "তেমন একট নয়। বন্ধুবান্ধবের পীড়াপীড়িতে আসতে হয়েছে। স্কীইং আমি খুব কম করি।"

অনেক কিছু জানবার ছিল। তার শরীর কি আসলেই বরফের তৈরি? তিনি কী খান? গ্রীষ্মে কোথায় থাকেন? তার কি পরিবার পরিজন আর আত্মীয়স্বজন আছে। এইসব আর কী। কিন্তু তুষার-মানব নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে নারাজ। ফলে ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা থেকে বিরত থাকলাম।

তিনি আমার সম্পর্কে আলাপ করতে লাগলেন। বিশ্বাস করা কঠিন হলেও এটা সত্যি যে, যেমন করেই হোক আমার সম্পর্কে তিনি সবকিছু জানেন। আমার পরিবারের লোকজন, আমার বয়স, ভালোগা-মন্দলাগা, স্বাস্থ্যের অবস্থা, আমার লেখাপড়া এমনকি আমার বন্ধু-বান্ধবী সম্পর্কেও জানেন তিনি। আমার অতীতে কী ঘটেছে যা খোদ আমিও ভুলে গেছি সে সবও জানা আছে তার।

রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, "কিছুতো বুঝতে পারছি না, আপনি আমার সম্পর্কে এতকিছু..." মনে হলো একজন আগন্তুকের সামনে উদোম হয়ে গেছি। "মানুষের মনে কী আছে আপনি তা পড়তে পারেন?"

"না, মানব হৃদয় পাঠের ক্ষমতা আমার নেই বা ওরকম কিছু আমি জানি না। এমনি জানি," বললেন তুষার-মানব, "যেন বরফের গভীরে চোখ মেলে দিয়েছি। এমন করে যখন কারও দিকে তাকাই সব স্পষ্ট হয়ে যায়।"

"আপনি কি আমার ভবিষ্যত দেখতে পারবেন?"

“না,” ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন তিনি, “ভবিষ্যতের ব্যাপারে মোটেও আগ্রহ নেই আমার। আর সংক্ষেপে বলতে গেলে ভবিষ্যতের ব্যাপারে কোনো ধারণাই আমার নেই। যে কারণে বরফের কোনো ভবিষ্যত নেই। এর ভেতরে অতীত ভরে দেয়া আছে। বরফ এভাবেই সবকিছু পরিচ্ছন্ন ও স্পষ্টতার সাথে সংরক্ষণ করতে পারে যেন তারা এখনও জীবন্ত। এটাই হচ্ছে বরফের মূল ব্যাপার বা নির্যাস বলা যেতে পারে।”

“চমৎকার তো,” মৃদু হেসে বললাম আমি, “এ কথা শুনে স্বস্তি পেলাম। আসলে ভবিষ্যত জানার কোনো আগ্রহ ছিল না আমার।”

শহরে ফিরে আসার পর বেশ ক’বার মিলিত হলাম আমরা। বলতে গেলে ডেটিং-ই করতে লাগলাম। যদিও সিনেমা কিংবা কফি হাউসে যাইনি। এমনকি রেস্তোরাঁতেও নয়। তুষার-মানব বলতে গেলে কিছুই খান না। আমরা প্রায়ই কোনো পার্কের বেঞ্চে বসে কথাবার্তা বলি, তবে তুষার-মানব নিজের সম্পর্কে একেবারেই নীরব থাকেন।

“এটা কেন?” একদিন বলি আমি, “নিজের সম্পর্কে তুমি কিছুই বল না যে?” আমি তোমার সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চাই। কোথায় তোমার জন্ম, তোমার বাবা-মা দেখতে কেমন? কেমন করে তুমি তুষার-মানবে পরিণত হলে এসইব...”

আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে তুষার মানব বললেন, “আমি কিছুই জানি না। সবকিছুর অতীত আমি জানি। কিন্তু আমার নিজের কোনো অতীত নেই। বর্তমান আছে কিনা তা-ও জানি না। জন্ম কোথায় আমার, কিংবা বাবা-মা দেখতে কেমন সে সবও জানা নেই আমার। এখন আমার বয়স কত সে সম্পর্কেও কোনো ধারণা আমার নেই।”...

তুষার-মানব অন্ধকার রাতে পাথরের মতো ভাবলেশহীন মানুষের মতো নিঃসঙ্গ। আমি গভীরভাবে তার প্রেমে পড়ে গেলাম। বর্তমানের মতো তিনি ভালবাসেন আমাকে।

আমার ভবিষ্যতের কোনো অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। আমি তাকে বর্তমান সমেত ভালবাসি- তার অতীতকে অস্বীকার করে। বিয়ের ব্যাপারেও কথাবার্তা বলতে শুরু করি আমরা।

আমার বয়স এখন বিশ। তুষার-মানবই প্রথম ব্যক্তি যাকে আমি ভালবেসেছি। একজন তুষার-মানবকে ভালবাসার মানে কী কল্পনাতেও আনতে পারছি না। একজন স্বাভাবিক মানুষকেও যদি ভালবাসতাম তাহলেও হয়ত ভালবাসার মানে আমি বুঝতাম না।

আমার মা ও বড়বোন তুষার-মানবকে বিয়ের ব্যাপারে তীব্র বিরোধিতা করলেন। "বিয়ের জন্য এখনও উপযুক্ত বয়সে পা দাওনি তুমি। তাছাড়া, পাত্রের অতীত ইতিহাসও তোমার অজানা," বললেন তারা, "তার জন্ম কোথায় সে কথাটি পর্যন্ত জান না তুমি। আত্মীয়স্বজনদেরই বা বলব কী করে এমন একটা মানুষকে তুমি বিয়ে করছ। তার ওপর সে আবার তুষার-মানব, যদি গলেটলে যায় তখন কী করবে? তুমি মনে হয় জান না বিয়ের জন্য সত্যিকারের অঙ্গীকারের দরকার হয়।"

যদিও তাদের এই উদ্বেগের কোনো ভিত্তি ছিল না। তুষার-মানব তো আসলে বরফে তৈরি নয়। যত গরমই পড়ুক না কেন গলে যাবে না। তার শরীর বরফের মতো ঠাণ্ডা থাকে বলে তাকে সবাই তুষার-মানব বলে ডাকে। তবে যা দিয়ে সে তৈরি তা বরফ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আর ওটা এমন ধরনের ঠাণ্ডা নয় যা অন্য লোকের উত্তাপ দূর করতে পারে।

.

একটা ভাল দিন দেখে বিয়ে করে ফেললাম আমরা। এই বিয়ের জন্য কেউ আশীর্বাদ করল না। কোনো আত্মীয়-স্বজনই আমাদের পরিণয়ে খুশি হলো না। আমরা কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজনও অবশ্য করিনি। তুষার-মানবের পারিবারিক রেজিস্টারে আমার

নাম ভুক্তির বিষয় উঠলে দেখা গেল কোনো রেজিস্টারই নেই। আমরা দুজনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম বিয়ে করব, বিয়ে করে ফেলেছি এই আর কি। একটা কেক কিনে মজা করে খেলাম দু'জনে। ওই রকমই ছিল আমাদের সংযত বিবাহ।

ছোট্ট একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিলাম। তুষার-মানব সাহেব একটা চাকরি নিলেন কোল্ড স্টোরেজে। যে কোনো ধরনের ঠাণ্ডা তিনি সইতে পারেন আর কখনোই ক্লান্ত হন না তার কাজ যত পরিশ্রমেরই হোক না কেন। তার কাজকর্মে ওপরঅলা খুব খুশি আর এ কারণে তাকে বেতনও দেন অন্যদের চেয়ে বেশি। কাউকে জ্বালাতন না করে আর কারও জ্বালাতনের শিকার না হয়ে সুখে শান্তিতে বাস করতে থাকি আমরা।

তুষার-মানব যখন রমণ করেন মনের ভেতর আমি একটা বরফের খণ্ড প্রত্যক্ষ করি। আমি নিশ্চিত যে, কোথাও তার নীরব অস্তিত্ব বিদ্যমান। ভাবি তুষার-মানব সম্ভবত জানেন বরফের খণ্ডটি কোথায়। জমে একেবারে শক্ত হয়ে আছে ওটি। এত শক্ত যে এর চেয়ে শক্ত আর কিছুই হতে পারে না। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বরফের টুকরো ওটা। ওটার অবস্থান অনেক দূরের কোনো স্থানে। আর তুষার-মানব সেই স্মৃতি তুলে দিচ্ছেন আমার কাছে ও পৃথিবীর কাছে। প্রথম যখন তুষার মানবের সঙ্গে আমার যৌন-মিলন ঘটে আমি খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। পরে অভ্যস্ত হয়ে উঠি। তার সঙ্গে মিলিত হতে খুবই ভাল লাগে আমার। রাতে আমরা ওই বিশালকায় পাথরটি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেই, যার ভেতর জমা হয়ে আছে কোটি কোটি বছরের অতীত।

আমাদের বিবাহিত জীবনে সমস্যা নেই কোনো। আমরা একে অপরকে গভীরভাবে ভালবাসি। আমাদের মাঝখানে কোনো রকমের বাঁধার দেয়াল নেই। আমরা একটা সন্তান চাইছিলাম; কিন্তু তা হয়ত সম্ভব ছিল না। সম্ভবত মানবজীন আর তুষার-মানবের জীন সহজে মিলতে পারে না। তবে বাচ্চাকাচ্চা না থাকায় আমার হাতে বেশ সময় থাকে। সকালে কাজকর্ম শেষ হয়ে গেলে করবার মতো কিছুই থাকে না। কথা বলার

মতো কোনো বন্ধুবান্ধবীও নেই। প্রতিবেশীদের সাথেও মেলামেশার সুযোগ নেই। তুষার-মানবকে বিয়ে করার কারণে মা ও বোন এখনও আমার ওপর রেগে আছেন। আমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের কোনো লক্ষণই টের পাচ্ছি না। বিয়ের পর বেশ ক'মাস অতিক্রান্ত হলেও কেউই আমাদের বিয়েটা মেনে নিতে পারছে না। আমরা তাদের থেকে ভিন্ন রকমের, কাজেই যতই সময় অতিক্রান্ত হোক না কেন আমাদের ভেতরকার ব্যবধান ঘুচবে না কোন দিন।

তুষার-মানব কাজে চলে গেলে আমি বাসাতেই থাকি, বইটই পড়ি কিংবা গান শুনি। বাসায় থাকতেই ভাল লাগে আর একা থাকতেও খারাপ লাগে না। কিন্তু আমার বয়স কম, রোজ রোজ একই কাজ করতে করতে প্রকারান্তরে নিজেকে একঘেয়ে করে তুলেছি। এটা অবশ্য সেই ধরনের একঘেয়েমি নয় যা বিরক্তিকর। এটাকে বলা যায় পুনরাবৃত্তি।

তাই একদিন আমার স্বামীকে বলি, "বেড়াতে গেলে কেমন হয়? একটুখানি চেঞ্জের জন্য আর কী?"

চোখ ছোট ছোট করে সে বলে, "বেড়াতে যাবে? মানুষ যায় বেড়াতে। কেন। এখানে সুখ পাচ্ছ না?"

"তা কেন হবে গো," আমি বললাম, "সুখেই তো আছি। কিন্তু একঘেয়েমি লাগে না? দূরে কোথাও চল যাই, যেখানে আগে কখনো যাওয়া হয়নি, দেখা হয়নি, বুঝলে? তাজা বাতাসে নিশ্বাস নিতে চাই। তাছাড়া আমরা তো ধর হানিমুনেও যাইনি। হাতে কিছু টাকা জমেছে। ছুটিও পাওনা আছে তোমার...।"

"বেশ তুমি যখন এত করে বলছ তখন আর মানা করি কিভাবে। তোমার সুখের জন্য যে কোনোখানে যেতে পারি। কিন্তু কোথায় যেতে চাও?"

“দক্ষিণ মেরুতে গেলে কেমন হয়?” বললাম আমি। দক্ষিণ মেরু নির্বাচন করেছি এ কারণে যে আমি নিশ্চিত ছিলাম তুষার-মানব ঠাণ্ডা কোনো স্থানে যেতে অবশ্যই আগ্রহ দেখাবেন। আর সত্যি কথা বলতে কি সব সময়ই ওখানে যেতে চেয়েছি আমি। মনের মধ্যে সাধ, টুপি সমেত ফারকোট গায়ে দেব, কুমেরু উষা আর পেঙ্গুইনের ঝাঁক দেখব।

এসব কথা বলতেই আমার স্বামী পলকহীন চোখে সোজা আমার দিকে তাকালেন। মনে হলো চোখা একটা বরফের টুকরো আমার মাথার পিছন দিয়ে ঢুকে গেছে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে তিনি শেষে বললেন, “ঠিক আছে, তুমি যখন চাইছ। তাহলে দক্ষিণ মেরুতেই যাওয়া থাক। সত্যিই কী যেতে চাও ওখানে?”

ঠিক তখনই তার কথার জবাব দেয়া সম্ভব হলো না আমার পক্ষে। তুষার-মানব এত দীর্ঘ সময় আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন যে আমার মাথা অনুভূতি শূন্য হয়ে পড়ল। তারপরও মাথা নাড়লাম।

সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর দক্ষিণ মেরুতে যাওয়ার পরিকল্পনার জন্য অনুশোচনা এল আমার মনে। কেন জানি না। তবে আমার মনে হয়েছে দক্ষিণমেরু কথাটা উচ্চারণ করা মাত্র তার ভেতরে একটা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তার চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠেছে তীক্ষ্ম, নিশ্বাস আরও সাদা আর আঙ্গুলগুলো ভরে উঠেছে তুষার কণায়। আমার সঙ্গে কথা বলা ও খাওয়া-দাওয়া এক রকম ছেড়েই দিলেন তিনি। ফলে আমি প্রচণ্ড নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে লাগলাম।

আমাদের সফরের নির্ধারিত তারিখের পাঁচ দিন আগে নার্ভ শক্ত করে আমি বললাম, “দক্ষিণ মেরুতে যাওয়ার পরিকল্পনা বাদ দিলে হয় না? ভেবে দেখলাম ওখানে এখন ভীষণ ঠাণ্ডা, শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। আচ্ছা ইউরোপের দিকে গেলে কেমন হয়? স্পেনেও তো যাওয়া যায়। ওখানে খুব করে মদ পান করা যাবে, পায়েলা খাওয়া যাবে, উপভোগ করা যাবে ষাড়ের লড়াই। কি বল?”

কিন্তু আমার ওই কথায় কোনো গুরুত্বই দিলেন না তিনি। বললেন, “বিশেষ করে স্পেনে যেতে চাই না আমি। আমার পক্ষে জায়গাটা খুব গরম হবে। ধুলোবালি খুব বেশি ওখানে আর খাবারে মশলাও ওরা বেশি দেয়। তাছাড়া দক্ষিণ মেরুতে যাবার টিকেটও কিনে ফেলেছি। তোমার ফারকোট, জুতো এসবও কেনা হয়ে গেছে। ওগুলো তো আর নষ্ট করা যায় না। এতদূর অগ্রসর হয়ে এখন এই সফর বাতিল করা ঠিক হবে না।”

আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, খুব ভয় পেয়ে গেছি। আমার ভেতর একটা পূর্বাশঙ্কা কাজ করছে দক্ষিণ মেরুতে গেলে এমন একটা অঘটন ঘটবে যা আমরা সামাল দিতে পারব না। বার বার আমি একই দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম। হেঁটে বেড়ানোর সময় একটা হিমবাহের তুষারের উপরিভাগের গভীর ফাটলের ভেতর পড়ে যাচ্ছি। ওখানে পড়ে গেলে কেউ খুঁজে পাবে না আমাকে। মরে একেবারে জমে থাকব। বরফের নিচে থেকে ওপরে তাকাব, আকাশ দেখব, হয়ত জ্ঞান হারাবোনা, তবে নড়াচড়া করা সম্ভব হবে না। বুঝতে পারব ক্রমে ক্রমে অতীতে পরিণত হচ্ছি। আমার দিকে তাকিয়ে লোকে বুঝবে তারা অতীতের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি হব। তাদের থেকে দূরের একটি দৃশ্য মাত্র। ...

জেগে উঠে দেখি তুষার-মানব আমার পাশে শুয়ে ঘুমাচ্ছেন। সব সময়ই তিনি খুব বাজেভাবে ঘুমান। মরা মানুষের মতো। তবে আমি খুবই ভালবাসি তাকে। আমার চোখ বেয়ে পানি পড়ে। সেই পানি গিয়ে পড়ে তার গালে। জেগে ওঠেন তিনি। আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। “খুব বাজে একটা স্বপ্ন দেখেছি।” তাকে বলি!

“ও তো স্বপ্ন মাত্র,” তিনি বলেন, “স্বপ্নের জন্ম হয় অতীত থেকে, ভবিষ্যত থেকে নয়। তাদের বন্ধনে তুমি আবদ্ধ নও। তারা তোমার বন্ধনে আবদ্ধ। বুঝতে পেরেছ?”

বুঝিনি তা-ও বলি, “হ্যাঁ।”

সফর বাতিল করার যৌক্তিক কোনো কারণ খুঁজে না পেয়ে আমরা দক্ষিণ মেরুগামী বিমানে চেপে বসি। বিমানবালারা সবাই খুব মিতভাষী। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম প্রকৃতি দর্শনের জন্য; কিন্তু ওখানে ঘন মেঘ জমেছিল বলে কিছু দেখা গেল না। একটু পরেই জানালার কাঁচ তুষারের পর্দায় ঢাকা পড়ল। আমার স্বামী চুপচাপ বই পড়ছিলেন। অবকাশ যাপনে যাওয়ার কোনো উত্তেজনাই স্পর্শ করল না আমাকে। কিছু না করে গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে যাচ্ছিলাম শুধু, হয়ত ভাগ্যে যা ছিল সেভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে সব।

বিমানের সিঁড়ি বেয়ে দক্ষিণ মেরুর মাটিতে পা রাখতেই টের পেলাম আমার স্বামীর পা টলমল করছে। খুব অল্প সময়ের জন্য তা স্থায়ী হলো এবং তার চেহারায় কোনো পরিবর্তন সাধিত হলো না। কিন্তু ব্যাপারটা দেখতে পেলাম আমি। তুষার মানবের ভেতরে খুব গোপনে বড় রকমের ঝাঁকুনি গেছে একটা। ক্ষণিকের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে যান তিনি এবং প্রথমে আকাশ ও পরে নিজের হাতের দিকে তাকান। দীর্ঘ একটা শ্বাস গ্রহণ করেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হাসেন। বলেন, "এই জায়গাতেই তো আসতে চেয়েছিলে তুমি?"

"হ্যাঁ," আমি বলি।

দক্ষিণমেরু আমার কল্পনার চেয়েও বেশি নির্জন। লোকজন নেই বলতে গেলে। ভূত-ভবিষ্যতহীন একটি ছোট্ট শহর। একটিমাত্র ছোট্ট হোটেল, তারও কোনো ছিরিছাদ নেই। এটা কোনো ট্যুরিস্ট স্পটও নয়। একটা পেঙ্গুইনও চোখে পড়ছে না। কুমেরু উষাও দেখা গেল না। গাছপালা, ফুল, নদী, পুকুর কিছুই নেই এখানে। চারদিকে শুধু বরফ আর বরফ। বরফের নিষ্ফলা জমিন।

আমার স্বামী প্রচণ্ড উৎসাহে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগলেন। দ্রুত ওখানকার ভাষা শিখে তিনি শহরবাসীর সঙ্গে তুষার ঝড়ের বেগে জলদগম্ভীর কণ্ঠে বাতচিত

করতে লাগলেন। কথা বলার সময় তার চোখে মুখে সিরিয়াসনেস ফুটে উঠল, তবে ওসবের মাথামুণ্ডু উদ্ধার করা আমার জন্য অসম্ভব ছিল। মনে হলো আমার স্বামী বেঈমানি করেছেন আমার সঙ্গে, আর আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন আমার নিজের জিম্মায়।

বরফে আচ্ছন্ন বাক্যহীন ওই জগতে অচিরেই আমি আমার সকল শক্তি ও সাহস হারিয়ে ফেললাম। শেষের দিকে বিরক্ত হওয়ার ক্ষমতাও চলে গেল আমার ভেতর থেকে। মনে হলো আবেগের দিকনির্ণয় যন্ত্রটাও খুইয়ে বসে আছি। সময়, দিক ও নিজ সত্তার বোধ সম্পর্কিত জ্ঞানও হারিয়ে ফেলেছি। কখন এর শুরু কখন এর শেষ জানি না। যখন চেতনা ফিরে পেলাম, দেখলাম এক বরফের জগতে বসে আছি সব রঙ ধুয়ে মুছে গেছে। নিজের ভেতর আবদ্ধ হয়ে আছি একা।

এমন কি আমার অধিকাংশ অনুভূতিই লুপ্ত হয়েছে। দক্ষিণমেরুতে আসবার পর আমার স্বামী আর আগের মানুষ নেই। আগের মতোই তিনি আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন আর দরদ দিয়ে কথা বলেন। আমি বলতে পারতাম, সত্যিকারভাবে যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তাই বলেছেন তিনি। তবে আমি এ-ও জানি যে, অবকাশ যাপন কেন্দ্রের হোটেলে যে তুষার-মানবকে আমি দেখেছিলাম তিনি আর এখন সেই মানুষ নন।

এসব কথা তো এখন কাউকে বলতেও পারব না। দক্ষিণমেরুর সবাই তাকে পছন্দ করে। আমি যে- পৃথিবীর কথা বলেছি তারা সেটা বুঝতেই পারে না। মুখ থেকে সাদা তুষারের শ্বাস ছড়াতে ছড়াতে তারা ঠাট্টা-মস্করা করে, তর্কে মেতে ওঠে কিংবা নিজেদের ভাষায় গান গায়। আমি তখন একা বসে বাইরের ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি। যে- বিমানটিতে করে আমরা এখানে এসেছি সেটি চলে গেছে অনেক দিন আগে। আমার হৃদয়ের মতো রানওয়েটা বরফের নিচে ঢাকা পড়েছে।

“শীত এসে গেছে, একদিন বললেন আমার স্বামী, “এটা খুব লম্বা হবে, কোনো বিমান কিংবা জাহাজ পাওয়া যাবে না। সবকিছুইতো জমে বরফ হয়ে গেছে। আগামী বসন্তের

আগে মনে হয় এখান থেকে যেতে পারব না আমরা।”

দক্ষিণমেরুতে আসার তিনমাস পরে টের পেলাম আমি অন্তঃসত্ত্বা। জানি, যে বাচ্চাটার জন্ম হবে সে হবে তুষার-মানব। আমার গর্ভ জমে গেছে। আমি তা অনুভব করতে পারি। আমার সন্তান দেখতে হবে ওর বাবার মতো। চোখ হবে তুষারিকার মতো। আর আঙ্গুলগুলোতে জমে থাকবে তুষার। এই নতুন পরিবারটি কোনো দিনও দক্ষিণমেরুর বাইরে যেতে পারবে না। আমাদের অলৌকিক অতীত সব অনুমানের চেয়েও প্রচণ্ড ভারী, করায়ত্ত করে রাখবে আমাদেরকে। তাকে নাড়াতে পারব না কখনো।

এখন হৃদয় বলতে আমার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। উষ্ণতাও চলে গেছে অনেক দূরে। কখনো কখনো ভুলেই যাই এক সময় উষ্ণতা ছিল আমার মধ্যে। এখানে আমি পৃথিবীর সবচেয়ে নিঃসঙ্গ এক রমণী। আমি কাঁদলে তুষার-মানব আমার চিবুকে চুমু দেন আর তখন আমার চোখের পানি বরফে পরিণত হয়। আমার অশ্রুর বরফখণ্ড হাতে তুলে নিয়ে তিনি তার জিহ্বার ওপর রাখেন। বলেন, “দেখ আমি তোমাকে কত্তো ভালবাসি।” সত্যি কথাই বলেন তিনি; কিন্তু কোথা থেকে যেন তীব্র একটা বাতাস এসে তার সেই কথা উড়িয়ে নিয়ে যায়, সেই বাতাস আবার ফিরে যায় অতীতে।

নাম-চোর বানর

নাম-চোর বানর

ইদানীং নিজের নাম মনে রাখতে অসুবিধা হয় তার। অপ্রত্যাশিতভাবে যখন কেউ তার নাম জিজ্ঞেস করে বসে তখন সমস্যায় পড়ে সে। তখন একমাত্র ভরসা নিজের ড্রাইভিং লাইসেন্স। ওটি বের করে চটজলদি নিজের নাম বলে দিতে পারে। ব্যাপারটিতে স্বভাবতই প্রশ্নকারীর মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। টেলিফোনেও তাই ঘটে। কেউ নাম জিজ্ঞেস করলে ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য পার্স হাতড়াতে থাকে। টেলিফোনের অপর প্রান্তে যে থাকে, এই অকারণ নীরবতায় ক্রমাগত অবাক হতে থাকে।

নিজের নামটি ছাড়া অবশ্য অন্য সবকিছুই মনে রাখতে পারে সে। আশপাশের লোকজনের নামধাম ঠোঁটের আগায় থাকে সব সময়। নিজের ঠিকানা, ফোন নম্বর, জন্ম তারিখ এমনকি পাসপোর্ট নম্বর মনে রাখতেও কোনো সমস্যা হয় না তার। বন্ধুবান্ধব কিংবা ক্লায়েন্টদের ফোন নম্বর মনে রাখতে বেগ পেতে হয় না তাকে। তার স্মরণশক্তিও খুব ভাল।

বিয়ের আগে তার নাম ছিল ওজাওয়া। বিয়ের পরে হয়েছে মিজুকি আনদো। কোনোটিই আহামরি কিছু নয়, তারপরেও শত ব্যস্ততার ভেতর নাম কেন স্মৃতি থেকে উধাও হয়ে যায় কেউ বলতে পারে না।

তাকাশি আনদো নামের এক ভদ্রলোককে বিয়ে করে তিন বছর যাবৎ সে মিজুকি আনদো হিসেবে পরিচিত হয়ে আসছে। প্রথম প্রথম নামটির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারতো না। উচ্চারণও যথার্থ বলে মনে হত না তার কাছে, এখন শুনতে শুনতে আর সই করতে করতে অনেকটা ধাতস্থ হয়ে উঠেছে।

পার্স সঙ্গে থাকলে কোনো অসুবিধা হয় না; কিন্তু ওটা যদি হারিয়ে যায়, তখন কী হবে? সে-ও তো তাহলে হারিয়ে যাবে। ভরসা এই যে, একেবারে হারিয়ে যাবে।, কেননা নিজের ঠিকানা আর ফোন নম্বর মনে রাখতে পারে। তবে নাম ভুলে যাওয়ার বিষয়টি উদ্বেগজনক নিঃসন্দেহে। নামহীন জীবন হচ্ছে স্বপ্ন দেখে আর কোনো দিন ঘুম থেকে জেগে না ওঠার মতো একটা ব্যাপার।

একটা বুদ্ধি বের করল মিজুকি। সোনার দোকান থেকে একটা ব্রেসলেট কিনে এনে তার ওপর নিজের নামটি খোদাই করে নিল সে। নিজেকে তখন কুকুর বেড়ালের মতো মনে হলো তার। বাড়ি থেকে বেরুনোর আগে ওটা পরতে ভুলত না। এখন নিজের নাম মনে করতে না পারলে চট করে ব্রেসলেটের দিকে তাকায়, তড়িঘড়ি করে ড্রাইভিং লাইসেন্স বের করতে হয় না। লোকজনও অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকায় না।

সমস্যার ব্যাপারটি সে তার স্বামীকে জানায়নি। পাছে তার স্বামী না ভাবে ওর সঙ্গে বিয়ে হয়ে সুখী হতে পারেনি। অবশ্য ওর স্বামী সব ব্যাপারেই যুক্তি মেনে চলে। এই ব্যাপারটিকে হয়ত সে ক্ষতিকর একটা কিছু না-ও ভাবতে পারত। ভদ্রলোক খুব বেশি কথা বলে, একবার কোনো প্রসঙ্গের অবতারণা করলে সহজে থামতে চায় না। এ কারণে মিজুকি ব্যাপারটা নিজের মধ্যেই রেখেছে। বিবাহিত জীবনে অসুখী নয় সে। মাঝে মধ্যে স্বামীর বাড়াবাড়ি রকমের যুক্তিবাদিতা মোকাবিলা করতে হয় তাকে। এ ছাড়া আর কোনো অভিযোগ নেই তার।

মিজুকিরা সম্প্রতি সিনাগাওয়া এলাকায় নবনির্মিত একটা ভবনে ফ্ল্যাট কিনেছে।

মিজুকির স্বামীর বয়স ৩০। একটা ওষুধ কোম্পানির ল্যাবরেটরিতে কাজ করে সে। মিজুকির বয়স ২৬। সে কাজ করে হোন্ডা কোম্পানির ডিলারের দোকনে। ফোনটোন এলে ধরে, খদ্দেরদের জন্য কফি বানায়, ফটোকপি ও ফাঁইলিং করে আর ক্লায়েন্টদের ডাটাবেজ আপডেট রাখে। টোকিওর একটি জুনিয়র কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন করার পর ওর চাচা যিনি হোন্ডা কোম্পানির এক্সিকিউটিভ, তাকে চাকরিটা জোগাড় করে দেয়। আকর্ষণীয় চাকরি নয় বটে, তবে দায়দায়িত্ব আছে- সব মিলিয়ে তেমন একটা খারাপ লাগে না মিজুকির। কোনো সেলসম্যান বাইরে থাকলে সে নিজেই ক্রেতাদের সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দেয়। কথাবার্তায় খুব চটপটে সে। তার চমৎকার হাসি সবার মন কাড়ে, ক্রেতারা স্বচ্ছন্দ অনুভব করে। প্রতিটি ক্রেতার ব্যক্তিত্ব পর্যবেক্ষণ করে তার সঙ্গে কী ভাবে কথা বলতে হবে তা দ্রুত বুঝে উঠতে পারে। তবে বিজনেস ডিল বা দাম কমানো-বাড়ানোর ব্যাপারে কোনো হাত নেই তার। ক্রেতাকে জিনিস কিনতে রাজি করানোর পর্যায়ে নিয়ে কোনো সেলসম্যানের দ্বারস্থ হতে হয় তাকে, যে কমিশনের একটা ভাগ অনায়াসেই পকেটস্থ করে। তবে একেবারে খালি হাতে বিদায় করা হয় না তাকে, সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে ডিনারের আমন্ত্রণ পায়। আপ্যায়নের ব্যয় হওয়া টাকাটা কমিশন থেকে মেটানো হয়।

মাঝে মাঝে তার মনে হয় বিক্রির ক্ষমতা পেলে আরও অনেক বেশি বেচতে পারত সে। সে সৌভাগ্য কখনোই আসে না, কারণ কোম্পানি চলে তার নিজস্ব নিয়মে। বিক্রির কাজ করে সেলস ডিপার্টমেন্ট আর অন্য কাজ ক্লারিক্যাল বিভাগের কর্মীরা। এ সব নিয়ে খুব একটা ভাবে না মিজুকি, তেমন একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার নেই। নিয়ম মাফিক ন'টা-পাঁচটা অফিস করে, দরকার পড়লে ছুটি নেয়।

কর্মস্থলে সে বিয়ের আগের নামটিই ব্যবহার করে, কারণ কম্পিউটার সিস্টেমে পরিবর্তনের ঝামেলায় যেতে চায় না। ট্যাক্স সংক্রান্ত কারণে কাগজপত্রে বিবাহিত মহিলা হিসেবে দেখানো হলেও নামটা আছে আগেরই। কাজেই বিজনেস ও টাইম কার্ডে

তার নাম মিজুকি ওজাওয়া।

নাম ভুলে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে এক সময় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে মিজুকি। ভাবে, এটা কোনো রোগের পূর্বলক্ষণ হতে পারে। হয়ত আলঝেইমারের পূর্বাভাস। দুনিয়াটাতো এখন অপ্রত্যাশিত আর মারাত্মক সব রোগে ভরা। সে দেরি না করে বড় একটা হাসপাতালে চলে যায় আর নিজের অবস্থা ব্যাখ্যা করে। ওখানকার অল্পবয়সী ডাক্তার, যাকে খুব মলিন আর ফ্যাকাশে লাগে। ডাক্তারের চেয়ে তাকে বেশি মনে হয় রোগী বলে। মিজুকির সমস্যাটা পাত্তাই দিতে চান না।

"নিজের নাম ছাড়া কি অন্য কিছুও ভুলে যান?" জিজ্ঞেস করেন তিনি।

"না।"

"শুধু নামটাই ভুলে যান, তাই তো! হুম। মানসিক রোগের লক্ষণ বলে মনে। হচ্ছে।" ডাক্তারের কণ্ঠে আগ্রহ বা সহানুভূতির কোনো ছাপ নেই।

"নাম ছাড়া অন্যকিছু ভুলে গেলে আবার আসবেন। তখন কিছু পরীক্ষা করাতে হবে। আপনার চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর রোগী নিয়ে এখন ব্যস্ত আমরা।" ডাক্তারের সাফ জবাব।

একদিন স্থানীয় ওয়ার্ডের নিউজলেটার পড়ে মিজুকি জানতে পারল, ওয়ার্ড অফিসে নানা ধরনের রোগীর জন্য একটা পরামর্শ কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। মাসে দু'দিন খোলা থাকবে। আঠার আর তার চেয়ে বেশি বয়সের রোগীর জন্য কেন্দ্রটি উন্মুক্ত আর ওখানকার সব বিষয় গোপন রাখা হবে।

পরামর্শ কেন্দ্রে গিয়ে সুফল পাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করল সে। তবে সিদ্ধান্ত নিল একবার যাবে ওখানে।

পরামর্শ কেন্দ্রে গিয়ে মিজুকি বুঝল সে-ই ওখানকার একমাত্র রোগী। রিসেপশনিস্ট বলল, "হঠাৎ করেই চালু হয়েছে এটি। লোকজন এখনও ঠিক মতো জানে না এর খবর। জানার পরে ভিড় বেড়ে যাবে নির্ঘাত।"

পরামর্শদাত্রীর নাম চেতমুকো সাকাকি। হাসিখুশি, নাদুস-নুদুস সুন্দরী। বয়স চল্লিশের কোঠায়। ঠোঁটে লেগে আছে স্নিগ্ধ হাসি। ছোট করে ছাঁটা চুলগুলো তার বাদামি রঙের। ধূসর রঙের সামার স্যুট পরে আছেন। গলায় পরেছেন নকল মুক্তোর মালা। দেখে ডাক্তার বলে মনে হয় না- যেন পাশের বাড়ির হাস্যময়ী গৃহবধূ। আলাপ-পরিচয় করার ভঙ্গিমায় বললেন, "আমার স্বামী কাজ করেন ওয়ার্ডের দফতরে। গণপূর্ত বিভাগের প্রধান তিনি। তাদের আর্থিক সহায়তা নিয়েই এ কেন্দ্রটি দাঁড় করিয়েছি আমরা। আপনিই আমাদের প্রথম রোগী, আপনাকে পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত। আজ আর কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই আমার, কাজেই আসুন মন' খুলে কথা বলি।"

"আপনার সঙ্গে কথা বলে আমারও খুব ভাল লাগছে।" তবে সে মনে মনে ভাবল, এ ধরনের মানুষ আমার জন্য কতটা করতে পারবেন কে জানে।

"পরামর্শ দান বিষয়ে ডিগ্রি আছে আমার। এ কাজে আমার অভিজ্ঞতা বিস্তর।" মিজুকির মনের কথা যেন পড়তে পেরেছেন এমন ভঙ্গিমায় বললেন মহিলা। খুব মন। দিয়ে মিজুকির কথা শুনতে লাগলেন তিনি। তার মুখ ভঙ্গিতে কোনো পরিবর্তন নেই। ঠোঁটে লেগে আছে বসন্ত-রাতের চাঁদের মতো মৃদু হাসি।

মিজুকির কথা শেষ হতেই বললেন, "ব্রেসলেটে নাম লিখে রাখার আইডিয়াটা চমৎকার। যেভাবে বিষয়টা আপনি মোকাবিলা করেছেন তা পছন্দ হয়েছে আমার।

"আমাদের প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে বাস্তব একটা সমাধান খুঁজে বের করা, যাতে অসুবিধা কমিয়ে আনা যায়। আপনি যথেষ্ট চালাক চতুর। আপনার ব্রেসলেটটাও সুন্দর। হাতে

বেশ মানিয়েছে।”

মিজুকি বলল, “নাম ভুলে যাওয়ার সাথে গুরুতর কোনো রোগের সম্পর্ক আছে। কি? এ রকম কোনো কেস কি আগে পেয়েছেন?”

“আমার মনে হয় না এটা কোনো রোগের পূর্বলক্ষণ।” বললেন মিসেস সাকাকি, “এটা কোনো ধরনের বিস্মৃতি হতে পারে। এখন আমাদের দেখতে হবে ব্যাপারটার সূত্রপাত কীভাবে হয়েছিল।”

এরপর মিসেস সাকাকি তাকে মৌলিক কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। এই যেমন, কতদিন যাবৎ তার বিয়ে হয়েছে। সে কী কাজ করে। তার স্বাস্থ্য কেমন ইত্যাদি।

তিনি ওর বাল্যকাল, পরিবার, স্কুল জীবন, ভাললাগা-মন্দলাগা ইত্যাদি বিষয়েও প্রশ্ন করলেন। মিজুকি সাধুতার সাথে ও যথাসম্ভব কম সময়ে সব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করল।

মিজুকির জন্ম একটি সাধারণ পরিবারে। ওর বাবা বড় একটা বীমা কোম্পানিতে, চাকরি করতেন। বাবা ছিলেন সিরিয়াস প্রকৃতির মানুষ। মা নরম প্রকৃতির মানুষ হলেও লোকজনের খুঁত ধরার স্বভাব ছিল তার। ওর বড় বোন ক্লাসে সব সময় ফাস্ট হতো। তারপরও মিজুকির মনে হতো ওর বোনের মাথা কিঞ্চিৎ মোটা। আবার ছিঁচকে চুরির অভ্যাসও ছিল তার। তবে পরিবারের কাউকে নিয়ে ওর বিশেষ কোনো সমস্যা ছিল না। তাদের কারও সাথে ঝগড়া ঝাটিও হতো না। তবে সবকিছুতে হার স্বীকার করার মতো মেয়ে সে নয়। রোগ বালাইও তেমন একটা তার হতো না। সুন্দরী বলে পরিচিত ছিল তার। তবে নিজেকে সে যথেষ্ট বুদ্ধিমতি বলে মনে করত। স্কুলে ভাল ক’জন বান্ধবীও ছিল। অধিকাংশই এখন বিবাহিত ও নানা শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাদের কারও সঙ্গে এখন তেমন একটা যোগাযোগ নেই।

বিয়ের ব্যাপারেও খুব একটা মন্দ কিছু বলবার নেই তার। নব পরিণীতারা যে ধরনের ভুলটুল করে প্রথম দিকে সে-ও তাই করেছে। তবে আস্তে আস্তে শুধরে নিয়েছে। এখন তারা সুখে শান্তিতে বসবাস করছে। ওর স্বামী ভদ্রলোকটিকে পূর্ণাঙ্গ ভাল লোক বলা যাবে না, তবে তার ভেতর অনেক সৎ গুণাবলী আছে। সে দয়ালু, দায়িত্বশীল, পরিচ্ছন্ন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোনো বাছবিচার নেই। সহকর্মী ও কর্তাদের সাথে সুসম্পর্ক আছে তার।

মিজুকি জানে রোগীর সবকিছু মনোযোগ দিয়ে শোনা পরামর্শ দানকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য। তবুও তার জীবনের একঘেঁয়ে সব কাহিনী পরম ধৈর্যের সঙ্গে এই মহিলাকে শুনতে হচ্ছিল বলে তার জন্য ওর মায়া হলো। মিজুকি ভাবল, ওকে যদি এসব শুনতে হতো, নির্ঘাত বিরক্ত হতো সে।

মিসেস সাকাকি মন দিয়ে সবকিছু শুনলেন। কিছু কিছু নোটও নিলেন। যখন কথা বললেন, কণ্ঠস্বরে ছিল না কোনো বিরক্তির ছাপ। বরং রোগীদের জন্য ছিল উষ্ণতা আর যথার্থ উদ্বেগ। তার ভেতর আশ্চর্য রকমের ধীরতা লক্ষ্য করল মিজুকি। তার মতো এ রকম ধৈর্য সহকারে মিজুকির কথা আগে কেউ শোনেনি। ঘন্টাখানেক পর যখন ওই সাক্ষাৎকার শেষ হলো, মিজুকি অনুভব করল তার মাথা থেকে ভারী একটা বোঝা নেমে গেছে। সবশেষে মিসেস সাকাকি মস্তো একটা হাসি দিয়ে বললেন, “আগামী বুধবার একই সময়ে আসতে পারবেন তো মিসেস আনদো?” মিজুকি বলল, “আপনার কোনো অসুবিধা না থাকলে অবশ্যই পারব।”

.

সাক্ষাৎকারের জন্য দ্বিতীয়বার এলে মিসেস সাকাকি তাকে বললেন, “নাম নিয়ে ঘটেছে অতীতের এ রকম কোনো ঘটনার কথা বলতে পারেন আমাকে? এই যেমন আপনার নিজের নাম, অন্য কারও নাম, জায়গার নাম বা পোষা কোনো জন্তু জানোয়ারের নাম,

কিংবা এসব নিয়ে কোনো স্মৃতি? একবার মনে করবার চেষ্টা করুন না।”

“এমন কোনো স্মৃতি মনে আসছে না এই মুহূর্তে। ও, দাঁড়ান একটু...হ্যাঁ, মনে পড়েছে নামের ট্যাগের ব্যাপারে একটা স্মৃতি আছে আমার।”

“খুব ভাল কথা, বলুন আমাকে।”

“তবে ওটা আমার নামের ট্যাগ ছিল না, ছিল অন্য একজনের।”

“তাতে কিছু যায় না আসে না, ঘটনাটা বলুন।” মিসেস সাকাকি বললেন।

“আমি নাগোইয়ার মেয়ে হলেও পড়তাম ইয়াকোহোমার একটা স্কুলে। থাকতাম স্কুলের ডরমেটরিতে। উইকএন্ডে বাড়িতে যেতাম। রোববার রাতে স্কুলে ফিরতাম ট্রেনে করে।”

“নাগোইয়াতে ভাল স্কুল ছিল না? দূরের শহর ইয়াকোহোমাতে পড়তে গেলেন কেন?”

“আমার মা পড়তেন ওই স্কুলে। তিনি চেয়েছিলেন তার একটি মেয়ে ওখানে পড়ুক। ভেবেছিলাম ভালই হবে। বাবা-মার কাছ থেকে দূরে থাকা যাবে। মিশনারিদের স্কুল হলেও যথেষ্ট উদার ছিল তারা। ওখানে বেশ ক’জন ভাল বন্ধু জুটে ছিল আমার। ওরা সবাই ছিল আমারই মতো। ছ’বছর পড়েছিলাম ওখানে। অনেক আনন্দে কেটেছে স্কুলের ওই দিনগুলো। তবে ওখানকার খাবার-দাবার ছিল খুব বাজে।”

মিসেস সাকাকি হাসলেন। বললেন, “আপনি বলেছিলেন আপনার একটা বড় বোন ছিল।”

“হ্যাঁ। সে আমার চেয়ে দু’ বছরের বড় ছিল।”

“সে কেন ওই স্কুলে পড়েনি?”

“খুব ঘরকুনো ছিল সে। তাছাড়া স্বাস্থ্যগত কিছু সমস্যা ছিল তার। স্থানীয় একটা স্কুলে পড়ত। বাড়িতেই থাকত। ওর চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীনতা আমি ভোগ করেছি। এলিমেন্টারি স্কুল থেকে গ্রাজুয়েশন করার পর বাবা-মা যখন জিজ্ঞেস করলেন, “ইয়াকোহামায় পড়তে যাবি?” আমি এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম। প্রতি সপ্তাহান্তে শিনকাশেন ট্রেনে চড়াটা ছিল খুবই একসাইটিং একটা ব্যাপার।

“অধিকাংশ সময়-ই একজন রুমমেটের সঙ্গে থাকতে হয়েছে আমাকে। সিনিয়রিটি অর্জন করার পর আলাদা রুম পাই। আমাদের ডরমেটরির ছাত্রী-প্রতিনিধি ছিলাম আমি। ডরমেটরির প্রতিটি ছাত্রীরই নামের ট্যাগ ছিল। ভবনে ঢোকার পথে একটা বোর্ডে ঝোলান থাকত ওগুলো। ট্যাগের সামনের দিকে কালো কালিতে নাম লেখা থাকত, পেছন দিকটা হতো লাল। কখনো বাইরে গেলে ট্যাগটি উল্টো করে রেখে যেতে হতো। ফিরে এলে সোজা করা হতো। কালো দিকটা সামনে থাকলে বোঝা যেত ছাত্রীটি রুমে আছে, আর লাল দিক দেখা গেলে ধরে নিতে হতো সে এখন বাইরে। কেউ বাইরে রাত যাপন করলে কিংবা ছুটি নিলে নামের ট্যাগ বোর্ড থেকে খুলে নিতে হতো। ওটাই ছিল নিয়ম।

“সে যা-ই হোক, ব্যাপারটা ঘটে অক্টোবর মাসে। এক রাতে ডিনারের আগে : রুমে ছিলাম আমি। হোম ওয়ার্ক করছিলাম বসে বসে। তখন জুনিয়র একটা মেয়ে এল আমার কাছে। ওর নাম য়ুকো মাতসুনাকা। সে-ই ছিল ওই ডরমেটরির সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে। নরম কোমল ত্বক, দীর্ঘকেশ আর পুতুলের মতো ছোটখাট শরীরের অধিকারী ছিল সে। ধনাঢ্য পরিবারের মেয়ে। আমাদের ক্লাসে পড়ত না সে। যতদূর জানতাম ওর রেজাল্ট ছিল খুব ভাল। অনেক যুবকই পছন্দ করত তাকে। শুধু পছন্দ করত বললে ভুল হবে, রীতিমতো পূজো করত। মাতসুনাকা অহংকারী ছিল না, সবার সঙ্গেই ওর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। সব সময় চুপচাপ থাকত। নিজের অনুভূতির কথা কারও কাছে প্রকাশ করত না। তার মনে কী ছিল জানা ছিল না। আমার; যুবতী মেয়েরাও তার

সান্নিধ্য কামনা করত। তবে আমার ধারণা তার। কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল না।”

মিজুকি ডরমেটরির দরজা খুলতেই দেখেছিল মাতসুনাকা দাঁড়িয়ে আছে। পরনে টাইট সোয়েটার ও জিন্স। বলেছিল, “একটা মিনিট কথা বলতে চাই আপনার সঙ্গে।” মিজুকি অবাক হয়ে বলেছিল, “অবশ্যই।”

“আচ্ছা মিজুকি আপনি কি কখনো কারো প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়েছেন?”

“আমার মনে হয় না।”

“একবারও না?”

মিজুকি মাথা নাড়িয়ে বলল, “হঠাৎ করে এমন কথা জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয়া কঠিন, তবে আমার ধারণা কখনো কারো প্রতি ঈর্ষান্বিত হইনি। কী ধরনের ঈর্ষার কথা বলছ তুমি?”

“এই ধরুন আপনি কাউকে ভালবাসেন; কিন্তু সে ভালবাসে অন্য কাউকে। আপনি কাউকে ভীষণভাবে কামনা করেন, কিন্তু অন্য কেউ হয়ত তা গ্রাস করে ফেলেছে। আপনি কিছু একটা করতে বদ্ধপরিকর, কিন্তু অন্য কেউ কোনো রকম চেষ্টা ছাড়াই বড় ধরনের সাফল্য পেয়ে যাচ্ছে- এই রকম আর কি ব্যাপারটা....”

“না আমার বেলায় এ ধরনের কিছু ঘটেনি। তোমার ঘটেছে নাকি?” কী বলবে ভেবে পায়নি মিজুকি। এ ধরনের একটা মেয়ের কী-ই বা প্রত্যাশা থাকতে পারে। দেখতে সুন্দরী। বিত্তশালী পরিবারের মেয়ে। পড়াশোনায় ভাল। সবাই ওকে চেনে। ওর প্রতি বাবা-মার অসীম ভালবাসা। মিজুকি শুনেছে, সে নাকি এক কলেজ ছাত্রের সঙ্গে ডেটিং করে। এরকম যার অবস্থা সে কার প্রতি ঈর্ষান্বিত হবে? তবুও মিজুকি ওকে জিজ্ঞেস করল, “তোমার বেলায় কখন কীভাবে ঈর্ষার ব্যাপারটা এসেছে আমাকে বুঝিয়ে বল।”

“থাক, এত গভীরে যেতে চাইনে, কী হবে আর! ঈর্ষা ব্যাপারটি যে কী, যে কখনো তা অনুভব করেনি তাকে বোঝান খুব কঠিন। তবে একটি জিনিস ভাল করে বুঝি, ঈর্ষা নিয়ে জীবনযাপন করাটা সহজ ব্যাপার নয়। দিনের পর দিন নিজের ভেতর নরক বয়ে বেড়ানোর মতো একটা বিষয়।... ভাগ্যিস এ রকম কিছু আপনার জীবনে নেই।”

কথা শেষ করে হাসল মাতসুনাকা। সত্যিই সে খুব সুন্দরী। ভাবল মিজুকি। কিন্তু ওর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হতে পারল না একটিবারও।

“আমাকে বাড়ি যেতে হবে একবার। আমার এক আত্মীয় মারা গেছে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে হবে। এর মধ্যেই আমি কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েছি। সোমবার সকালের মধ্যে ফিরব। আমার নামের ট্যাগটা আপনার জিম্মায় রেখে যেতে চাই, যদি অনুমতি...”

“কোনো আপত্তি নেই আমার। কিন্তু আমাকে কেন দিয়ে যাচ্ছ ওটা। একটা ড্রয়ারের ভেতর রেখে গেলেই তো হয়।” ট্যাগটা আমার হাতে দিয়ে বলল, “শুধু একটিবারের জন্য ওটা রাখতে চাই আপনার কছে। একটা ব্যাপারে আমি বিব্রত; কাজেই আমার রুমে এটা রাখতে চাইনে।”

“ঠিক আছে।”

“আমি চাই না আমি চলে যাওয়ার পর বানর এটা নিয়ে যাক।”

“আমার তো মনে হয় বানর-টানরের অস্তিত্ব এখানে নেই।” দৃঢ়তার সাথে বলল মিজুকি।

না-ছোঁয়া এক কাপ চা, নামের ট্যাগ, যেখানে সে বসেছিল সেখানকার সেই খালি জায়গা পেছনে ফেলে মাতসুনাকা বিদায় নিল।

“সোমবার দিন মাতসুনাকা ডরমেটরিতে ফিরে আসেনি।”

মিসেস সাকাকিকে বলল মিজুকি, “ওর ক্লাশের শিক্ষক চিন্তিত হয়ে পড়েন আর ওর অভিভাবকদের ফোন করেন। তখন জানা যায়, সে বাড়িতে যায়নি বা ওদের পরিবারের কেউ মারা যায়নি। কোনো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও হয়নি। মিথ্যে বলেছে সে।

“সপ্তাহখানেক পরে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। নাগোইয়া থেকে পরের রোববার ডরমেটরিতে ফিরে এসে সব জানতে পারি। সে ওর কব্জির রগ কেটে ফেলেছিল বনের মধ্যে গিয়ে। এই কাণ্ড সে কেন করেছে কেউ জানে না। কোনো নোটও রেখে যায়নি। তার রুমমেট জানিয়েছিল, বরাবরই ওরকম ছিল সে। কাউকে কিছু না জানিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে।”

মিসেস সাকাকি বললেন, “কিন্তু সে যখন আপনার রুমে আসে তখন কিছু বলার চেষ্টা করেনি? ওই যে ঈর্ষা নিয়ে কী যেন বলেছিল তখন আপনাকে?”

“হ্যাঁ, ঈর্ষা নিয়ে অনেক কথাই সে বলেছিল; কিন্তু তখন তো আমি ভাল করে বুঝিনি। পরে আমার মনে হয়েছে, মৃত্যুর আগে অবশ্যই সে কাউকে সবকিছু জানিয়ে যেতে চেয়েছিল।”

“সে যে আপনার কাছে এসেছিল তা কাউকে বলেছিল কি?”

“না।”

“কিন্তু কেন?”

মিজুকি তার মাথাটা তুলল, একটু ভাবল তারপরে বলল, “এ বিষয়ে কাউকে কিছু বললে হয়ত আরও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতো। মনে হয় না লোকজন বুঝত এ সব।”

“অর্থাৎ আপনার ধারণা ঈর্ষা এই আত্মহত্যার কারণ হতে পারে।”

“ঠিক তাই। পৃথিবীতে এমন কে আছে যে মাতসুনাকার মতো মেয়েকে ঈর্ষা করতে পারে? তখন সবাই এতো বেশি মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে ছিল যে, আমার মনে হয়েছিল সবকিছু নিজের মধ্যে রাখাই শ্রেয়। ডরমেটরির মেয়েদের অবস্থা কেমন হয়েছিল ভাবুন একবার। সেই সময় এ সব কথা বলা মানে গ্যাস ভর্তি ঘরে ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়ে দেয়া, তাই না?”

“নামের ট্যাগের কী অবস্থা হয়েছিল?”

“ওটি আমার কাছেই আছে। নিজেরটার সঙ্গে একটা বাক্সে ভরে ক্লোসেটে রেখে দিয়েছি।”

“এখনও ওটা রেখেছেন কেন?”

“ব্যাপারটা নিয়ে এত হৈচৈ হয়েছে যে, ওটা ফেরৎ দেয়ার সুযোগই পাইনি। সুযোগের জন্য যত অপেক্ষা করেছি ততই ফেরৎ দেওয়ার বিষয়টি কঠিন হয়ে পড়ে আমার জন্য। ফেলেও দিতে পারিনি জিনিসটা। কখনো কখনো আমার মনে হয়েছে, মাতসুনাকা হয়ত চেয়েছিল ওটা আমার কাছেই থাক। কেন যে সে আমাকে বেছে নিয়েছিল জানিনে।”

বাসায় ফিরে ক্লোসেটের ভেতরে রাখা বাক্সটা বের করল মিজুকি। এই বাক্সেই রাখা আছে তার যাবতীয় স্মৃতিচিহ্ন- চিঠিপত্র, ডাইরি, ছবি, রিপোর্ট কার্ড আর তার ও মাতসুনাকার ট্যাগ। একটা খামের ভেতরে রেখেছে ট্যাগ দু’টো।

বাক্সটা বের করল; কিন্তু ট্যাগের খামটা সেখানে খুঁজে পেল না। বাসা বদল করে যখন এই ফ্ল্যাটে এসে ওঠে, মিজুকির স্পষ্ট মনে আছে খামটি তখনও এখানেই ছিল। কিন্তু গেল কোথায় ওটা?

পরামর্শ গ্রহণের ব্যাপারটা স্বামীর কাছে গোপন রেখেছে মিজুকি। সবকিছু বিবেচনা করে তার মনে হয়েছে বিষয়টা তাকে না বলাই ভালো। কারণ তার স্বামী ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ না-ও করতে পারে।

নামের ট্যাগ খোয়া যাওয়ার ব্যাপারটাও গোপন রাখল। ভাবল, পরামর্শ গ্রহণের সাথে এর সম্পর্ক নেই কোনো। মিসেস সাকাকিকে না জানালেও চলবে।

এমনি করে দু'মাস কেটে গেল। মিজুকি প্রতি বুধবার পরামর্শ নিতে মিসেস সাকাকির কাছে যায়। ওখানে রোগীর সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। ওর জন্য বরাদ্দকৃত সময়সীমা এক ঘন্টা থেকে কমিয়ে আধা ঘন্টা করা হয়েছে। মিজুকির মনে হয়, আরো বেশি সময় ধরে আলাপ করতে পারলে ভাল হতো; কিন্তু এত কম। ফিসে এর চেয়ে বেশি সময় প্রত্যাশা করে কী করে?

সে দিন সাক্ষাৎকার শেষ হওয়ার মিনিট পাঁচেক আগে মিসেস সাকাকি বললেন, "এটা আমাদের কাউন্সেলিংয়ের নবম অধিবেশন। এখন তো আপনি আগের মতো নিজের নাম ভুলে যান না। সব কিছু এখন আগের চেয়ে ভাল, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"খুব ভাল। আগামী সপ্তাহে হয়ত অবস্থার আরো উন্নতি হবে।"

"তার মানে নাম ভুলে যাওয়ার বিষয়ে...?"

"ঠিক তাই। পরিকল্পনা মাফিক সবকিছু এগুলে আপনার সমস্যার সুনির্দিষ্ট কারণ জানাতে সক্ষম হবো আর তা আপনাকে দেখাতেও পারব।"

"নাম ভুলে যাওয়ার কারণটাতো জানাবেন?"

“সংক্ষেপে বলতে গেলে তাই।”

কী ঘটতে যাচ্ছে ধরতে পারল না মিজুকি। বলল, “সুনির্দিষ্ট কারণটা আমাকে কখন জানাবেন... আপনি বলতে চান এটা এমন একটা কিছু যা দেখা যায়?”

আত্মসন্তুষ্টিতে নিজের হাত দুটো কচলে মিসেস সাকাকি বললেন, “আগামী সপ্তাহের আগে বিস্তারিত বলা যাবে না। এখনো বুঝতে পারছি না এটা কাজ করবে কিনা। আমার অবশ্য ধারণা কাজ করবে।”

পরের সপ্তাহে মিজুকি মিসেস সাকাকির রুমে ঢুকতেই তিনি বিশাল একটা হাসি দিয়ে তাকে স্বাগত জানালেন। এ রকম হাসি তার মুখে আগে কখনো দেখা যায়নি।

“কী কারণে আপনি নিজের নাম ভুলে যাচ্ছেন খুঁজে পেয়েছি। এর একটা সমাধানও বের করেছি।”

“তার মানে আর নিজের নাম ভুলে যাব না?”

“ঠিক তাই। আপনি আর নিজের নাম ভুলে যাবেন না।”

কালো একটা ব্যাগ থেকে কিছু জিনিস বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন মিসেস সাকাকি। বললেন, “আমার বিশ্বাস এই জিনিসগুলো আপনার।”

মিজুকি সোফা থেকে উঠে টেবিলের কাছে গিয়ে দেখল দু’টি নামের ট্যাগ একটি ওর নিজের অন্যটি মাতসুনাকার। ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে পড়ল। সোফায় গিয়ে নির্বাক বসে রইল সে। দু’হাত দিয়ে মুখ ঢাকল।

“আপনার অবাক হবারই কথা। তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।” বললেন মিসেস সাকাকি।

“কিন্তু আপনি কি করে...”

“নামের ট্যাগগুলো পেলাম?” মিজুকি মাথা নাড়াল।

“আপনার কাছ থেকেই উদ্ধার করা হয়েছে,” বললেন তিনি, “এই ট্যাগগুলো চুরি যাওয়াতেই নিজের নাম ভুলে যাচ্ছিলেন আপনি।”

“কিন্তু ওগুলো চুরি করল কে?”

“বরং জিজ্ঞেস করা উচিত ওই চুরির জন্যে কে দায়ী? কিংবা কী কারণে আপনার বাসা থেকে ওগুলো চুরি করা হয়েছে।”

মিজুকি অবাক হয়ে বলল, “কে করেছে? তার নামটা বলবেন আমাকে?”

“অবশ্যই বলব। আমরা তাকে আটক করেছি। নামের ট্যাগ দুটো তার কাছ থেকেই উদ্ধার করা হয়েছে। তবে আমি তাকে পাকড়াও করিনি। কাজটা করেছেন আমার স্বামী ও তার এক সহকর্মী। মনে আছে, আমি আপনাকে বলেছিলাম আমার স্বামী গণপূর্ত বিভাগের প্রধান। তাহলে চলুন সত্যিকার অপরাধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যাক। আপনার মনোভাব সামনা সামনি জানাতে পারবেন ওকে।”

মিসেস সাকাকির পেছনে পেছনে গেল মিজুকি। এলিভেটরে বেসমেন্টে নেমে এল, তারপর অনেকটা ফাঁকা করিডোর অতিক্রম করে একটি দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ভেতরে ঢুকে তারা লম্বা শীর্ণ পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সের এক ভদ্রলোক আর বিশোর্ধ্ব মোটাসোটা আর এক ব্যক্তির দেখা পেল। দু’জনের পরনেই হালকা খাকি রঙের পোশাক। বয়স্ক ভদ্রলোকের বুকে লাগান নামের ট্যাগ ‘সাকাকি’। অল্প বয়স্ক লোকটার নামের ট্যাগে লেখা ‘সাকুরান্দা।

“আমার অনুমান আপনি মিসেস আনদো,” মি. সাকাকি বললেন, “আমার নাম ইওশিও সাকাকি, তেতসুকোর স্বামী, আর ইনি মি. সাকুরান্দা আমার সঙ্গে কাজ করেন।”

“আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম।”

মিসেস সাকাকি তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন- ও কি তোমাদের খুব বিরক্ত করেছে?

“না, আমার মনে হয় পরিস্থিতির ওপর নিজেকে সমর্পণ করেছে সে। সাকুরান্দা সারা সকাল ওর ওপর নজর রেখেছে। চল আমরা এগুই।”

তারা একটা স্টোররুমে গিয়ে ঢুকল। একটি মাত্র চেয়ার পাতা ঘরটাতে, যার ওপর একটা বানর বসে আছে। সাধারণ বানরদের চেয়ে এর আকৃতি অনেক বড়; তবে মানুষের চেয়ে ছোট। প্রাইমারি স্কুলের শিশু-ছাত্রদের মতো। সাধারণ বানরদের চেয়ে গায়ের লোম বড়। বয়স বলা কঠিন; তবে নিশ্চিত করে বলা যায়, তরুণ বা যুবক বয়সের নয় সে। বানরটার হাত-পা চেয়ারের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা। লম্বা লেজটা মেঝের ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে। মিজুকি ঘরে ঢুকতেই তার দিকে তাকাল আর মেঝেতে নামতে চাইল।

মিজুকি আশ্চর্য হয়ে বলল, “এতো একটা বানর!”

“ঠিক তাই। একটা বানরই আপনার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে নামের ট্যাগ চুরি করেছিল আর তখন থেকেই আপনি নিজের নাম ভুলে যাচ্ছিলেন।”

আমি চাই না কোনো বানর আমার নামের ট্যাগ চুরি করে নিয়ে যাক মাতসুনাকার এই কথাটা মনে পড়ে গেল মিজুকির। ভাবল, কথাটা নিছক ঠাট্টা ছিল না। সে তার শিরদাঁড়ার ভেতর শীতল স্পর্শ অনুভব করল।

“আমি খুবই দুঃখিত।” বানরটা বলল। গলার স্বর নিচু হলেও উদ্দীপনা ছিল তার ভেতর। মিজুকি অবাক হয়ে বলল, “কথাও বলতে পারে দেখছি।”

বানর বলল, “হ্যাঁ, কথা বলতে পারি। একটা বিষয়ে আপনার কাছে ক্ষমা চাইবার আছে- নামের ট্যাগ দুটো ছাড়া অন্য কিছু চুরি করার মতলব ছিল না আমার;— কিন্তু ভীষণ ক্ষুধার্ত থাকায় প্লেটে রাখা দুটো কলাও গলাধঃকরণ করতে হয়েছিল।”

ব্যাটার নার্ভ খুব শক্ত- এ কথা বলে মি. সুকুরান্দা কালো একটা লাঠি দিয়ে ওর হাতে কয়েকটা খোঁচা মারলেন। মি. সাকাকি তাকে নিরস্ত করে বললেন, “সব কিছু নিজে থেকেই স্বীকার করছে ও। এভাবে ওকে আঘাত করা উচিত হয়নি তোমার। একটা বানর এমন করে আটকে রেখেছি এ কথা জানাজানি হয়ে গেলে বিপদ হবে।”

মিজুকি বলল, “নামের ট্যাগ চুরি করতে গেলে কেন তুমি?”

“সব সময়ই এই কাজ করি। বানর মানুষের নাম চুরি করে এক ধরনের রোগ বলতে পারেন। অবশ্য সব নাম করি না, কেবল যেটা পছন্দ হয় সেটা করি। জানি কাজটা ঠিক নয়; কিন্তু কি করব বলুন নিজেকে সামলাতে পারি না।”

“আমাদের ডরমেটরিতে ঢুকে মাতসুনাকার ট্যাগ চুরির চেষ্টা করেছিলে?”

“হ্যাঁ। মিস মাতসুনাকার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। এর আগে কারও প্রতি এত আকৃষ্ট হইনি। ভাবলাম জীবনে তো তাকে পাওয়া সম্ভব নয়, তার নামটাই না হয় আমার হোক। তার নামটা গ্রহণ করতে পারলে আমার ভেতর একটা সন্তুষ্টি আসত, কিন্তু আমার পরিকল্পনা কার্যকর হওয়ার আগেই সে এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যায়...।”

“আত্মহত্যার পথ থেকে তাকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কিছু করার ছিল না তোমার?”

“না, কিছুই করার ছিল না,” বলল বানর, “ভেতরের অন্ধকার তাকে গ্রাস করেছিল।”

“ওর ট্যাগটা যে আমার কাছে আছে তা জানলে কি করে?”

“ওটার সন্ধান পেতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। ওর মৃত্যুর পর বুলেটিন বোর্ড থেকে ওটা পাওয়ার চেষ্টা নেই, কিন্তু ততদিনে ওটা ওখানে ছিল না। ওটা কোথায় কেউ তা জানত না। খুঁজে বের করতে সাধ্যমতো চেষ্টা তদবির চালালাম। কিছুতেই ওটার সন্ধান পেলাম না। শেষে একদিন আমার মনে হলো, আপনি যখন ওর ঘনিষ্ঠ কেউ ছিলেন না, কাজেই আপনার কাছে সে ওটা রেখে যেতে পারে।”

মিজুকি বলল, “ধরেছ ঠিকই।”

“গেল বসন্তে আমার ভেতর একটা উদ্দীপনার জন্ম নিল। দেখাই যাক না আপনার কাছে ওটা পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু আপনাকে খুঁজে পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। এখন আপনার নাম হয়েছে মিজুকি আনদো। থাকেন মিনাগাওয়ার এক ফ্ল্যাটে।

“যা-ই হোক মওলা আলি বলে বেরিয়ে পড়লাম। তারপর খুঁজতে খুঁজতে একদিন অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে গেলাম।”

“কিন্তু ওর ট্যাগের সঙ্গে আমারটাও কেন নিয়েছিলে? জান, এ জন্যে আমাকে। কতো দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে।”

“আমি যারপরনাই দুঃখিত ম্যাডাম,” লজ্জায় মাথা নুইয়ে বানর বলল, “কোনো নাম পছন্দ করে সেটি না নেয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হই না। খুবই অস্বস্তিকর একটি ব্যাপার। কিন্তু আপনার নামটাও আমার ক্ষুদ্র হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। আগেই বলেছি, এটা আমার এক ধরনের অসুখ। বাসনার দ্বারা আক্রান্ত হই, নিজেকে সামলাতে পারি না। জানি, এটা ঠিক নয়; কিন্তু কেমন করে যে কি হয়ে যায় বলতে পারব না। আপনার সমস্যা

সৃষ্টি করার জন্যে করজোড়ে ক্ষমা চাই।”

সাকুরান্দা বলল, “তাকানাওয়া অঞ্চলের নিমপ্রান্তে এইসব বানরদের একটা গুপ্ত ঘটি আছে যেখানে বসে এরা গোটা টোকিও শহরে অভিযান চালায়।”

বানর বলল “এই নগরে বসবাসের কোনো জায়গাই আমাদের নেই। দিনের বেলা বিচরণের জন্য কয়েকটা মাত্র গাছ আছে, নেই কোনো ছায়াঘেরা স্থান। মাটিতে নামলে লোকজন আমাদের তাড়া করে, ধরতে আসে। বাচ্চারা এটা ওটা ছুঁড়ে দেয়। বিবি গান দিয়ে গুলি করে। কুকুর ধাওয়া করে আমাদের।

“টিভি ক্রুরা তীব্র আলো ফেলে আমাদের গায়। কাজেই মাটির নিচে আশ্রয় নেয়া ছাড়া উপায় থাকে না তখন।”

মিজুকি বলল, “এখন এই বানরটাকে আপনারা কী করবেন?” সাকুরান্দা বলল, “ওকে আর বাঁচতে দেয়া যায় না। ও যা-ই বলুক না কেন, এ ধরনের বদ অভ্যাস যখন একবার ওদের চরিত্রে বাসা বেঁধেছে তখন সারাজীবন ধরেই চলবে...”

“এখন এসব করতে যেও না, এনিম্যাল রাইট গ্রুপের কানে গেলে রক্ষা থাকবে না। শহরে কাক নিধন অভিযান চালানোর পর ওরা কী কাণ্ড করেছিল মনে নেই তোমার?” বললেন মি. সাকাকি।

বানরটা কাতর হয়ে বলল, “আপনাদের পায়ে পড়ি, দয়া করে জানে মারবেন না আমাকে। আমি যা করেছি তা সব ভুল। আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি। আপনাদের অনেক সমস্যা হয়েছে। তর্কে যাওয়ার কোনো সাহস আমার নেই, তবে আমার কার্যকলাপের কিছু ভাল ফলও আছে।”

মি. সাকাকি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, “মানুষের নাম চুরির মধ্যে আবার ভাল কী থাকতে

পারে হে?”

“মানুষের নাম চুরি করি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে ওই নামগুলোর সাথে যে নেতিবাচক উপাদান থাকে তা দূর হয়ে যায়। গর্ব করছি না, কিন্তু আমি যদি আগেই মাতসুনাকার নামের ট্যাগটা চুরি করতে পারতাম তাহলে হয়ত সে আত্মহননের পথ বেছে নিত না।”

মিজুকি বলল, “এ কথা কেন বলছ?”

“ওই নামটার সাথে আমি হয়ত তার মনের ভেতর জমে থাকা কালিমা অপসারণ করতে পারতাম।” বানর উত্তরে বলল।

সাকুরান্দা বলল, “তোমার একথা বাজারে বিকাবে না হে। জান যাওয়ার উপক্রম হয়েছে তো তাই নিজের সাফাই গাইছ।” মিসেস সাকাকি বললেন, “হতেও পারে। ওরও যুক্তি থাকতে পারে। যখন তুমি কারো নাম চুরি কর তখন তার ভালমন্দ দুটোই নিয়ে যাও।”

মিজুকি তখন বানরকে বলল, “আমার নামের সঙ্গে খারাপ কিছু আছে?”

বানর বলল, “এ সব না বলাই ভাল।”

“আহা বলই না। প্লিজ। আমার কথার জবাব দিলে ওদেরকে বলব তোমাকে মাফ করে দিতে।”

“সত্যিই জানতে চান? এ সব শুনলে ভীষণ আঘাত পাবেন আপনি।”

“বল তুমি, সবকিছু শুনতে আমি প্রস্তুত।”

“শুনুন তবে, আপনার মা আপনাকে একটুও ভালবাসেন না। আপনার জন্মের পর

কখনোই তিনি আপনাকে ভালবাসেননি, এক মিনিটের জন্যেও না। এর কারণ আমার জানা নেই, তবে কথাটা ঠিক।

“আপনার বড় বোনও পছন্দ করে না আপনাকে। আপনার হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য আপনার মা আপনাকে ইয়াকোহোমায় পাঠান। আপনাকে তিনি যতোটা সম্ভব দূরে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। আপনার বাবা অবশ্য খারাপ লোক ছিলেন না। তবে খুব ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষও বলা যায় না তাকে। তিনি আপনার পাশে দাঁড়াতে পারেননি। আর এ কারণেই বাল্যকাল থেকে স্নেহ-ভালবাসা আপনার কপালে জোটেনি। আপনি অবশ্য এ সব আঁচ করতে পারেন; কিন্তু ইচ্ছে করেই ও সব থেকে চোখ সরিয়ে রেখেছেন। এই সব বেদনাদায়ক বাস্তবতা আপনি আপনার হৃদয়ের গভীরে ছোট্ট একটা কুঠুরিতে লুকিয়ে রেখেছেন।

“যে কোনো নেতিবাচক অনুভূতি দমনের চেষ্টা করেন আপনি। এ সব প্রতিরক্ষামূলক মনোভঙ্গি আপনার সত্তার একটা অংশে পরিণত হয়েছে। এ সব কারণে কাউকে গভীরভাবে ভালবাসা সম্ভব হয়ে ওঠে না আপনার পক্ষে।”

মিজুকি নীরবে শুনতে থাকে সব কথা।

“আপনার বিবাহিত জীবন আপাতদৃষ্টিতে সমস্যামুক্ত। কিন্তু স্বামীকে সত্যিকার ভালবাসেন না। আমি ঠিক বলেছি কি? আপনার সন্তান হলে ওর বেলাতেও তা-ই হবে।”

চুপ করে রইল মিজুকি। চোখ বুজে ফেলল। মনে হলো তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। ত্বক, হাত-পা, নাক-মুখ, চোখ-কান আর হাড়গোড় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে যেন। নিজের নিশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর সে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না।

সাকুরান্দা বলল, “কী সব ভয়ঙ্কর কথা বলছে বানরটা। আমার অসহ্য লাগছে। স্যার

হুকুম করেন তো ব্যাটার ভবলীলা একেবারে সাঙ্গ করে দেই।”

মিজুকি বলল, “চুপ করুন তো আপনি। ও যা বলছে সবই সত্যি। অনেক দিন থেকেই সব জানি আমি। ইচ্ছে করেই চোখ-কান বন্ধ রেখেছি। মাফ করে দিন বানরটাকে। পাহাড়ের ওপরে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসুন। আপনাদের কাছে এই আমার অনুরোধ।”

মিসেস সাকাকি ওর কাঁধে হাত রেখে বললেন, “ওকে ছেড়ে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে? আপনি নিশ্চিত তো?”

“হ্যাঁ। নামটি ফেরৎ পেয়েছি এই আমার জন্য যথেষ্ট। সবকিছু মেনে নিয়েই জীবন কাটাতে হবে আমাকে। ওটা আমার-ই নাম, ওটাই আমার জীবন।”

বানরের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় মিজুকি মাতসুনাকার নামের ট্যাগ বানরের হাতে দিয়ে বলল, “যত্ন করে রাখবে এই নাম। আর কোনো দিন কারও নাম চুরি করবে না।”

“প্রতিজ্ঞা করছি সযত্নে সংরক্ষণ করব এই নাম আর ভবিষ্যতে কারো নাম চুরি করব না।” বানর বলল, তার চেহারায় ঐকান্তিকতার ছাপ।

“‘তুমি কি জানো মৃত্যুর আগে মাতসুনাকা কেন এই ট্যাগ আমার কাছে রেখে গিয়েছিল? কেন সে আমাকে বেছে নিয়েছিল?”

বানর বলল, “না ম্যাডাম। তবে এ কাজটি করেছিল বলেই আপনার সঙ্গে আমার দেখা হলো। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস বলতে পারেন।”

মিজুকি বলল, “হয়ত তোমার কথাই ঠিক।”

“আমার কথায় কি আঘাত পেয়েছেন?”

“তা-তো পেয়েছি-ই। খুব বড় ধরনের আঘাত।”

“আমি দুঃখিত; কিন্তু আমিতো বলতে চাইনি ম্যাডাম।”

“না না ঠিক আছে। আমি আগে থেকেই জানতাম সব। একদিন-না-একদিন আমাকে এ সবের মুখোমুখি হতেই হবে।”

“আপনার কথা শুনে শান্তি পেলাম।”

মিজুকি বলল, “তাহলে বিদায়। মনে হয় না আবার আমাদের দেখা হবে।” বানর বলল, “নিজের যত্ন নিতে ভুলবেন না। এই তুচ্ছ প্রাণীর জীবন রক্ষার জন্য ধন্যবাদ।”

সাকুরান্দা বলল, “মিনাগাওয়া এলাকায় তোমার চেহারা যেন আর দেখা না যায়। স্যারের কথায় তোমাকে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে; কিন্তু আবার ধরতে পারলে একেবারে জানে মেরে ফেলব, বুঝলে?”

.

বাড়ি ফিরে মিজুকি তার নামের ট্যাগ ও ব্রেসলেট খুলে একট বাদামি খামে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর ওটা কার্ডবোর্ডের বাক্সে রেখে ক্লোসেটের মধ্যে ভরে দিল।

শেষ পর্যন্ত নিজের নামটি ফিরে পেয়েছে মিজুকি। নতুন করে জীবন শুরু করতে চায় সে। হয়ত সব কিছু ঠিকঠাক চলবে, হয়ত চলবে না। কিন্তু নিজের নামটাতো ওর কাছে সংরক্ষিত আছে- যা শুধু ওর একার।

বেকারিতে দ্বিতীয়বার হামলা

বেকারিতে দ্বিতীয়বার হামলা

বেকারিতে হামলা করার ঘটনাটি স্ত্রীকে বলা ঠিক ছিল কিনা এখনও নিশ্চিত নই আমি। কিন্তু তখন হয়ত ঠিক-বেঠিকের প্রশ্নটিই ওঠেনি। এ বাবদে বলা যায়, ভুল পছন্দ যথার্থ ফল বয়ে আনতে পারে আবার এর ঠিক উল্টোটাও ঘটতে পারে। আমি অবশ্য নিজেই অবস্থান নির্ধারণ করি- আসলে আমরা কখনোই কিছু পছন্দ বা বাছাই করি না। ঘটনা ঘটে যায় অথবা ঘটে না।

ব্যাপারটা যদি এভাবে দেখেন, তাহলে বলতে হয় বেকারিতে হামলার ঘটনাটি বলার বিষয়টি ওভাবেই ঘটে গিয়েছিল। ওই ঘটনা প্রকাশ করে দেয়ার ব্যাপারে আমার কোনো পরিকল্পনা ছিল না... ব্যাপারটা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম...কিন্তু তা এইমাত্র আপনি যা বললেন এমন বিষয় ছিল না।

যে-কারণে বেকারিতে হামলার ঘটনাটি আমার মনে আছে তা হলো সহ্য করা কঠিন এমন প্রচণ্ড ক্ষুধা। ব্যাপারটা শুরু হয় রাত দুটো বাজার খানিকটা আগে। সন্ধ্যে ছ'টার দিকে রাতের খাবার খেয়েছিলাম। বিছানায় গিয়েছিলাম সাড়ে নটার সময়। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যে কোনো কারণেই হোক ঠিক সেই মুহূর্তেই আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। কয়েক মিনিট পর দ্য উইজার্ড অব দ্য ওজ- এর ঝড়ের মতো আকস্মিক তীব্র

বেদনার আঘাত আসে। প্রচণ্ড খিদে আমাদের গ্রাস করে ফেলে।

ফ্রিজে এমন কিছুই ছিল না যাকে সত্যিকারভাবে খাদ্য বলা যায়। থাকবার মধ্যে ছিল কয়েক বোতল ফরাসি তরল মশলা, ছয় ক্যান বিয়ার, গোটা দুয়েক পেঁয়াজ আর এক খণ্ড মাখন। মাত্র দু' সপ্তাহ আগে আমাদের বিয়ে হয়েছে। কী খাব-না-খাব এ বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তেমন সমঝোতাও গড়ে ওঠেনি এখনও।

সে সময় আমি চাকরি করতাম একটা ল'ফার্মে আর সে সেক্রেটারির কাজ করত একটা ডিজাইন স্কুলে। আমার বয়স তখন আটাশ কিংবা উনত্রিশ... কেন আমি আমার বিয়ের সঠিক বছর মনে করতে পারছি না? আমার স্ত্রী আমার চেয়ে দু' বছর আট মাসের ছোট। আমাদের মনের মধ্যে সর্বশেষ যে বস্তুটি ছিল তা হচ্ছে মুদিখানার জিনিস।

আমরা দুজনেই এতো ক্ষুধার্ত ছিলাম যে, ঘুমুতে যেতে পারছিলাম না। শুয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল। ক্ষুধার তাড়নায় দরকারি কোনো কাজকর্ম করাও সম্ভব হচ্ছিল

আমাদের পক্ষে। বিছানা থেকে নেমে আমরা রান্নাঘরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করতে লাগলাম। এ রকম প্রচণ্ড খিদের জ্বালা কেন হচ্ছে?

আমরা বার বার ফ্রিজ খুলতে লাগলাম। যতবারই খুলছিলাম ভেতরে ওই একই জিনিসের অস্তিত্ব টের পাচ্ছিলাম। বিয়ার, মাখন আর পেঁয়াজ। মাখন দিয়ে অবশ্য পেঁয়াজ ভাজা যায়, কিন্ত শুকিয়ে যাওয়া ওই দুটি পেঁয়াজ দিয়ে তো আর উদরপূর্তি সম্ভব নয়। পেঁয়াজ খেতে হয় অন্য খাবারের সঙ্গে। এ ধরনের খাবারে কারও ক্ষুন্নিবৃত্তি ঘটে না।

আমি বললাম, "চলো গাড়িতে করে সারারাত খোলা এ রকম একটা রেস্তোরাঁ খুঁজে বের করি। হাইওয়ের পাশে পাওয়া যেতে পারে।" আমার ওই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে সে বলল, "না না খাওয়ার জন্য এই মাঝ রাতের পর বাইরে বেরুব নাকি।" এ সব বাবদে

তাকে খুব প্রাচীনপন্থী বলে মনে হলো।

একটুখানি শ্বাস গ্রহণ করে আমি বলি, “আমারও তাই মনে হয়।”

আমার স্ত্রীকে যখন এ রকম একটা মত (কিংবা থিসিস) প্রকাশ করল আমার কানে তা কোনো গুপ্ত সংবাদ প্রকাশের অনুমোদন হিসেবে প্রতিধ্বনিত হলো। আমার তখন মনে হতে লাগল, এটা একটা বিশেষ ধরনের ক্ষুধা যা সারারাত খোলা থাকে এমন রেস্তোরাঁয় গিয়ে নিবৃত্ত করা সম্ভব নয়।

এক বিশেষ ধরনের ক্ষুধা। কী হতে পারে এটা? চলচ্চিত্রের চিত্রকল্পের মাধ্যমে যা প্রকাশ করা যেতে পারে? এক- আমি একটা ছোট্ট নৌকায় বসে আছি, শান্ত নিথর সমুদ্রে ভাসছে নৌকাটি। দুই- আমি পানির দিকে তাকিয়ে দেখি, একটি আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ সমুদ্রের তলদেশ থেকে ওপরে উঠে আসছে। তিন আগ্নেয়গিরির চূড়াটি পানির উপরিভাগের খুব কাছে, কত কাছে বলতে পারব না। চার- এটা ঘটছে কারণ, পানির অতিরিক্ত স্বচ্ছতা দূরত্বের ধারণাকে ব্যাহত করছে।

এটা হচ্ছে চিত্রকল্পের যথাযথ বর্ণনা, সারারাত খোলা থাকে এমন রেস্তোরাঁয় যেতে আমার স্ত্রীর অস্বীকৃতির দুই কিংবা তিন সেকেন্ডের মধ্যে আমার মাথায় এসেছিল।

আমরা শেষ পর্যন্ত একটা কাজই করেছিলাম তা হচ্ছে বিয়ারের ক্যান বের করেছিলাম। পেঁয়াজ ভক্ষণ করার চেয়ে ঢের ভাল এটা। আমার স্ত্রী বিয়ার তেমন একটা পছন্দ করে না বলে ওকে দুটি দিয়ে চারটি আমি নিলাম। আমি যখন বিয়ারে মগ্ন সে কাঠবিড়ালের মতো রান্নাঘরের শেভ তন্নতন্ন করে খুঁজে বাটারকুকির একটা প্যাকেট বের করল যার ভেতর চারটি কুকি পাওয়া গেল। ফেলে দেয়া জিনিসের মতো ছিল ওগুলো। নরম আর ভারী হয়ে গিয়েছিল অনেকদিন পড়ে থাকায়। তাতে কী, আমরা দুজনে দুটো করে দিব্যি গ্রাস করে ফেললাম।

কোনো কাজই হলো না। আমাদের উদর সিনাই উপত্যকার মতো শুকিয়ে কাঠ হয়েছিল ফলে ওই দুটো বাটারকুকি কোথায় তলিয়ে গেল টেরই পাওয়া গেল না।

"এতো খিদে আমার জীবনেও কোনো দিন লাগেনি," আমার স্ত্রী বলল, "বিয়ে হওয়ার সাথে এর কোনো সম্পর্ক আছে নাকি তাই ভাবছি।"

"থাকতে পারে।" আমি বললাম, "আবার না-ও থাকতে পারে।"

সে যখন আরও কিছু খাবারের সন্ধান করছিল আমি তখন আমার নৌকার কিনারায় ঝুঁকে পানির নিচে আগ্নেয়গিরির দিকে তাকালাম। নৌকার চারদিকে সমুদ্রের পানির স্বচ্ছতা আমার ভেতর এক অনির্ণীত অনুভূতির জন্ম দিল, যেন আমার নাভিকুণ্ডের পেছনে কোনো এক স্থানে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে–অদ্ভুতভাবে বন্ধ করে দেয়া একটা গুহা যার না আছে প্রবেশ পথ কিংবা বেরুবার রাস্তা।

তখন হঠাৎ করেই আমার মনের ভেতরে খেলে গেল, আগেও আমার এই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তখনও আমার উদর একেবারে শূন্য ছিল... কিন্তু কবে, কখন? হা হয়েছিল এমনটা, নির্ঘাত...

নিজেকে তখন আমি বলতে শুনলাম, "বেকারিতে হালমার সময়!"

"বেকারিতে হামলা? বলছ কী এসব?"

"হ্যাঁ ঠিকই বলছি। সে অনেকদিন আগের কথা। একদিন একটা বেকারিতে হামলা করেছিলাম। বেশি বড় ছিল না বেকারিটা। তেমন বিখ্যাত-ও নয়। ওদের রুটিগুলো বিশেষ ধরনের কিছু ছিল না। আবার একেবারে যে বাজে ছিল তা-ও না। দোকানগুলোর পাশের এলাকার একটা সাদামাটা বেকারি বলতে পার। সাধারণ একটা লোক বেকারিটা চালায়। নিজেই সবকিছু করে। সকালের দিকে রুটি বানায়, বেচাকেনা

হয়ে গেলে দোকান বন্ধ করে দেয়।”

“হামলাই যখন করবে তাহলে ওই বেকারিটাকে বেছে নিয়েছিলে কেন?”

“ভালকথা। একটা বড় বেকারিতে হামলা করার কোনো মানেই হয় না। আমাদের দরকার ছিল কয়েকটা রুটির টাকা-পয়সা নয়। আমরা ছিলাম হামলাকারি, ডাকাত নয়।”

“আমরা মানে? আমরা কারা?”

“আমার তখনকার এক বেস্ট ফ্রেন্ড। দশ বছর আগের ব্যাপার। তখন আমাদের অবস্থা এত খারাপ ছিল যে, টুথপেস্ট কেনার পয়সাও থাকত না হাতে। প্রয়োজনীয় খাবারও জোটাতে পারতাম না। খাবার জোগাড় করার জন্য যেসব জঘন্য কাজ আমাদেরকে করতে হয়েছে, বেকারিতে হামলা তার অন্যতম।”

আমার দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে আমার স্ত্রী বলল, “কোনো কাজকর্ম জোগাড় করে নিলে না কেন? স্কুলের পরে তো কাজ করার সুযোগ থাকে। বেকারিতে হামলার চেয়ে সহজ ছিল তা।”

“কাজ করার কোনো ইচ্ছে আদৌ আমাদের ছিল না।”

“বেশ। এখন তো দিব্যি কাজ করছ, কি করছ না?”

আমি মাথা নেড়ে আরও একটুখানি বিয়ার খেলাম। তারপর চোখ ঘষলাম। এক ধরণের বিয়ার-বিয়ার টাইপের কাদা আমার মস্তিষ্ক পিচ্ছিল ও কর্দমাক্ত করে তুলছিল আর তা ক্ষুধার ব্যথার সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছিল।

“সময় বদলায়, বদলায় মানুষ,” বললাম আমি, “চল শুয়ে পড়ি, কাল আবার সকালে

উঠতে হবে।”

“ঘুম আসছে না আমার। তোমার বেকারি হামলার গল্পটা শুনতে চাই।”

“বলবার মতো তেমন কিছু নেই। কোনো অ্যাকশন কিংবা উত্তেজনা কিছুই ছিল ওতে।”

“সফল ছিল তো হামলাটা?”

ঘুমানোর আশা ছেড়ে দিয়ে আরেকটা বিয়ারের ক্যান খুলোম। একবার কোনো গল্পে মজা পেলে তা না শুনে ছাড়েনা সে, এমনি স্বভাব তার।

“হ্যাঁ এক ধরনের সাফল্য তো ছিলই। আবার অসাফল্যও ছিল। আমরা যা চেয়েছিলাম পেয়েছিলাম তা। তবে হুমকি দিয়ে কাজ হাসিলের বিষয়টি মাঠে মারা যায়। ছিনিয়ে নেয়ার আগেই বেকারির মালিক আমাদের রুটি দিয়ে দেয়।”

“দাম না-নিয়ে দিয়েছিল?”

“ব্যাপারটা ঠিক ওরকম ছিল না। ওটাই গল্পের কঠিন দিক বুঝলে কিনা?”

বললাম আমি, “বেকারির মালিক ছিল ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতের একজন ভক্ত। আমরা যখন তার বেকারিতে ঢুকি সে তখন ভাগনারের একটি রেকর্ড শুনছিল। আমাদের সঙ্গে একটা চুক্তিতে এল সে তখন। আমরা যদি তার সঙ্গে ওই সঙ্গীত শ্রবণ করি তাহলে সে মুফতে আমাদের ইচ্ছেমতো রুটি নিতে দেবে। আমি আমার সঙ্গীর সঙ্গে শলা করে তার প্রস্তাবে সম্মতি জানাই। এতে কোনো পক্ষেরই কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। অতএব আমরা ছুরিটুরি লুকিয়ে ফেললাম। দু’জনে দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম আর টানহাউসার এবং ফ্লাইংডাচম্যান শীর্ষক দু’খানা যন্ত্র সঙ্গীত শ্রবণ করলাম।”

“তারপরেই রুটিগুলো পেয়ে গেলে?”

“ঠিক তাই। ব্যাগে যতগুলো ধরল নিয়ে বাড়ির পথে হাঁটা দিলাম। চার-পাঁচ দিন পেটপুরে খাওয়া হয়েছিল আমাদের।” আমি আর এক চুমুক বিয়ার পান করলাম। সমুদ্রের তলদেশ থেকে আসা ভূমিকম্পের নিঃশব্দ ঢেউয়ের মতো আমার নিদ্রালসা নৌকাটাকে দীর্ঘ ও মন্থর দোলা লাগাল।

“অবশ্যই আমরা আমাদের মিশন সফল করেছিলাম। রুটি পেয়েছিলাম। তবে এ কথা বলা যাবে না, আমরা অপরাধ করেছিলাম। ওটা ছিল এক ধরনের বিনিময়। ভাগনারের সঙ্গীত শোনার কারণে রুটিগুলো পেয়েছিলাম। আইনসঙ্গতভাবে বলতে গেলে বাণিজ্যিক লেনদেনের চেয়েও বেশি কিছু ছিল ব্যাপারটা।”

“কিন্তু সঙ্গীত শোনাটা তো কোনো কাজ নয়।”

“না, সে তো ঠিকই। বেকারির মালিক যদি আমাদেরকে থালা-বাসন মাজতে বলত কিংবা ঘরদোর সাফ করতে বলত আমরা করতাম না। সে তা করেনি। সে শুধু ভাগনারের সঙ্গীতের রেকর্ডখানা প্রথম থেকে শেষ অবধি শুনতে বলেছিল আমাদের। কেউ আসলে ব্যাপারটা আন্দাজ-ই করতে পারেনি। ভাগনারের সঙ্গীতের। কথা বলছি আর কী। ওই অভিশাপটা আমাদের ওপর চাপিয়ে ছিল বেকারির মালিক। এখন আমার মনে হয়, তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা উচিত ছিল আমাদের। চাকু দেখিয়ে রুটি নিয়ে ভেগে পড়া উচিত ছিল, তাহলে কোনো সমস্যা হতো না।”

“কোনো সমস্যা হয়েছিল নাকি তোমাদের?”

আমি আবার চোখ রগড়াই।

“সামান্যই। ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না তা। তবে এরপর থেকেই সবকিছু বদলাতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ভর্তি হই আবার। গ্রাজুয়েশন করি। ল’ ফার্মে কাজ নিয়ে আইন পরীক্ষাটা দেই। তোমার সঙ্গে দেখা হয় আর বিয়ে করি তোমাকে। ও রকম কাজ

অবশ্য আর কখনো করিনি।”

“তাই বল।”

বিয়ারের গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে বলি, “সব ঘটনাই তোমাকে বলা হয়ে গেল।”

“তোমার সেই বন্ধুটি কী করছে এখন?”

“জানি না। কিছু একটা ঘটেছিল, কিছুই না ধরনের ব্যাপার আর কী। আমরা অবশ্য একসাথে ঘোরাঘুরি করা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তারপর থেকে ওর সঙ্গে দেখা হয় না। জানি না কী করছে সে এখন।”

খানিকক্ষণের জন্য কোনো কথা বলল না সে। সম্ভবত সে বুঝতে পেরেছে পুরো কাহিনী আমি তাকে বলিনি। কিন্তু সে এসব নিয়ে আমার ওপর চাপ সৃষ্টিতে তৈরি ছিল না।

“সেই কারণেই তোমাদের সম্পর্ক ভেঙে গেল? বেকারিতে হামলাই ছিল মূল কারণ।”

“হতেও পারে। আমাদের উপলব্ধির চেয়েও ব্যাপারটা বেশি তীব্র ছিল বলে ধারণা করি। ওই ঘটনার পরে রুটির সঙ্গে ভাগনারের সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেছিলাম আমরা। পরস্পরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কাজটা কি আমরা ঠিক করেছিলাম। কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারিনি। ন্যায়সঙ্গতভাবে দেখলে আমরা সঠিক ছিলাম। কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হয়নি। প্রত্যাশা অনুযায়ী সবাই পেয়েছে।

“তারপরও আমার ধারণা একটা মারাত্মক ভুল আমরা করেছিলাম। এ কারণেই আমি অভিশাপ শব্দটি প্রয়োগ করেছিলাম। সত্যিই এটি একটি অভিশাপ।”

“তুমি কি মনে কর ওই অভিশাপ এখনও আছে?”

“জানি না। বাজি ধরে বলা যায় এই পৃথিবী অভিশাপে ভরা। কোন অভিশাপের কারণে ভুলভ্রান্তি ঘটে বল শক্ত।”

আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, “তা ঠিক নয়। বিষয়টা নিয়ে ভেবে থাকলে বলতে পার আমাকে। তুমি নিজে অভিশাপটি ভেঙে না দিলে দাঁতের ব্যথার মতো তা চেপে বসবে আর ক্রমাগত পীড়া দেবে তোমাকে। শুধু তোমাকে নয়, আমাকেও।”

“তোমাকে?”

“হ্যাঁ, কেননা আমিই এখন তোমার সবচেয়ে ভাল বন্ধু, তাই না? কেন তোমার মনে হয় আমরা উভয়েই ক্ষুধার্ত? তোমার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আগে জীবনেও আমি এ রকম তীব্র খিদের মুখোমুখি হইনি। তোমার কি মনে হয় এটা অস্বাভাবিক? তোমার অভিশাপ আমার ওপরও কাজ করছে।”

আমি মাথা নাড়াই। জানি না তার ধারণা ঠিক না বেঠিক; কিন্তু বুঝতে পারছি সে একটা কিছু ভেবে নিয়েছে।

খিদের অনুভূতি আবার ফিরে আসে। এ বার আগের চেয়ে অনেক বেশি তীব্র। ওই খিদে বয়ে এনেছে প্রচণ্ড মাথাব্যথা। পেটের তীব্র ব্যথা তারের মাধ্যমে আমার মস্তিষ্কের প্রধান অংশে প্রবাহিত হচ্ছে, যেন আমার পেটের ভেতরটা নানা জটিল মেশিনে সজ্জিত।

“মাত্র দু সপ্তাহ আমরা এক সাথে আছি,” বলল আমার স্ত্রী, “এই সময়ের মধ্যেই আমি এক ধরনের রহস্যময় উপস্থিতি টের পাচ্ছি।” সে সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকাল, হাত দুটো টেবিলে ওপর রেখে আঙুল জড়াজড়ি করল। “অবশ্যই আমি জানি না অভিশাপ এখনও আছে কিনা। এটা সব কিছুরই ব্যাখ্যা দেয়। একটা অভিশাপের ভেতর আছ তুমি।”

“কোন ধরনের অভিশাপের কথা বলছ?”

“এই যেমন ধর ভারী ধুলোয় ভরা পর্দাটা ছাদ থেকে ঝুলে আছে, পরিষ্কার করা হচ্ছে না বছরের পর বছর ধরে।”

“এটা আবার অভিশাপ হলো নাকি। হয়ত এটা আমি নিজেই।”

সে হাসে না।

বলে, “না ওটা তুমি নও।”

“ঠিক আছে ধরে নাও তুমিই ঠিক। মনে কর এটা একটা অভিশাপ। আমি কী করতে পারি এখন?”

“অন্য একটা বেকারিতে হামলা কর। এখনই। এটাই একমাত্র পথ!”

“এখন?”

“হ্যাঁ, এখনই। এখনও তুমি ক্ষুধার্ত। যা শেষ করতে পারনি তা তোমাকে শেষ করতে হবে।”

“কিন্তু এখন তো মধ্যরাত, কোনো বেকারি কী খোলা পাওয়া যাবে?”

“টোকিও শহরটা তো খুব বড়। আমরা খুঁজে বের করব। সারা রাত খোলা থাকে এমন একটা বেকারি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।”

“ঠিক আছে, খুঁজে বের কর।”

আমরা দুজনে আমাদের পুরনো করোলাটাতে চেপে বসি আর রাত আড়াইটার সময়

টোকিওর রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাতে থাকি, যদি একটা বেকারির সন্ধান মেলে। আমি স্টিয়ারিং হুইল চেপে ধরে থাকি আর সে বসে নেভিগেটর সিটে। ক্ষুধার্ত ঈগলের মতো শিকারের আশায় আমরা রাস্তার দু'পাশে তাকাতে থাকি। পেছনের সিটে মরা মাছের মতো পড়ে আছে লম্বা, শক্ত একটা স্বয়ংক্রিয় রেমিংটন শটগান। এর গুলিগুলো আমার স্ত্রীর আঁটো জামার পকেটে ক্রমাগত ঝরঝর শব্দ তুলছে। আমাদের সঙ্গে দুটো স্কী-মুখোশও আছে। আমার স্ত্রী এ রকম একট শটগানের মালিক কেন হয়েছে জানা নেই। স্কী-মুখোশ দুটোই বা এল কোত্থেকে। দু'জনের একজনও তো কোনো দিন স্কী করিনি। সে এর কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি, আর আমিও চাইনি। মনে হয় বিবাহিত জীবন রহস্যময়।

আমাদের আয়োজন ও সাজসজ্জা নিখুঁত হওয়া সত্ত্বেও সারা রাত খোলা থাকে এ রকম একটা বেকারি আমরা ভোলা পেলাম না। ইয়োয়োগি থেকে শিনজুকি, ইয়োসুইয়া থেকে আকাসাকা, আইওইয়ামা, হিরো, রুপোঙ্গি, দাইকান-ইয়ামা আর শিবুইয়ার ফাঁকা রাস্তা ধরে গাড়ি চালালাম আমি। শেষ রাতের টোকিও শহরে লোকজন, দোকানপাট সবই আছে; কিন্তু কোনো বেকারি নেই।

দু'বার আমরা পেট্রল কারের মুখোমুখি হলাম। একটা গাড়ি রাস্তার পাশে ভিড়ের মধ্যে দাঁড় করান ছিল। অগোচরে আমাদের দেখার চেষ্টা করছিল। অন্যটা ধীর গতিতে আমাদের ওভারটেক করে দূরে চলে গেল। প্রতিবারই হতোদ্যম হয়ে পড়ছিলাম, কিন্তু আমার স্ত্রীর মনোযোগ ক্ষণিকের জন্যও ছিন্ন হয়নি; তার দু'চোখ বেকারির সন্ধান করে ফিরছে।

"বাদ দাও তো" বললাম আমি, "রাতের এই সময়টাতে কোনো বেকারি খোলা পাওয়া যাবে না। এসবের জন্য একটা পরিকল্পনা থাকা চাই, নাহলে..."

"গাড়ি থামাও!"

ব্রেক কষলাম।

“এখানেই আছে।” বলল সে।

রাস্তার দু’পাশের দোকানগুলোর ঝাঁপ নামান। ফলে সেখানে অন্ধকার আর দু’পাশে নীরব দেয়াল। ঠাণ্ডা কাঁচের চোখের মতো একটা হেয়ার কাটিং সেলুনের নিয়নসাইন জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। ওখান থেকে দু’শ গজ দূরে ম্যাকডোনাল্ড হামবার্গারের একটা নিয়ন সাইন দেখা যাচ্ছে, এই তো।

“কোনো বেকারি তো চোখে পড়ছে না।” বললাম আমি।

সে নীরবে গাড়ির ড্যাশবোর্ডের খুপরি থেকে কাপড়ের ফিতা বের করল আর তা হাতে নিয়ে গাড়ি থেকে নামল। আমিও নামলাম। হাঁটু গেড়ে বসে সে কাপড়ের। ফিতা দিয়ে গাড়ির নম্বর প্লেট ঢেকে দিল। তার চলাফেরার মধ্যে বিস্তর অভিজ্ঞতার ছাপ। মনের ভাব গোপন করে আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

“ওই ম্যাকডোনাল্ডটাতে চড়াও হবো আমরা।” সে বলল।

“ম্যাকডোনাল্ড কোনো বেকারি নয়।” ধরিয়ে দিলাম আমি।

“বেকারির মতোই এটা,” সে বলল, “কখনো কখনো আপস করতে হয়। চল যাওয়া যাক।”

ম্যাকডোনাল্ডের সামনে গিয়ে পার্কিং লটে গাড়ি দাঁড় করালাম। কম্বলে মোড়ানো শটগানটা সে আমার হাতে দিল।

আমি প্রতিবাদ করে বললাম, “জীবনেও বন্দুক দিয়ে গুলি করিনি।”

“তোমার গুলি করার দরকার নেই তো, শুধু হাত দিয়ে ধরে রাখ, ঠিক আছে? আমি যা বলছি তাই কর। আমরা সোজা ভেতরে গিয়ে ঢুকব, যখন তারা বলবে ম্যাকডোনাল্ড এ স্বাগতম, তখন আমরা মুখোশ পরে ফেলব। বুঝতে পেরেছ?”

“নিশ্চয়ই, কিন্তু ...”

“তখন তুমি কর্মচারী ও খদ্দেরদের একত্র করে তাদের দিকে বন্দুক তাক করে ধরবে। খুব দ্রুত করবে কাজটা। বাকি সব আমি করব।”

“কিন্তু ...”

“কয়টা হামবার্গার আমাদের দরকার বলে তুমি মনে কর? তিরিশটা?”

“আমারও তাই মনে হয়।” একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শটগানটা হতে নেই আর কম্বলটা একটুখানি নামিয়ে দেই। জিনিসটা বালির বস্তার মতো ভারী আর রাতের মতো কালো।

“সত্যিই কী কাজটা করা দরকার আমাদের?” জিজ্ঞেস করি আমি- অর্ধেক নিজেকে, অর্ধেক তাকে।

“নিশ্চয়ই আমাদের করা উচিত।”

ম্যাকডোনাল্ড হ্যাট পরিহিত একটি মেয়ে কাউন্টারের পেছন থেকে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, “ম্যাকডোনাল্ডে স্বাগতম।” ভাবিনি এই মেয়েটি শেষ রাতের পালায় কাজ করে, ফলে তাকে দেখামাত্র সেকেন্ডের জন্য বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। ত্বরিৎ মুখোশ পরে ফেলি। হঠাৎ মুখোশ পরা মানুষের সামনে পড়ে মেয়েটি হাঁ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

এ রকম অবস্থায় কী করতে হয় নির্ঘাত তা ম্যাকডোনাল্ড-এর অতিথি সেবা ম্যানুয়ালে

লেখা নেই। সে রীতি মাফিক ম্যাকডোনাল্ডে স্বাগতম বলতে যাবে; কিন্তু তার মুখ থেকে কোনো কথা বেরুবে না।

যত শীঘ্র সম্ভব আমি শটগানটা কম্বলের ভেতর থেকে বের করে আনলাম এবং টেবিলগুলোর দিকে তাক করলাম। ওখানে খদ্দের ছিল মাত্তর দু'জন। একটি ছেলে একটি মেয়ে। সম্ভবত তারা ছাত্র তাদের মাথা টেবিলের দিকে ঝুঁকে আছে। গভীর ন্দ্রিায় আচ্ছন্ন তারা। তাদের সামনে টেবিলে রাখা স্ট্রবেরি-মিল্কসেকের গ্লাস দু'টিকে আভা-গাদ স্থাপত্যের মতো লাগছে। মরার মতো ঘুমাচ্ছে তারা। আমাদের অপারেশনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। শটগান ঘুরিয়ে কাউন্টারের দিকে ধরলাম।

সব মিলিয়ে ম্যাকডোনাল্ডের তিনজন কর্মচারী ওখানে। কাউন্টারে একটা মেয়ে, বিবর্ণ ডিম্বাকৃতি চেহারার ম্যানেজার যার বয়স বিশের কোঠায় আর কিচেনে ছাত্র কিসিমের এক হ্যাংলা পাতলা যুবক। এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে শটগানের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল তারা। ট্যুরিস্টরা যেমন ইনকা যুগের কূপের দিকে উঁকি দিয়ে দেখে ঠিক তেমনভাবে। কেউ চিৎকার কিংবা প্রতিবাদী কোনো ভঙ্গি করল না। বন্দুকটা এত ভারী ছিল যে, ব্যারেলটা ক্যাশ কাউন্টারে নামিয়ে ট্রিগারে হাত রাখতে হয়েছিল আমাকে।

"আমরা টাকা দেব আপনাদের," কর্কশ স্বরে ম্যানেজার বলল, "বেশি দেয়া যাবে না, কারণ এগারটায় ক্যাশ সংগ্রহ করে নিয়ে গেছে। তবে আশ্বাস দিচ্ছি, সম্ভাব্য সবকিছু করব আমরা।"

"সামনে সাটার নামিয়ে নিওন সাইন বন্ধ করে দাও।" আমার স্ত্রী বলল।

ম্যানেজার বলল, "একটুখানি দাঁড়ান। ওটা আমি করতে পারব না। বিনা অনুমতিতে বন্ধ করা হলে আমাকে দায়ী করা হবে।"

আমার স্ত্রী তার হুকুমের পুনরাবৃত্তি করল ধীরে ধীরে।

আমি তাকে সাবধান করে বললাম, “উনি যা বলছেন তা-ই করুন না।”

সে প্রথমে বন্দুকের নলের দিকে তাকাল, তারপর আমার স্ত্রীর দিকে, তারপর আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল বন্দুকের নলের ওপর। অতঃপর সে নিজেকে নিয়তির হাতে ছেড়ে দিল। নিয়ন সাইন বন্ধ করল আর ইলেকট্রিক প্যানেলের সুইচে চাপ দিয়ে সামনের সাটার নামিয়ে দিল। আমি তার দিকে নজর রাখলাম। ভাবনা হচ্ছিল পাছে সে ডাকাতির বিপদ সংকেত না বাজিয়ে দেয়; তবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হলো এখানে ওই ধরনের কোনো ব্যবস্থা নেই। সম্ভবত এদের এখানে কখনো এই ধরনের কেননা ঘটনা ঘটেনি।

“নিয়ে যাওয়ার জন্য তিরিশটা বড় হামবার্গার চাই আমাদের।” আমার স্ত্রী হুকুম দিল।

ম্যানেজার অনুনয় করে বলল, “তারচে টাকা নিন আপনারা। প্রয়োজনের তুলনায় বেশি দেব যাতে অন্যখান থেকে এগুলো কিনতে পারেন। নচেৎ আমাদের হিসাব-পত্তর একদম গড়বড় হয়ে যাবে...”

“উনি যা বলছেন তাই করুন।” আমি আবার বললাম।

তিরিশটা বার্গার বানানোর জন্য তিনজন কিচেনের দিকে রওয়ানা হলো। ছাত্রটি মাংস গ্রিল করল, ম্যানেজার তা বনের ভেতর ঢোকাল আর মেয়েটি সেগুলো কাগজে মুড়ালো। কেউ টু শব্দটি করল না।

এক গাদা চমৎকার বার্গার তৈরি এখন প্রায় শেষ। মনে হলো এখনই একটা তুলে এনে খাই। কিন্তু এ কাজ আমাদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে কিনা ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। অপেক্ষা করতে হবে আমাকে। প্রচণ্ড গরম কিচেন সংলগ্ন এলাকায় দাঁড়িয়ে দরদর করে ঘামতে লাগলাম।

বার্গার বানানো শেষ হলে আমার স্ত্রী তা গুণে দেখল। দুটি ছোট শপিং ব্যাগ নিয়ে এক-একটিতে পনেরটি করে বার্গার ঢুকাল সে।

“এত কষ্ট করতে গেলেন কেন আপনারা?” মেয়েটি বলল, “টাকা নিয়ে কিছু কিনলেই তো পারতেন। এত বড় বড় তিরিশটা বার্গার খেয়েই বা কী লাভ?”

আমার স্ত্রী ব্যাখ্যা করে বলল, “সত্যিই আমরা দুঃখিত, কিন্তু কী করব বল, কোনো বেকারি খোলা পেলাম না। পেলে ওগুলোর একটাতেই হামলা করতাম আমরা।”

তার ওই বক্তব্যে সন্তুষ্ট হলো তারা। আর কোনো প্রশ্ন করল না। অতঃপর আমার স্ত্রী দু’ বোতল বড় কোকের অর্ডার দিল এবং তা নিয়ে দাম পরিশোধ করে দিল।

“আমরা শুধু বার্গার ছিনতাই করতে এসেছি, অন্যকিছু নয়।” বলল আমার স্ত্রী। এক ধরনের জটিল মাথা নাড়ানোর মাধ্যমে মেয়েটি তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল।

আমার স্ত্রী পাকানো রশির একটা গোলা বের করে একটা থামের সঙ্গে তিনজনকে বেঁধে ফেলল। এত নৈপুণ্যের সঙ্গে সে কাজটি করল যে, আমার মনে হলো সে সূই দিয়ে বোম লাগাচ্ছে। সে তাদের জিজ্ঞেস করল বাধার কারণে তারা ব্যথা পাচ্ছে কিনা এবং কারও বাথরুম পেয়েছে কিনা। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলল না। আমি শটগানটা আবার কম্বল দিয়ে মুড়িয়ে ফেললাম। আমার স্ত্রী শপিং ব্যাগ দুটো তুলে নিতেই ওই স্থান ত্যাগ করলাম। খদ্দের দু’জন তখনও গভীর সমুদ্রের মৎস্য দম্পত্তির মতো গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন।

আধা ঘন্টা খানেক গাড়ি নিয়ে ঘুরলাম। একটা ভবনের ফাঁকা পার্কিংলট পেয়ে সেখানে ঢুকে পড়লাম। ছয়টি বার্গার গ্রাস করলাম আমি। আমার স্ত্রী খেল চারটি। বাকি রইল বিশটি। কোক পান করলাম প্রাণ ভরে। মনে হয়েছিল ওই সর্বগ্রাসী ক্ষুধা বোধকরি কোনো দিন যাবে না, কিন্তু ভোর হওয়ার সাথে সাথে তা দূর হয়ে গেল। সূর্যের প্রথম

আলো ভবনটির নোংরা দেয়ালের রক্তবর্ণকে আলোয় রাঙাল। আর বড় একটা সনি বেটার বিজ্ঞাপন টাওয়ারকে বেদনাময় তীব্রতায় উজ্জ্বল করে তুলল। আমেরিকান আর্মসফোর্স রেডিও বাজাচ্ছিল কাউবয় সঙ্গীত। আমরা একটা সিগারেট দু'জনে ভাগ করে খেলাম। তারপর সে আমার কাঁধে মাথা রাখল।

"সত্যিই কী এসব করার দরকার ছিল আমাদের?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"নিশ্চয়ই দরকার ছিল!" দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার স্ত্রী বলল, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। তাকে বিড়ালের মতো হালকা আর নরম মনে হলো।

এখন একা আমি। নৌকার কিনারা থেকে সমুদ্রের তলদেশে তাকালাম। আগ্নেয়গিরিটি এখন আর নেই। শান্ত আর স্থির জল আকাশের নীল ছড়াল। আর কিছু ছিল না সেখানে....

নৌকার তলদেশে সমুদ্রের নীল জলে সটান শুয়ে পড়লাম চোখ বুজে। তারপর অপেক্ষা করতে লাগলাম ফুঁসে ওঠা ঢেউয়ের জন্য যাতে আমাকে সেইখানে নিয়ে যাওয়া হয় যেখান থেকে আমি এসেছিলাম।

বেকারিতে হামলা

বেকারিতে হামলা

সেদিন আমাদের পেটে কোনো দানা-পানি ছিল না। বরং বলা ভাল, আমরা উপোস দিচ্ছিলাম। কিন্তু আমাদের ওই সর্বগ্রাসী ক্ষুধার জন্ম কোথায়? এ কথা তো ঠিক খাবার দাবারের অভাব আমাদের ছিল। কেমন করে খাবারের অভাব হলো? এর কারণ হচ্ছে এই যে, আমাদের হাতে কোনো মুদ্রা অর্থাৎ কোনো টাকা পয়সা ছিল না। এর কারণ হয়ত এই যে, আমাদের ভেতর কল্পনা শক্তির অভাব ছিল। না, আমাদের ক্ষুধার জন্য আমাদের কল্পনা শক্তির অভাবই সরাসরি দায়ী।

ঈশ্বর, মার্ক্স আর জন লেনন সবাই মারা গেছেন। যে ভাবেই হোক আমরা ভীষণ ক্ষুধার্ত এখন; আর এ কারণে একটা অপরাধই করতে যাচ্ছি প্রায়। ক্ষুধার কারণে আমরা অপরাধ করতে যাচ্ছি না বরং অপরাধ-ই আমাদেরকে ক্ষুধার সঙ্গে ছুটতে বাধ্য করছে। ব্যাপারটা ভাল করে বুঝি না, তবে এর অস্তিত্ব আছে।

“খারাপ হবে ব্যাপারটা,” খুব অল্প কথায় বলল আমার সঙ্গী আর তাকে আমি সমর্থন করলাম।

গত দু’দিনে পানি ছাড়া আমরা আর কিছুই খাইনি। একবার কেবল সূর্যমুখীর একটা

পাতা খেয়েছিলাম শুধু এটা বোঝার জন্য যে, জিনিসটা খেতে কেমন; কিন্তু ভালো লাগেনি বলে আর খাইনি।

আর এ জন্যই রান্নাঘরের কাটাকুটিতে ব্যবহৃত হয় এ রকম একটা ছুরি নিয়ে বেকারিতে এসেছি। একটা শপিং অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে বেকারিটি অবস্থিত। এক টেকো-বুড়ো বেকারিটির মালিক যার বয়স ৫০ এর ওপরে এবং তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য।

ছুরি হাতে আমরা ধীরে ধীরে শপিং এলাকার ভিড়বাট্টার ভেতর হাঁটতে লাগলাম। আমার অনুভূতি তখন হাইনুন চলচ্চিত্রের মতোন। হাঁটার সময় রুটির সুঘ্রাণ তীব্র হচ্ছিল আমাদের কাছে। ওই ঘ্রাণ যত তীব্র হচ্ছিল আমাদের ভেতরকার অপরাধের ঝোঁকও তত গম্ভীর হচ্ছিল। আমরা উত্তেজিত ছিলাম এ কারণে যে, একই সঙ্গে আমরা বেকারি ও কমিউনিস্ট পার্টির একজন সদস্যকে হামলা করতে যাচ্ছি।

সময়টা বিকেলের শেষ দিকে হওয়ায় বেকারিতে একজন মাত্র লোক ছিল। তবে দেখে রাগ ধরে এমন একজন বুড়ি ছিল সেখানে। তার হাতে ছিল একটা নোংরা শপিং ব্যাগ। তাকে ঘিরে ছিল বিশ্রি একটা গন্ধ। এই ধরনের কদর্য মহিলাদের কারণে অপরাধীদের পরিকল্পনা সবসময়ই বাধাগ্রস্ত হয়। অপরাধ নাটকে বিষয়গুলো এ ভাবেই কাজ করে। চোখের ইশারায় সঙ্গীকে এই বার্তা পাঠালাম যে, ওই বদখত মহিলা না যাওয়া পর্যন্ত আমাদের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হবে না। অতএব ছুরিটি লুকিয়ে রুটিক্রেতা হওয়ার ভান করলাম।

জিনিসপত্র বাছাবাছি করতে গিয়ে বুড়ি অতিশয় বেশি সময় নিয়ে ফেলেছিল। দেখে শুনে মনে হচ্ছিল সে তার ট্রেতে ভাজা রুটি আর তরমুজের রুটি রাখার বদলে তিন আয়না লাগানো দেরাজঅলা লেখার ডেস্ক নির্বাচন করছে। তবে তার মানে এই নয় যে, ওগুলো কিনতে যাচ্ছে সে। কিংবা এমনও হতে পারে এটা তার ভাজারুটি আর

তরমুজের রুটি সংক্রান্ত তত্ত্বের একটা দিক ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য এর একদম বিপরীত একটা কিছুও হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে পরিস্থিতির সঙ্গে জুতসইভাবে খাপ খাওয়ানোর জন্য তার দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন।

ওই তত্ত্বে তরমুজের রুটি তার অবস্থান হারাচ্ছিল। সে এমনভাবে তার মাথা ঝোকাল যেন সে ভাবছিল- এ রকম একটা জিনিস কেন আমি বেছে নেব? সবচেয়ে বড় কথা এটা খুব বেশি মিষ্টি।

খানিকক্ষণ চিন্তা করে তরমুজের রুটি সে শেলভের নির্ধারিত জায়গায় রেখে দিল আর ট্রেতে তুলল বাঁকানো একটা ব্রেডরোল। একট নতুন তত্ত্বের জন্ম হলো। মেঘের মাঝখান থেকে বসন্তের রোদের আলো উপচে পড়ে সমুদ্রের ওপর ভাসমান বরফস্তূপকে গলিয়ে দিল খানিকটা।

“এ কী জ্বালাতন?” নিচুস্বরে আমার সঙ্গী বলল, “এই বজ্জাত বুড়িটাকে দেই শেষ করে। তাকে যথাস্থানে রাখার জন্য একটুখানি ধাক্কা দিয়ে বলি, “থাম না রে বাপু। নট নড়ন চড়ন।”

বেকারির মালিক ক্যাসেট প্লেয়ারে ভাগনারের সঙ্গীত শোনায় মগ্ন ছিলেন বলে এসব ব্যাপারে দৃষ্টি দিলেন না। আমার ঠিক বুঝে এল না ভাগনারের সঙ্গীত শ্রবণ কমিউনিস্ট পার্টির কোনো সদস্যের জন্য সঠিক কাজ কিনা।

বুড়ি বাঁকানো ব্রেডরোল আর ভাজা রুটির দিকে বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। মনে হলো ধাঁধায় পড়ে গেছে। ভাবল, “ব্যাপারটা অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক। কোনোভাবেই বাঁকানো ব্রেড রোল আর ভাজা রুটি পাশাপাশি স্থান পেতে পারে না।” নির্ঘাত তার মনে হচ্ছে দুই ধরনের রুটির দুই ধরনের আদর্শ আছে। বুড়ির হাতে ধরা ট্রেটার ওপর রুটিটা ভাঙা রেফ্রিজারেটরের থার্মোস্ট্যাটের মতো ঠকঠক করে কাঁপছিল। রুটি নিশ্চয়ই

সত্যি সত্যি কাঁপছিল না। কাজেই শেষমেষ ওই ঠনঠন করে কপার ব্যাপারটা নেহাতই আলংকারিক।

“শালা মেরে ফেলবো বুড়িটাকে,” বলল আমার সঙ্গী। প্রচণ্ড খিদে, ভাগনারের সঙ্গীত আর বুড়িকে নিয়ে সৃষ্ট টেনশন পরিস্থিতিকে একেবারে যাচ্ছেতাই নাজুক করে তুলেছিল। কোনো কথা না বলে মাথা নাড়ালাম।

বুড়িটা তখনও ট্রে হাতে ঘুরঘুর করছিল, যেন দস্তয়েভস্কি বর্ণিত নরকের ভেতর দিয়ে চলাফেরা করছে। মনে হচ্ছিল ভাজা রুটিটা একটা মঞ্চে দাঁড়িয়ে রোমের নাগরিকদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছে আর তাতে তারা দারুণ রকম মুগ্ধ। ওই ভাষণে এমনসব চমকার শব্দালংকার ব্যবহার করা হয়েছিল আর পরিবেশিত হয়েছিল এমন সুন্দর ভরাট, গমগমে আর স্নিগ্ধ গভীর কণ্ঠে যে, জনতা করতালিতে ফেটে পড়েছিল মুহুর্মুহু। ভাজা রুটির পরেই মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিল বাঁকানো ব্রেডরোল। ট্রাফিক সিগনালের ওপর একটা বক্তৃতা ঝাড়ল সে যা ছিল খুবই অসংলগ্ন। বলল, সিগনালের বাতি যখন সবুজ থাকে তখন যেসব গাড়ি বাঁয়ে মোড় নেয় তাদের সোজা যাওয়া উচিত, আর কোনো গাড়ি নেই এটা নিশ্চিত হওয়ার পর তাদের বামে যাওয়া। উচিত। রোমের নাগরিকগণ তার বক্তৃতা ঠিক বুঝতে পারল না, তবে ওটা খুব জটিল প্রকৃতির ছিল বলে প্রশংসা করল। ভাজা রুটির চেয়ে বাঁকানো ব্রেডরোল বেশি প্রশংসা পেয়েছিল বলে ভাজা রুটিকে তার শেলভের এর নির্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়ে নিল বুড়ি। তখন বুড়ির ট্রেতে যে দুটি বাঁকানো ব্রেডরোল বসেছিল তারা ছিল সিম্পল পারফেকশনের ভাবমূর্তি। প্রবল সন্তুষ্টি বুকে নিয়ে বুড়ি বেকারি থেকে বেরিয়ে গেল।

এবার আমাদের পালা।

খুব আন্তরিকতা নিয়ে বেকারির মালিককে বললাম, “আমরা খুবই ক্ষুধার্ত,” ছুরিটা তখনও আমার পেছনে লুকান, “তবে আমাদের হাতে একটি পয়সাও নেই।”

মাথা নাড়িয়ে বেকারির মালিক বললেন, “ও তাই নাকি?” আমরা দুজনেই একযোগে কাউন্টারের ওপর রাখা ফিঙ্গারনেইল ক্লিপারের দিকে তাকালাম। ক্লিপার জোড়া ছিল বেশ বড়সড়। সম্ভবত শকুনের নখ কাটার কাজে ব্যবহৃত হয়।

বেকারির মালিক বললেন, “খিদে যখন লেগেছে রুটিফুটি কিছু খেয়ে নাও।

“কিন্তু টাকা-পয়সা নেই যে।”

বিরক্ত হয়ে বেকারির মালিক বললেন, “সে কথা তো বাপু শুনলাম-ই। পয়সা। টয়সা লাগবে না। মনে যা চায় তা ওখান থেকে নিয়ে খেয়ে ফেল।”

সত্যি বলছেন? আমরা তো খারাপ একটা কিছু করতে যাচ্ছিলাম।

“আরে সত্যি বলছি, ভেবো না।”

“কিন্তু আমরা তো এমনি এমনি কিছু নিতে চাইনে।”

“বলো কী হে,” বললেন বেকারির মালিক, “একটা কথা বলি শোন, যত খুশি রুটি তোমরা খেতে পার তবে শর্ত আছে। তোমাদের ঘাড়ে একটা অভিশাপ চাপাব। মানবে তো?”

“অভিশাপ? বলছেন কী আপনি? সেটা আবার কী?”

“অনুমান করা সহজ নয় হে ব্যাপারটা। বাসের সময়সূচির মতো নয়, বুঝলে। কিনা?”

“দাঁড়ান এক মিনিট। আমি কিন্তু অভিশপ্ত হতে চাইনে,” বলল আমার সঙ্গী, “এসব বুজরুকি একদম পছন্দ নয় আমার। তার চেয়ে এখনই মেরে ফেলব আপনাকে।”

“আরে থামো তো ছোকরা। মরবার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই।”

আমার সঙ্গী বলল, “সেটা ভাল। তবে কোনো মতেই অভিশপ্ত হতে চাইনে, এই বলে দিলাম।”

আমি তখন বললাম, “আমাদের মধ্যে কিছু একটা বিনিময় হওয়া দরকার।”

এরপর আর কোনো কথাটথা না বলে আমরা নেইল ক্লিপারের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

“আমার একটা প্রস্তাব আছে,” বেকারির মালিক বললেন, “তোমরা কি ভাগনারের সঙ্গীত পছন্দ করো?”

“একদম না।” বললাম আমি। আমার সঙ্গী বলল, “আমিও না।”

“বেশ ভাল কথা। ভাগনারকে পছন্দ করলেই কেবল বিনে পয়সায় রুটি পাবে।”

মনে হলো আফ্রিকা মহাদেশের কোনো পাদ্রির মুখ থেকে কথাগুলো বেরিয়ে এল। তবে সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওই প্রস্তাবে সাড়া দিলাম। না খেয়ে থাকার চেয়ে অভিশপ্ত হওয়া অন্তত ভাল।

“ভাগনার আমার পছন্দ,” বললাম আমি।

“আমারও,” বলল আমার সঙ্গী।

অতএব বিস্তর রুটি ভক্ষণ করতে করতে আমরা ভাগনারের সঙ্গীত শ্রবণ করলাম।

বেকারির মালিক রেকর্ডের কভার পড়তে পড়তে বললেন, ‘সঙ্গীতের ইতিহাসে ত্রিস্তান অ্যান্ড ইসোলদি একটা অনবদ্য সৃষ্টি। ১৮৫৯ সালে বেরোয় এটি। ভাগনারের শেষের দিককার কাজ বুঝতে হলে এটা শোনা অপরিহার্য।”

আমাদের মুখের ভেতর রুটি ছিল বলে এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করা সম্ভব হলো না

আমাদের পক্ষে। আমরা শুধু খানিকটা বিড় বিড় করতে পারলাম।

কর্নওয়ালের রাজার ছেলে ত্রিস্তানকে পাঠানো হয়েছিল তার চাচার বাগদত্তা রাজকুমারী ইসোলদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে; কিন্তু জাহাজে ফেরার সময় ত্রিস্তান ইসোলদির প্রেমে পড়ে। চেলো আর ওবো'র দ্বৈত বাদনের মাধ্যমে সঙ্গীতটি শুরু হয়। থিমটি প্রেমিক-প্রেমিকা যুগলের ভালবাসার মোটিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

ঘন্টা দুয়েক পরে উভয় পক্ষেরই সন্তুষ্টি ঘটে। আমরা বিদেয় হই।

"আগামীকাল টানহাউসার শুনব।" বেকারির মালিক বলেছিলেন আমাদেরকে।

আমরা যখন নিজেদের ঘরে ফিরে এসেছিলাম। তখন আমাদের ভেতরকার শূন্যতা একেবারে অন্তর্হিত হয়েছিল আর কাজ করতে শুরু করেছিল কল্পনা করার শক্তি, যেন তারা কোনো ঢালু জায়গার দিকে গড়িয়ে যাচ্ছিল।

ব্যাঙ বাঁচালো টোকিও

ব্যাঙ বাঁচালো টোকিও

অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে কাটাগিরি দেখলেন বিশাল একটা ব্যাঙ তার জন্য অপেক্ষা করছে। বেশ শক্ত পোক্ত শরীর তার, ছফিট লম্বা পেছনের দুটি পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাটাগিরি ছোটখাটো মানুষ, লম্বায় পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চির বেশি হবে না, ব্যাঙের বিশালত্ব দেখে যারপর নাই অবাক হলেন।

“আমাকে ব্যাঙ বলে ডাকবেন।” স্পষ্ট ও দৃঢ়কণ্ঠে ব্যাঙ বলল।

কাটাগিরি দরজার কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তার গলা দিয়ে কোনো স্বর বেরুল না।

“ভয় পাবেন না। আমি আপনার কোনো ক্ষতি করতে আসিনি। ভেতরে এসে দরজা বন্ধ করে দিন। প্লিজ।”

কাটাগিরির ডান হাতে ব্রিফকেস আর বাম হাতে তাজা সবজি আর টিনজাত স্যামোন মাছের প্যাকেট। তিনি নড়াচড়া করার সাহস পেলেন না।

“মি. কাটাগিরি দয়া করে শিঘ্র করুন, দরজা বন্ধ করে দেন। জুতো খুলুন।” নিজের নামের উচ্চারণ কাটাগিরিকে ওই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করল। হুকুম

মতো দরজাটা বন্ধ করে দিলেন, সওদা পাতির ব্যাগ কাঠের মেঝের ওপর রাখলেন, তারপর ব্রিফকেসটা এক বোগলে রেখে জুতা খুললেন।

“আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার বাড়িতে ঢোকার জন্য আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত।” বলল ব্যাঙ, “জানি, আমাকে এভাবে দেখে আপনি কষ্ট পাবেন; কিন্তু কী করব বলুন উপায় ছিল না আমার। এক কাপ চা খাবেন নাকি? আপনি শিগগিরই ফিরবেন জেনে আমি পানি গরম করে রেখেছি।”

ব্রিফকেসটি তখনও কাটাগিরির বোগলে। কেউ কি তার সঙ্গে মস্করা করছে। ভাবলেন তিনি। কেউ কি ব্যাঙের পোশাক পরে তার সঙ্গে মজা করছে। কিন্তু ব্যাঙকে পটে গরম পানি ঢালতে দেখে এবং তার চলাফেরা পর্যবেক্ষণ করে তার মনে হলো এটা আসলেই একটা ব্যাঙ। ব্যাঙ তার সামনে এক কাপ গ্রিন টি রাখল, নিজেও নিল এক কাপ।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ব্যাঙ বলল, “কী এবার মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে তো?” এতো কিছুর পরেও কাটাগিরি কোনো কথা বলতে পারলেন না।

“জানি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আপনার সঙ্গে দেখা করা উচিত ছিল, আপনার ব্যাপারে আমি পুরোপুরি অবহিত। নিজের বাড়ি ঢুকে ব্যাঙকে এভাবে অপেক্ষা করতে দেখলে যে কেউ ক্ষুব্ধ হবে। কিন্তু জরুরি একটা বিষয় আমাকে এখানে টেনে এনেছে। মাফ করে দিন আমাকে।”

“জরুরি ব্যপার?” শেষ পর্যন্ত কাটাগিরির মুখে কথা ফুটল।

“হ্যাঁ খুবই জরুরি একটা বিষয়, তা না হলে কী এভাবে কেউ কারও বাড়িতে আসে? এ রকম অভদ্রতা করতে আমরা কিন্তু মোটেও অভ্যস্ত নই।”

“এখানে কী আমার কিছু করার আছে?”

“হ্যাঁ এবং না।” ব্যাঙ বলল, “না আবার হ্যাঁ।”

নিজের ওপর আস্থা ও নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে আমাকে। ভাবলেন কাটাগিরি। বললেন, “আচ্ছা আমি সিগ্রেট খেলে কি তুমি মাইন্ড করবে?”

“মোটেও না।” বলল ব্যাঙ, “এটা আপনার বাড়ি। আমার অনুমতি নেয়ার দরকার কী আপনার। সিগ্রেট খান, মদ পান কিংবা যা ইচ্ছে তা-ই করুন। আমি নিজে অবশ্য ধূমপান করি না; কিন্তু কারও নিজের বাড়িতে ধূমপান বিষয়ে আমার বিরক্তির কথা প্রকাশ করি না।”

কাটাগিরি কোটের পকেট থেকে সিগ্রেট বের করে ধরালেন। তিনি লক্ষ্য করলেন তার হাত একটু একটু কাঁপছে। মনে হলো তার উল্টো দিকে বসে ব্যাঙ সবকিছু খেয়াল করছে।

“তুমি আবার কোনো গ্যাং ট্যাং এর সঙ্গে জড়িত নও তো?” সাহস করে জিজ্ঞেস করলেন কাটাগিরি।

“হা হা হা...হা হা হা! আপনার রসবোধ দারুণ তো মি. কাটাগিরি।” নিজের উরুতে হাত দিয়ে একটা থাবড়া মেরে ব্যাঙ বলল, “দক্ষ শ্রমিকের অভাব আছে জানি; কিন্তু নোংরা কাজ করাতে কোনো গ্যাং ব্যাঙ ভাড়া করবে? ব্যাপারটা হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায় না?”

“ভাল কথা। যদি তুমি ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে আলোচনা করতে এসে থাক তাহলে বলছি, খামোখা সময় নষ্ট করছ। ওসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার আমার নেই। ওসব কাজ করেন আমার কর্তারা, আমি শুধু তাদের হুকুম তামিল করি। তোমার জন্য কিছুই করতে পারবো না...।”

ব্যাঙ তার একটা আঙ্গুল উঁচিয়ে বলল, “এ রকম কোনো তুচ্ছ কাজ নিয়ে আমি এখানে আসিনি মি. কাটাগিরি। আমি জানি আপনি টোকিও সিকিউরিটি ট্রাস্ট ব্যাংকের শিনজুকু শাখার ঋণ বিভাগের সহকারী প্রধান। কিন্তু আমার আগমনের সাথে ঋণটিন পরিশোধের কোনো সম্পর্ক নেই। আমি এখানে এসেছি টোকিও শহরকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে।”

লুক্কায়িত কোনো ক্যামেরা আছে কিনা তা দেখার জন্য কাটাগিরি ঘরের চারদিকে তাকালেন, যদি ভয়াবহ কোনো জোকের জন্য তাকে নাছোড়বান্দায় পরিণত করা হয়। কিন্ত ক্যামেরার কোনো অস্তিত্ব সেখানে ছিল না। অ্যাপার্টমেন্টটি ছোট, কারও লুকিয়ে থাকার মতো জায়গা সেখানে নেই।

“না, আমি একাই এখানে আছি। জানি আপনি ভাবছেন আমি একটা বদ্ধ উন্মাদ আর আপনি স্বপ্ন দেখছেন। আমি পাগল নই আর আপনিও স্বপ্ন দেখছেন না। নিঃসন্দেহে ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস।”

“সত্যি কথা বলতে কী মি. ব্যাঙ ...”

“দয়া করে আমাকে শুধু ব্যাঙ বলুন।”

“ও আচ্ছা, সত্যি কথা কী জান ব্যাঙ, আমি আসলে বুঝতে পারছি না এখানে হচ্ছেটা কী। আমি যে তোমাকে বিশ্বাস করি না তা নয়। বিষয়টা আসলে আমার মাথায় ঢুকছে না। তোমাকে যদি কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করি তাহলে কী কিছু মনে করবে তুমি?”

ব্যাঙ বলল, “মোটও না। পারস্পরিক সমঝোতার মূল্য অনেক।... সম্ভাব্য স্বল্প উপায়ে আমাদেরকে সমঝোতায় পৌঁছুতে হবে। সে যা-ই হোক, যত খুশি প্রশ্ন করুন আমাকে।”

“তুমি আসলেই একটা ব্যাঙ, কি ঠিক বলেছি না?”

“অবশ্যই। আপনি নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছেন। সত্যিকারের একটি ব্যাঙ আমি- রূপকালঙ্কার, ইঙ্গিত বা অন্য কোনো জটিল প্রক্রিয়া এর মধ্যে নেই। যথার্থ একটা ব্যাঙ আমি, ডাক দিয়ে শোনাব নাকি?”

এ কথা বলে সে উচ্চস্বরে ডাকতে লাগল। তার কর্কশ চিৎকারে দেয়ালের ছবিগুলো পর্যন্ত কাঁপতে লাগল।

“ঠিক আছে, ঠিক আছে তুমি যথার্থই ব্যাঙ।” কাটাগিরি বললেন। তিনি এক চুমুক চা খেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, একটু আগে তুমি বলছিলে না টোকিও শহরকে

ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে তুমি এখানে এসেছে।”

“হ্যাঁ। তাই তো বলেছিলাম।”

“কী ধরনের ধ্বংস?”

ব্যাঙ গম্ভীর হয়ে বেশ গুরুত্ব সহকারে বলল, “ভূমিকম্প।”

কাটাগিরি হা হয়ে গিয়ে ব্যাঙের দিকে তাকালেন। ব্যাঙও কিছু না বলে কাটাগিরির দিতে তাকিয়ে রইল। এভাবে বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল। এখন ব্যাঙের বলার পালা।

“খুব বড় ধরনের একটা ভূমিকম্প; ১৮ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে আটটায় আঘাত হানবে। আজ থেকে তিনদিন পর। গত মাসে কোবেতে যে ভূমিকম্পটি হয়েছে এটা হবে তারচেয়েও ভয়াবহ। এ ধরনের ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা সাধারণত দেড় লাখের কম হয় না। এর প্রভাবে রাস্তায় যানবাহন লাইনচ্যুত হয়, পড়ে যায় রেল লাইন,

সাবওয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, ট্যাঙ্কার, ট্রাক ইত্যাদি বিস্ফোরিত হয়। দালান কোঠা ভেঙে গুড়ো গুড়ো হয়ে যায়, লোকজন এর তলায় পড়ে মারা যায়। আগুন লেগে যায়। অ্যাম্বুলেন্স বা ফায়ার সার্ভিস অকার্যকর হয়ে পড়ে। মানুষজন স্রেফ মরে পড়ে থাকে।... ওই ভূমিকম্পের উৎসস্থল হবে শিনজুকু ওয়ার্ড অফিসের নিকটবর্তী একটি স্থান।"

"শিনজুকু ওয়ার্ড অফিসের নিকটবর্তী এলাকা?"

"আরও সংক্ষেপ করে বললে বলতে হয় ভূমিকম্প টোকিও সিকিউরিটি ট্রাস্ট ব্যাংকের শিনজুকু শাখার তলদেশে সরাসরি আঘাত হানবে।"

এরপরে গভীর নৈঃশব্দ নেমে আসে।

"এবং তুমি ওই ভূমিকম্প ঠেকানোর পরিকল্পনা করছো?" কাটাগিরি বললেন।

ব্যাঙ মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক তাই। আমি আর আপনি টোকিও সিকিউরিটি ট্রাস্ট ব্যাংকের শিনজুকু শাখার তলায় যাব এবং কীটের সাথে আমরণ লড়াইয়ে লিপ্ত হবো।"

.

ট্রাস্ট ব্যাংকের ঋণ বিভাগের কর্মকর্তা হিসেবে নানাভাবে কাটাগিরিকে লড়াই করতে হয়েছে। তিনি মনে মনে ভাবলেন, এই ব্যাঙ ব্যাটা এসব বলছে কী?

তিনি খানিকটা দ্বিধা নিয়ে বললেন, "কীট? এ আবার কে হে?"

"মাটির তলায় থাকে। বিশাল বড় একট কীট। রেগে গেলে সে ভূমিকম্প ঘটায়। আর এই সময়টাতে ভীষণ রেগে আছে সে।"

"কী নিয়ে তার এত রাগ?"

“আমি জানি না। কেউ জানে না তার ওই কদর্য মাথাটার ভেতর কী ভাবনা চিন্তা খেলা করছে। খুব কম লোকই দেখেছে তাকে। সাধারণত ঘুমিয়ে থাকে সে। এই একটি কাজই সে করে- দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটায়। তার চোখ দুর্বল। ঘুমিয়ে থাকার সময় তার মগজ জেলির আকার ধারণ করে। জিজ্ঞেস করেন তো বলি, আমার ধারণা সে সম্ভবত কিছুই ভাবে না, কেবল শুয়ে থাকে আর ঘর্ঘর শব্দ করে। সামনে যা পায় তার প্রতিধ্বনি করে আর শরীরের ভেতর তা জমিয়ে রাখে। এবং তারপর কোনো রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেগুলোকে ক্রোধে পরিণত করে। কেন এমন হয় ব্যাখ্যা করতে পারব না আমি।”

কাটাগিরির দিকে তাকিয়ে ব্যাঙ কিছুক্ষণ নীরব রইল। তার কথার রেশ মিলিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর সে বলল, “দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না। ওই কীটের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোনো শত্রুতা নেই। আমি তাকে শয়তানের প্রতিরূপ বলেও মনে করি না। আমি তার সঙ্গে বন্ধুত্বও পাতাতে চাই না; আমার শুধু মনে হয় তার মতো একটা প্রাণীর অস্তিত্ব থাকতেই পারে। পৃথিবী একটা বিরাট ওভারকোটের মতো, আর এতে থাকতে হয় নানা আকার ও আকৃতির পকেট। কিন্ত ঠিক এই মুহূর্তে কীটটি এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে তাকে উপেক্ষা করা ভয়ঙ্কর ব্যাপার হবে।... কী বলছি সে ব্যাপারে আমি সচেতন মি. কাটাগিরি। শুনুন, ভূমিকম্পের সময় ও তীব্রতার ব্যাপারে আমার এক ছারপোকা বন্ধুর কাছ থেকে নির্ভরযোগ্য খবর পেয়েছি।”

ক্লান্তির কারণে সম্ভবত ব্যাঙ খানিকটা থামল আর চোখ বন্ধ করে রাখল।

“অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছ,” কাটাগিরি বললেন, “আমি আর তুমি মাটির নিচে যাব আর ভূমিকম্প থামাতে কীটের সঙ্গে লড়াই করব।”

“ঠিক তাই।”

কাটাগিরি চায়ের কাপটি হাতে নিলেন; কিন্তু কী মনে করে তা সরিয়ে রেখে বললেন, "আমি একটা জিনিস ঠিক বুঝতে পারছি না, এ কাজের জন্য তুমি আমাকে বেছে নিলে কেন?"

ব্যাঙ সরাসরি কাটাগিরির চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার জন্য বরাবরই আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। গত ১৬ বছর ধরে আপনি একটা ভয়ানক অথচ গ্ল্যামারপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছেন যা কিনা অন্যরা সবসময়ই এড়িয়ে গেছে। অথচ সেই দায়িত্ব আপনি সুন্দরভাবে পালন করছেন। আমি ভাল করেই জানি আপনার ঊর্ধ্বতন কর্তা কিংবা সহকর্মীরা যথাযথভাবে আপনার কাজের প্রশংসা করেনি। কিন্তু এ সব নিয়ে আপনার কোনো অভিযোগ নেই।

"শুধু তাই নয়, বাবা-মার মৃত্যুর পর আপনি আপনার ভাই-বোনদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন এমন কী বিয়ে শাদি পর্যন্ত দিয়েছেন। নিজের বিয়ের কথা একবারও ভাবেননি। অথচ এ জন্য আপনার ভাই-বোনেরা আপনার প্রতি সামান্যতম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি। আমার মতে তারা বিবেকবর্জিত। আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়, আপনার তরফ থেকে ওদের আচ্ছামতো পিটুনি লাগাই। অথচ আপনি ওদের প্রতি সামান্যতম ক্রোধও প্রকাশ করেননি।... সত্যিকথা বলতে কী, আপনার মতো বিবেক সম্পন্ন, সাহসী মানুষ আমি গোটা টোকিও শহরে খুঁজে পেলাম না যার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা যায়।"

"ব্যাঙ সাহেব আমাকে বলবে কী,..."

"দয়া করে আমাকে শুধু ব্যাঙ বলবেন।"

"আচ্ছা ঠিক আছে ব্যাঙ, তুমি আমার সম্পর্কে এতো কিছু জানলে কী করে?"

"ভাল কথা মি. কাটাগিরি, আমি বিগত বছরগুলোতে শুধু ব্যাঙগিরি করে বেড়াইনি,

জীবনের সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর প্রতি আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল।”

“কিন্তু তারপরেও ব্যাঙ, আমাকে বলতেই হচ্ছে, লোক হিসেবে আমি কিন্তু শক্তিশালী নই। মাটির নিচে কী ঘটছে তা-ও জানা নেই আমার। অন্ধকারে কীটের সঙ্গে লড়াই করার মতো গায়ের জোর আমার নেই। আমি নিশ্চিত তুমি আমার চেয়ে শক্তিমান ক্যারাতে ট্যারাতে জানা কিংবা ধরো সেল্ফ-ডিফেন্স ফোর্সের কোনো কমান্ডোকে পেয়ে যেতে পার...।”

চোখ গোল করে ব্যাঙ বলল, “খাঁটি একটা কথা বলি তবে। লড়াই তো করব আসলে আমি। তবে একা তা সম্ভব নয়। প্রধান কথা হচ্ছে, আপনার সাহস আর ন্যায় বিচারের আবেগটুকু আমার প্রয়োজন। আমি চাই আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আপনি বলেন, “এগিয়ে যাও ব্যাঙ। দারুণ কাজ করছো তুমি। জানি জিত তোমারই হবে। দারুণ লড়াই করছো তুমি সাবাস!”

ব্যাঙ এক হাত দিয়ে হাঁটুর ওপর আবারও একটা থাপ্পড় মারল তারপর বলল, “সত্যি কথা বলতে কী মি. কাটাগিরি অন্ধকারে কীটের সঙ্গে লড়াই করতে আমারও ভয় হয়। বহুবছর আমি শান্তি প্রিয় প্রাণী হিসেবে দিন গুজরান করেছি, শিল্প ভালবেসেছি আর বাস করেছি প্রকৃতির মাঝে। লড়াই করতে আমারও ভাললাগে না। কিন্তু এ কাজ করতে চাচ্ছি বাধ্য হয়ে। তবে এ লড়াইটা নিঃসন্দেহে হবে প্রচণ্ড। জান নিয়ে না-ও ফিরতে পারি; অঙ্গহানিও হতে পারে আমার। কিন্তু না, পালিয়ে আসব না আমি। কারণ নীৎসে বলেছেন, নির্ভীকতাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিচক্ষণতা।”...

কিন্তু এ সবের কোনো অর্থই খুঁজে পেলেন না কাটাগিরি। তারপরেও তার মনে হলো অবাস্তব শোনা গেলেও ব্যাঙ যা বলছে তা বিশ্বাস করা যায়। একট কিছু নিশ্চয় আছে- ওর মুখের অভিব্যক্তি আর বলার ভঙ্গির মধ্যে এক ধরনের সরল সাধুতা আছে যা হৃদয় স্পর্শ করে। সিকিউরিটি ট্রাস্ট ব্যাংকের শক্ত একটা বিভাগে দীর্ঘদিন কাজ করে এ

ধরনের ব্যাপার বুঝবার মতো ক্ষমতা তার ভেতর তৈরি হয়েছে।

“জানি ব্যাপারটা আপনার জন্য খুব জটিল। বিশাল একটা ব্যাঙ আপনার বাড়িতে ঢুকে বিদঘুঁটে সব জিনিস বিশ্বাস করতে বলছে আপনাকে। আপনার এই প্রতিক্রিয়া খুবই স্বাভাবিক। কাজেই আমি আমার অস্তিত্বের ব্যাপারে কিছু প্রমাণ হাজির করতে চাই। আচ্ছা মি. কাটাগিরি বিগ বিয়ার ট্রেডিং এর ঋণ আদায় নিয়ে তো আপনারা সাংঘাতিক ভোগান্তি পোহাচ্ছেন, তাই না?”

“হ্যাঁ।” কাটাগিরি বললেন।

“বেশ। পর্দার আড়ালে অনেক জুলুমবাজ আছে। তারা কোম্পানিকে দেউলিয়া বানিয়ে ঋণের হাত থেকে বাঁচতে চাইছে। ব্যাংকের ঋণ প্রদানকারী কর্মকর্তারা কোম্পানির পূর্ব ইতিহাস খতিয়ে না দেখেই কাড়ি কাড়ি টাকা দিয়ে বসে আছে, আর এখন এ টাকা আদায়ের দায় পড়েছে আপনার কাঁধে। কিন্তু ওদের বুকে কামড় বসাতে বিস্তর বেগ পেতে হচ্ছে আপনাকে। কারণ সহজে দমন করার মতো লোক তারা নয়। আর তাদের মদদে আছে শক্তিশালী রাজনীতিবিদরা। ৭০ কোটির মামলা। এক জটিল পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হচ্ছে আপনাকে, তাই না?”

“অতি সত্য কথা।”

“চিন্তার কোনো কারণ নেই মি. কাটাগিরি, সবকিছু আমার হাতে ছেড়ে দিন। আগামীকাল সকালের মধ্যে আপনার সব সমস্যা সমাধান করে ফেলব আমি। আরাম করুন আর নাকে তেল দিয়ে ঘুমান।”

পরের দিন সকালে অফিসে গিয়ে পৌঁছুতেই কাটাগিরির টেলিফোন বেজে উঠল। মি. কাটাগিরি, একটা পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এলো। তার স্বর শীতল আর ব্যবসাঘেঁষা। বলল, “আমার নাম শিরাওকা। বিগ বিয়ার কেসের একজন আইনজীবী। আপনাদের পাওনা

ঋণের অর্থের ব্যাপারে মক্কেলের কাছ থেকে ফোন-কল পেয়েছি। তিনি আমাকে আপনাদের জানাতে বলেছেন যে, তারা নির্ধারিত তারিখের মধ্যেই তাদের ঋণের অর্থ পরিশোধ করবেন। তিনি একটা মেমোরান্ডামেও সই করে দেবেন। তার একটাই অনুরোধ ভবিষ্যতে আর যেন ব্যাঙকে তার বাড়িতে পাঠান না হয়। আমি আবার বলছি, তার বাড়িতে আর যেন ব্যাঙকে পাঠান না হয়। এর অর্থ কি আমি আসলে জানি না, কিন্তু আমার বিশ্বাস বিষয়টা আপনি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন। কী ঠিক বলিনি?"

"বিলকুল ঠিক।" কাটাগিরি বললেন।

"আপনি কি দয়া করে বার্তাটি ব্যাঙকে পৌঁছে দেবেন?"

"অবশ্যই দেব। আপনার মক্কেল আর কোনো দিন ব্যাঙের দেখা পাবেন না।"

"ধন্যবাদ আপনাকে। কালই আমি মেমোরেন্ডামটি তৈরি করব।"

"আপনার এই পদক্ষেপের প্রশংসা না করে পারছি না।"

লাইন কেটে গেল।

লাঞ্চের সময় ব্যাঙ কাটাগিরির অফিসে গিয়ে হাজির হলো। বলল, "অনুমান করি বিগ বিয়ারের মামলাটি সমাধানের পথে।"

কাটাগিরি অস্বস্তি নিয়ে আশপাশে তাকালেন।

ব্যাঙ বলল, "ভাববেন না, আপনি ছাড়া কেউ আমাকে দেখতে পাবে না। আমি নিশ্চিত যে, আপনি এখন অনুভব করছেন আসলেই আমার অস্তিত্ব আছে। আমি কোনো কল্পনার ফসল নই। আমি কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সক্ষম আর ফল বয়ে আনতে পারি। আমি জীবন্ত প্রাণী।"

“আচ্ছা মি. ব্যাঙ একটা কথা কি আমাকে বলবে?”

“দয়া করে আমাকে ব্যাঙ বলবেন।”

“ঠিক আছে, ঠিক আছে, ব্যাঙ আমাকে বলো তুমি আসলে কী করেছিলে?”

“তেমন কিছু নয়,” বলল ব্যাঙ, “বাঁধা কপির কুঁড়ি সেদ্ধ করার চেয়ে বেশি জটিল কিছু নয়। আমি তাদেরকে সামান্য একটুখানি ভয় পাইয়ে দিয়েছি। একটুখানি মানসিক সন্ত্রাস বলতে পারেন। যে রকম জোসেফ কনরাড একদা লিখেছিলেন, সত্যিকার সন্ত্রাসী সেই দয়াবান লোক কল্পনার ব্যাপারে যারা সচেতন। কিছু মনে করবেন না মি. কাটাগিরি। মামলাটার ব্যাপারে বলুন আমাকে। সবকিছু ঠিক মতো এগুচ্ছে তো?”

কাটাগিরি একটা সিগারেট ধরিয়ে মাথা নাড়ালেন। বললেন, “তাই তো মনে হচ্ছে হে।”

“তাহলে কাল রাতে আপনাকে যে বলেছিলাম সে বিষয়ে আপনার আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছি আমি? কীটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমার সঙ্গে সামিল হবেন তো?”

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ থেকে চশমা খুলে ফেললেন মুখলেন কাটাগিরি। বললেন, “সত্যি কথা বলতে কী ওই বিষয়ে এত উন্মাদনা আমার নেই, তবে মনে হয় না ওইটুকুর মাধ্যমে আমি ওই ধারণা থেকে নিজেকে বাইরে আনতে পারব।”

“না,” বলল ব্যাঙ, “এটা দায়িত্ব ও সম্মানের বিষয়। ব্যাপারটাতে আপনার উন্মাদনা না-ও থাকতে পারে; কিন্তু আমাদের কিছু করবার নেই; আপনাকে আর আমাকে কীটের সঙ্গে লড়বার জন্য অবশ্যই মাটির তলায় নামতে হবে। ওটা করতে গিয়ে আমরা যদি প্রাণ হারাই, কারও সহানুভূতিও পাব না। আর যদি কীটকে আমরা হারিয়ে দেই, কোনো প্রশংসাও আমাদের কপালে জুটবে না। কেউ কোনো দিন জানবে না তাদের পায়ের তলায় কতো বড় একটা লড়াই সংঘটিত হয়েছিল। শুধু আপনি আর আমি জানব

ব্যাপারটা মি. কাটাগিরি।”

কাটাগিরি খানিকক্ষণের জন্য তার হাতের দিকে তাকালেন। দেখলেন তার সিগারেট থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। শেষে তিনি বললেন, “তুমি তো জান মি. ব্যাঙ আমি খুব সাধারণ একজন মানুষ।”

“দয়া করে আমাকে শুধু ব্যাঙ বলবেন।” কাটাগিরি তার কথায় কর্ণপাত করলেন না। বললেন, “আমি শুধু সাধারণ একটা মানুষই কেবল নই, আমি অতি তুচ্ছ মানুষ। মাথার টাক পড়ে যাচ্ছে, ভুড়ি হচ্ছে আর গেল মাসে ৪০-এ পা দিয়েছি। ডাক্তার। বলেছে, ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা আছে আমার। মাস তিনেক হলো এক মহিলা আমার সঙ্গে থাকে। তাকে টাকা-পয়সা দিতে হয়। ঋণ আদায়ে সাফল্যের জন্য কিছু স্বীকৃতি আমার ভাগ্যে জুটেছে; কিন্তু সত্যিকার সম্মান এখনও পাইনি। এমন লোক একজনও পাইনি, অফিসে কিংবা ব্যক্তিগত জীবনে যে আমাকে সত্যিকারের পছন্দ করে। মানুষের সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয় আমি জানি না। অচেনা লোকদের সঙ্গে আচরণের বেলায়ও আমি ভাল নই, কাজেই কারও সাথে বন্ধুত্বও গড়ে ওঠেনি আমার।

“কোনো খেলাও আমি জানি না, সুরকানা আমি, চোখে কম দেখি। যাচ্ছে তাই জীবন যাপন করি। খাইদাই, ঘুমাই, মলমূত্র ত্যাগ করি। জানি না কেন বেঁচে আছি। আমার মতো এমন একজন মানুষ কেন টোকিওকে বাঁচাতে যাবে?”

“কারণ, আপনার মতো একজন লোকই কেবল টোকিওকে বাঁচাতে পারে মি. কাটাগিরি। আর আপনার মতো মানুষদের জন্য আমি টোকিওকে রক্ষা করতে চাই।”

কাটাগিরি আবারও দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। এ বার আগের চেয়েও গভীর ছিল তার দীর্ঘশ্বাস। বললেন, “ঠিক আছে, কী করতে হবে বলো!”

.

ব্যাঙ তার পরিকল্পনার কথা মি. কাটাগিরিকে জানিয়ে বলল, তারা ১৭ ফেব্রুয়ারি রাতে মাটির তলায় যাবে। (ভূমিকম্পের নির্ধারিত তারিখের একদিন আগে)। টোকিও সিকিউরিটি ট্রাস্ট ব্যাংকের বেসমেন্টে অবস্থিত বয়লার রুম দিয়ে তারা নিচে যাবে। রাতে দেখা হবে তাদের (ওভারটাইম করার অজুহাতে কাটাগিরি ব্যাংক ভবনে অবস্থান করবেন)।

"লড়াইয়ের কোনো পরিকল্পনা কি তোমার মাথায় আছে ব্যাঙ?"

"অবশ্যই আছে। পরিকল্পনা ছাড়া আমাদের শত্রু ওই কীটকে কিছুতেই পরাস্ত করা যাবে না। পাতলা ছিপছিপে একটা প্রাণী সে, ওর মুখ কোথায় আর পায়ু কোথায় বোঝা মুশকিল। কমিউটার ট্রেনের মতো লম্বা।"

"যুদ্ধের পরিকল্পনাটি কী তোমার?"

খানিকক্ষণ চিন্তা করে ব্যাঙ বলল, "হুম, একটা কথা আছে না- নীরবতাই সর্বোৎকৃষ্ট পথ!"

"তার মানে তুমি বলতে চাও এ সম্পর্কে আমি তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করব না?"

"সাহসের সঙ্গে কোনো কিছু গ্রহণ করার এটাও একটা পথ।"

"শেষ মুহূর্তে আমি যদি ভয় পেয়ে পালিয়ে যাই তখন তুমি কী করবে মি. ব্যাঙ?"

"শুধু ব্যাঙ বলুন।"

"ঠিক আছে ব্যাঙ বলো তখন কী করবে?"

কিছুক্ষণ চিন্তা করে ব্যাঙ বলল, "আমি একাই লড়াই করব। নিজে তাকে মারার সুযোগ

গ্রহণ সেই চলমান ইঞ্জিনটাকে আঘাত করার অ্যানাকারনিনার সুযোগের চেয়ে হয়ত সামান্য একটু বেশি হবে। আপনি অ্যানাকারনিনা পড়েছেন মি. কাটাগিরি?"

ব্যাঙ যখন শুনল তিনি অ্যানাকারনিনা পড়েননি, সে তখন মি. কাটাগিরির দিকে এমনভাবে তাকাল, যেন সে বলতে চায়- কী লজ্জার কথা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হলো ব্যাঙ অ্যানাকারনিনার একজন ভক্ত।

"তারপরও মি. কাটাগিরি আমি বলব, আমার বিশ্বাস আপনি আমাকে একা লড়াই করতে পাঠাবেন না।"

.

অপ্রত্যাশিত ব্যাপার সব সময়ই ঘটে।

১৭ ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যায় কাটাগিরি গুলিবিদ্ধ হলেন। শিনজুকু স্ট্রিট দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় এক যুবক লাফ দিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়ায়। তার চেহারা ছিল বৈচিত্র্যহীন। এক হাতে ধরা ছিল ছোট কালো একটা রিভলভার। ওটা এত ছোট ছিল যে দেখে আসল বলে মনে হচ্ছিল না। কাটাগিরি জিনিসটার প্রতি একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন; কিন্তু তিনি বুঝতেই পারেননি ওটি তার দিকে তাক করা আর লোকটি ট্রিগার টিপছিল। খুব দ্রুত ঘটে গেল ব্যাপারটা তার কাছে এর কোনো অর্থই ছিল না। তবে রিভলবার থেকে গুলি বেরিয়েছিল।

কাটাগিরি রিভলবারের নলের নড়াচড়া প্রত্যক্ষ করেছিলেন, আর একই সময় তার ডান কাঁধে ভারি একটা হাতুড়ির আঘাত অনুভব করেছিলেন। ব্যথা পাননি তিনি তবে ওই আঘাতের কারণে ফুটপাতের ওপর ছিটকে পড়ে গিয়েছিলেন। হাতের ব্রিফকেসটি উড়ে অন্যদিকে চলে গিয়েছিল তখন। লোকটি তার দিকে রিভলবার তাক করে রেখেছিল, দ্বিতীয় একটি গুলি ফুটেছিল। ফুটপাতের পাশে একটা খাবারের দোকানের সাইনবোর্ড

তার চোখের সামনেই বিধ্বস্ত হয়েছিল। লোকজনের চিৎকারের শব্দ গিয়েছিল তার কানে। তার চশমা ছিটকে পড়ে গিয়েছিল বলে সবকিছু আবছা দেখেছিলেন তিনি। খুব অস্পষ্টভাবে তিনি দেখেছিলেন, রিভলবার তাক করে লোকটি এগিয়ে আসছে তার দিকে। তিনি ভেবেছিলেন, মৃত্যু অবধারিত। ব্যাঙ ঠিকই বলেছিল, সত্যিকার সন্ত্রাসী সেই দয়াবান লোক কল্পনার ব্যাপারে যে সচেতন।

কাটাগিরি তার কল্পনার সুইচ অফ করে দিয়ে নির্ভার নীরবতার ভেতর ডুবে গেলেন।

জেগে উঠে দেখলেন তিনি বিছানায় শুয়ে। এক চোখ খুললেন আর চারদিকের পরিবেশ পর্যবেক্ষণের জন্য খুললেন আর এক চোখ। প্রথমেই তার দৃষ্টির সীমায় এলো একটি ধাতব স্ট্যান্ড ও শিরার ভেতর দিয়ে খাওয়ানোর নল। তারপরই চোখে পড়ল সাদা পোশাকের নার্স। তিনি অনুভব করলেন বিছানার ওপর তিনি চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন, তার পরনে অদ্ভুত রকমের পোশাক।

ও হ্যাঁ, ভাবলেন তিনি ফুটপাত ধরে হাঁটবার সময় কেউ একজন তার ওপর গুলি চালায়। সম্ভবত তার কাঁধে লাগে গুলিটি। মনের চোখে দৃশ্যটি দেখতে পান তিনি। বেজন্মারা আমাকে মারার চেষ্টা করছিল। আমার স্মৃতিশক্তি ঠিক আছে। শরীরের কোথাও কোনো ব্যথা নেই। শুধু ব্যথা নয়, কোনো অনুভূতিই নেই। হাত ওঠাতে পারছি না আমি...।

হাসপাতালের এই রুমটির কোনো জানালা নেই। তখন দিন না রাত বুঝতে পারলেন না তিনি। বিকেল পাঁচটার কিছু আগে গুলি চালানো হয়েছে তার ওপর। তখন থেকে কতটা সময় পার হয়েছে? ব্যাঙের সঙ্গে দেখা করার সময় কি পার হয়ে গেছে? তিনি ঘড়ির সন্ধান করলেন; কিন্তু চশমা না থাকায় কিছুই দৃষ্টিগোচর হলো না তার।

“হেই সিস্টার।” নার্সকে ডাকলেন কাটাগিরি।

নার্স বলল, “যাক শেষ পর্যন্ত ঘুম ভেঙেছে আপনার।”

“ক’টা বাজে এখন?”

নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নার্স বলল, “নটা পনের।”

“রাত?”

“আরে না সকাল।”

বালিশ থেকে মাথাটা একটুখানি তুলে কাটাগিরি গোঙানির স্বরে বললেন, “সকাল সোয়া নটা।” অতঃপর গলা থেকে যে স্বর বেরুল তা শুনতে এ রকম- সকাল সোয়া ন’টা, তারিখ ১৮ ফেব্রুয়ারি?

নার্স আবার তার ডিজিটাল ঘড়ি পর্যবেক্ষণ করে বলল, “ঠিক তাই, আজ ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫।”

“আজ সকালে কি টোকিওতে বড় ধরনের কোনো ভূকম্পন হয়েছে?”

“টোকিওতে?”

“হ্যাঁ, টোকিওতে।”

নার্স তার মাথা নাড়িয়ে বলল, “আমার জানা মতে কোনো ভূমিকম্প হয়নি।”

প্রশান্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি ভাবলেন, শেষতক ভূমিকম্পটা বন্ধ করা গেছে।

“আমার শরীরের ক্ষতের কী অবস্থা?”

“আপনার শরীরের ক্ষত?”

“হ্যাঁ, যে জায়গায় গুলি লেগেছিল।”

“গুলি?”

“হ্যাঁ, ট্রাস্ট ব্যাংকে ঢোকার মুখে কেউ একজন গুলি করেছিল আমাকে। আমার ধারণা ডান কাঁধে।”

তার দিকে তাকিয়ে নার্স নার্ভাস হাসল। বলল, “আমি দুঃখিত মি. কাটাগিরি, আপনার তো কোনো গুলি-ই লাগেনি।”

“গুলি লাগেনি? আপনি নিশ্চিত?”

“আজ যে ভূমিকম্প হয়নি এ ব্যাপারে যেমন নিশ্চিত তেমনি,...”

কাটাগিরি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বললেন, “তাহলে হাসপাতালে শুয়ে আছি কেন আমি?”

“অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তার ওপর থেকে উদ্ধার করা হয় আপনাকে। বাইরে কোনো ক্ষত বা আঘাতের চিহ্ন নেই আপনার শরীরে। আপনার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কেন আমরা বুঝতে পারিনি। শিগগিরই ডাক্তার আসবেন। ওনাকে জিজ্ঞেস করে নেবেন।”

“অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন, গতকাল সন্ধ্যার আগে থেকে আমি অচেতন অবস্থায় হাসপাতালের বিছানায় পড়ে আছি তাই না?”

“ঠিক তাই। রাতটা খুব খারাপ গেছে আপনার মি. কাটাগিরি। ভয়াবহ রকমের দুঃস্বপ্ন হয়ত আপনি দেখেছেন। আপনাকে আমি- ব্যাঙ, এ্যাই ব্যাঙ বলে ডাকতে শুনেছি। বেশ

কয়েকবারই আপনি ডেকেছেন ও ভাবে। ডাক নাম ব্যাঙ এ রকম কোনো বন্ধু আছে নাকি আপনার?”

কাটাগিরি চোখ বন্ধ করলেন আর ধীরে ধীরে বয়ে চলা নাড়ির স্পন্দন শুনতে পেলেন। যা স্মরণ করতে পারলেন তার কতটুকু সত্য আর কতটুকু হ্যাঁলুসিনেশন? সত্যিই কী ব্যাঙের অস্তিত্ব আছে, আর ভূমিকম্প ঠেকাতে সে কীটের সঙ্গে লড়াই করেছে? নাকি ওটা তার স্বপ্নেরই একটা অংশ?

.

রাতের দিকে ব্যাঙ হাসপাতালে এসে হাজির হলো। মৃদুমন্দ আলোয় কাটাগিরি তাকে একটা স্টিলের চেয়ারের ওপর বসা অবস্থায় আবিষ্কার করলেন।

“ও হে ব্যাঙ।” ডাকলেন কাটাগিরি। কুতকুত করে তাকাল ব্যাঙ। কাটাগিরি বললেন, “কথামতো আমি রাতে বয়লার রুমে দেখা করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু সন্ধ্যায় অপ্রত্যাশিত ভাবে দুর্ঘটনার কবলে পড়ি আমি... তারপর এই হাসপাতালে।”

ব্যাঙ মাথাটা একটুখানি ঝকিয়ে বলল, “ঠিক আছে, চিন্তা করবেন না, সবই আমি জানি। ওই লড়াইয়ে আপনি ছিলেন আমার বড় সহায়।”

“আমি?”

“হ্যাঁ, আপনি। স্বপ্নের ভেতর আপনি একটা বড় কাজ করেছেন। যার ফলে কীটের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব হয়েছে আমার পক্ষে। আমার জয়ের জন্য আপনাকে আমার ধন্যবাদ জানান উচিত।”

“তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না, কাটাগিরি বললেন, “সারাক্ষণ আমি অচেতন

অবস্থায় ছিলাম। ওরা আমার শিরায় সুই ঢুকিয়ে তার মাধ্যমে তরল খাবার খাওয়াচ্ছিল। স্বপ্নে কিছু করেছি বলে তো মনে পড়ছে না আমার।"

"খুব ভাল কথা মি. কাটাগিরি। আপনার যে কিছু মনে নেই সেটাই ভাল। দুর্ধর্ষ সেই লড়াইয়ের পুরোটাই ঘটেছে স্বপ্নে। ওটাই ছিল আমাদের যুদ্ধক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত স্থান। ওখানেই আমরা আমাদের জয়-পরাজয়ের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করেছি। আমরা সবাই একটা সীমিত ব্যাপ্তিকাল নিয়ে এই পৃথিবীতে এসেছি। আমাদের সবার পরিণতি পরাজয়ে। কিন্তু আর্নেস্ট হেমিংওয়ে পরিষ্কারভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন, আমাদের জীবনের চূড়ান্ত মূল্য আমরা কীভাবে জয়ী হয়েছি তা দিয়ে নির্ধারিত হয় না বরং তা ধার্য হয় কীভাবে আমরা পরাজিত হয়েছি তা দিয়ে। আপনি আর আমি মিলে টোকিওকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছি। দেড় লক্ষ লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছি আমরা। কেউ তা বুঝতে পারেনি।"

"কীটকে পরাস্ত করলে কী করে তুমি? আর আমার ভূমিকা-ই বা কী ছিল?"

"একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা আমাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছি। আমরা..." ব্যাঙ একটুখানি থামল, নিঃশ্বাস নিল তারপর বলল, "আমাদের হাতে যে অস্ত্র ছিল তা-ই আমরা ব্যবহার করেছি। সাহসের সর্বোচ্চ প্রয়োগ করেছি। অন্ধকার ছিল আমাদের শত্রুর বন্ধু। পদ-শক্তি চালিত একটা জেনারেটর এনেছিলেন আপনি আর জায়গাটাকে আলোকিত রাখতে আপনার সবটুকু শক্তি ঢেলে দিয়েছিলেন। অন্ধকারের মায়ামূর্তি দিয়ে কীট ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছিল আপনাকে; কিন্তু আপনি দৃঢ় পায়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

"ভয়াবহ সেই লড়াইয়ে অন্ধকার আলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়েছিল আর আমি আলোর ভেতর কীটকে প্রবলভাবে জাপটে ধরেছিলাম। ও তার পিচ্ছিল-কর্দমাক্ত শরীর দিয়ে আমাকে পেঁচিয়ে ধরেছিল। আমি ওকে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলেছিলাম; কিন্তু তখনও মরেনি ও। নিজেকে ও ছোট ছোট খণ্ডে পরিণত করে আর তখন..."

ব্যাঙ কোনো কথা বলল না। তারপর শেষ শক্তিটুকু সঞ্চয় করে আবার শুরু করল, "ঈশ্বর যাদের পরিত্যাগ করেছিলেন ফিওদোর দস্তয়েভস্কি তাঁর পরম মমতা দিয়ে তাদের চরিত্র চিত্রণ করেছিলেন। ভয়ঙ্কর স্ববিরোধের মধ্যেও তিনি মানব অস্তিত্বের চমৎকার গুণাবলী আবিষ্কার করেছিলেন যার দ্বারা যে সব মানুষ ঈশ্বরকে আবিষ্কার করেছিলেন তারাই স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। অন্ধকারে কীটের সঙ্গে লড়াই করার সময় মনে হয়েছিল আমি দস্তয়েভস্কির 'হোয়াইট নাইটস'এর কথা ভাবছি।" মনে হলো ব্যাঙের কথা বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। "মি. কাটাগিরি আমি একটুখানি ঘুমিয়ে নিলে আপনি কি কিছু মনে করবেন? ভীষণ ক্লান্ত আমি।"

"ও হে ব্যাঙ," বললেন মি. কাটাগিরি, "ভাল করে ঘুমিয়ে নাও।"

চোখ বন্ধ করে ব্যাঙ বলল, "শেষ পর্যন্ত কীটকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়েছিলাম। আমি। তবে ভূমিকম্প থামাতে সক্ষম হয়েছিলাম। লড়াইটাকে অমীমাংসিত পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি ওকে আহত করেছিলাম, সে ও আমাকে আহত করেছিল। তবে সত্যি কথাটি কী জানেন মি. কাটাগিরি..."

"কি, ব্যাঙ?"

"আমি খাঁটি ব্যাঙ সন্দেহ নেই তাতে, একই সাথে আমি এমন এক জিনিস যার নাম গিয়ে দাঁড়ায় অ-ব্যাঙ।"

"তোমার এই কথাটিও আমার বোধগম্য হলো না ব্যাঙ।"

"আমার নিজেরও বোধগম্য নয়," বলল ব্যাঙ। তার চোখ তখনও বন্ধ, "এটা সামান্য একটু অনুভূতির মতো ব্যাপার। আপনি সচক্ষে যা দেখেন তা যে সব সময় সত্য হবে তা কিন্তু নয়। অন্যান্য জিনিসের মতো আমার শত্রু আমার নিজের ভেতরকার আমি। আমার ভেতরে এক না- আমি বসবাস করে। ঘোর অন্ধকার আমার মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে

ফেলেছে। ইঞ্জিন আসছে ধেয়ে। কিন্তু মি. কাটাগিরি আমি কী বলছি তা আমি সত্যিই বুঝতে চাই।”

“তুমি এখন ভীষণ ক্লান্ত ব্যাঙ। ঘুমিয়ে পড়। ভাল লাগবে।”

“ঘোর অন্ধকারের ভেতর ঢুকে পড়ছি মি. কাটাগিরি। তারপরও...আমি...”

কথা বলার শক্তি হারিয়ে গভীর আচ্ছন্নতার ভেতর ডুবে গেল ব্যাঙ। তার বাহু ঝুলে রইল মেঝের ওপর, বিশাল মুখটি খোলা। ভাল করে তার দিকে তাকিয়ে কাটাগিরি দেখলেন, ব্যাঙের সারা শরীরে ক্ষতচিহ্ন। চামড়ার ওপর বিবর্ণ ডোরাকাটা দাগ। মাথার ওপর গভীর একটি দাগ যেখানে মাংস বেরিয়ে পড়েছে।

কাটাগিরি দীর্ঘক্ষণ ধরে কঠিন দৃষ্টিতে ব্যাঙের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সে এখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই আমি অ্যানাকারনিনা আর হোয়াইট নাইটস বই দুটো কিনব আর পড়ব। তারপর ব্যাঙের সঙ্গে দীর্ঘ সাহিত্য আলোচনায় মাতা যাবে। ভাবলেন কাটাগিরি।

অনেকক্ষণ ধরেই কেঁপে কেঁপে উঠছিল ব্যাঙ। কাটাগিরি প্রথমটায় ভেবেছিলেন এটা ঘুমের মধ্যেকার স্বাভাবিক নড়চড়া, কিন্তু শিগগিরই ভুল ভাঙল তার। অস্বাভাবিকভাবে ব্যাঙের সারা শরীর প্রকম্পিত হচ্ছিল, যেন বড় কোনো পুতুলকে পেছন থেকে কেউ নাড়াচ্ছে। কাটাগিরি নিশ্বাস বন্ধ করে তাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। তিনি দ্রুত ব্যাঙের কাছে ছুটে যেতে চাইলেন, কিন্তু তার সারা শরীর অবশ হয়ে গেছে।

একটু পরে ব্যাঙের ডান চোখে বড় একটা দলার মতো তৈরি হলো। অতঃপর তার কাঁধে আর সারা শরীরে সৃষ্টি হলো একই ধরনের বড় বড় ফোঁড়া। কাটাগিরি বুঝতে পারলেন না ব্যাঙের এমন দশা হচ্ছে কেন। চশমার ভেতর দিয়ে তাকালেন, নিশ্বাস নিতে পারছেন না তিনি।

তারপর হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে একটা ফোঁড়া বিস্ফোরিত হলো। চামড়া ছিঁড়ে বেরুল আর তারপর আঠালো তরল পদার্থ নির্গত হলো ধীরে ধীরে। তা থেকে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ বেরিয়ে গোটা ঘরটাতে ছড়িয়ে পড়ল। এ রকম পঁচিশ-তিরিশটি ফোঁড়া বিস্ফোরিত হলো। দুর্গন্ধ-তরলে ভরে গেল ঘরের দেয়াল। অসহ্য দুর্গন্ধ ছেয়ে গেল হাসপাতালের কক্ষটি। ব্যাঙের শরীরের ফোঁড়ার জায়গাগুলিতে সৃষ্টি হয়েছে বড় বড় কালো গর্ত আর তা থেকে শূককীট জাতীয় নানা আকারের পোকা বেরিয়ে আসতে লাগল। তাদের শরীর থেকেও বেরুচ্ছিল এক ধরনের গন্ধ। বহু পা অলা এই কীটদের পদচারণায় ঘরের ভেতর গা ছমছম করা খসখসে শব্দ সৃষ্টি হলো। স্রোতের মতো কীটগুলো বেরিয়ে আসছিল ব্যাঙের শরীরের গর্ত থেকে। ব্যাঙের সারা শরীর এখন কীটে আচ্ছন্ন। ওর শরীর থেকে খসে পড়া দুটি চোখের মণি কালো কালো ছারপোকারা তাদের ধারালো দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে। কীটেরা পৌঁছে গেছে ঘরের ছাদ অবধি, বাল্বগুলোকে ঢেকে ফেলেছে তারা।

সারা মেঝে ছেয়ে গেছে কীট আর ছারপোকায়। কাটাগিরির বিছানার ওপরেও উঠে পড়েছে তারা। তারা চাঁদরের নিচ দিয়ে তার পা, হাঁটুর ওপর দিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। ক্ষুদ্র কীটগুলো তার পায়ু, কান আর নাকের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে। পাঅলা কীটগুলো ঢুকে পড়েছে তার মুখের ভেতর। প্রচণ্ড অবসাদ আর নৈরাশ্যের ভেতর থেকে কাটাগিরি চিৎকার করে উঠলেন।

কেউ একজন সুইচ অন করলে সারাঘর আলোয় ভরে গেল।

“মি. কাটাগিরি!” ডাকে নার্স। আলোর দিকে চোখ মেলে তিনি তাকান। তার সারা গা ঘামে ভেজা। ছারপোকা আর কীটেরা চলে গেছে। তারা রেখে গেছে ভয়ঙ্কর ক্ষীণ এক অনুভূতি।

“আবার দুঃস্বপ্ন! আহারে বেচারা।” একটা ইঞ্জেকশন রেডি করতে করতে বলল নার্স।

বড় একটা শ্বাস নিয়ে ধীরে ধীরে ছাড়লেন কাটাগিরি। দ্রুত নিশ্বাস পড়ছিল তার।

“স্বপ্নে কী দেখেন?”

স্বপ্ন আর বাস্তবকে পৃথক করতে কষ্ট হচ্ছিল তার। তিনি নিজেই জোরে জোরে বললেন, “তুমি যা সচক্ষে দেখ সব সময় তা সত্য না-ও হতে পারে।”

“তা অবশ্য ঠিক,” হেসে বলল নার্স, “বিশেষ করে ওইসব স্বপ্নের কথা যখন আসে।”

“ব্যাঙ।” চিৎকার করে বললেন কাটাগিরি।

“ব্যাঙের কী কিছু হয়েছে?” জিজ্ঞেস করল নার্স।

ভূমিকম্পের কবল থেকে টোকিও শহরকে রক্ষা করেছে সে একা।” প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া একটা ইন্ট্রাভেনাস ফিডিং বটল সরিয়ে নতুন একটা রাখতে রাখতে না বলল, “চমৎকার ব্যাপার তো। আমরা চাই না টোকিও শহরে আর এ রকম ভয়ানক ঘটনা ঘটুক। অনেক তো হয়েছে।”

“কিন্তু এ কারণে জীবন দিতে হয়েছে তাকে। আমার ধারণা অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে সে। আর সে এখানে আসবে না...।”

একটুখানি মুচকি হেসে নার্স তার কপালের ঘাম মুছিয়ে দিল।

“ব্যাঙ আপনার খুব প্রিয়, তাই না মি. কাটাগিরি?”

“রেল ইঞ্জিন, বিড়বিড় করে বললেন মি. কাটাগিরি, “কারও চেয়ে কম নয়।”

তিনি চোখ বন্ধ করলেন এবং প্রশান্ত, স্বপ্নহীন নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

মানুষ-খেকো বিড়াল

মানুষ-খেকো বিড়াল

বন্দর থেকে একটা খবরের কাগজ কিনেছিলাম। ওখানে এক বৃদ্ধ মহিলা সম্পর্কে একটা নিবন্ধ পড়েছিলাম যাকে বিড়ালেরা খেয়ে ফেলেছিল। বৃদ্ধার বয়স ছিল ৭০ বছর। এথেন্সের একটা ছোট্ট শহরতলীতে থাকতেন তিনি। খুব সাদাসিধে ছিল তার জীবনযাত্রা। একটা অ্যাপার্টমেন্টের ছোট্ট একটা ঘরে ছিল তার বাস। তিনটি বিড়াল ছাড়া তার সংসারে আর কেউ ছিল না। একদিন হঠাৎ তিনি সোফার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে যান। সম্ভবত হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। পড়ে যাওয়ার কতক্ষণ পর তার মৃত্যু হয়েছিল কেউ বলতে পারেনি। বৃদ্ধার আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যারা নিয়মিত তার ওখানে যাতায়াত করত। ফলে তার মৃতদেহ উদ্ধার করতে সপ্তাহখানেক লেগে যায়। দরজা-জানালা বন্ধ থাকায় বিড়ালগুলো ওই ঘরে আটকা পড়ে। সেখানে খাবার-দাবার কিছু ছিল না। ফ্রিজের ভেতর হয়ত খাদ্যবস্তু কিছু ছিল; কিন্তু বিড়ালেরা ফ্রিজ খোলার কোনো উপায় উদ্ভাবন করতে পারেনি। না খেয়ে মরবার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য বাধ্য হয়ে তারা তাদের মৃত মালকিনের মাংস ভক্ষণ করে।

আমার অদূরে বসে থাকা ইজুমিকে নিবন্ধটা পড়ে শোনাচ্ছিলাম। রোদেলা দিনগুলোতে

আমরা বন্দর থেকে এথেন্সের ইংরেজি দৈনিকের একটা কপি কিনি। ট্যাক্স-অফিসের পাশের কফিশপে কফির অর্ডার দেই। তারপর জাপানি ভাষায় চমকপ্রদ বিষয়গুলোর একটা সারসংক্ষেপ দাঁড় করাই। দ্বীপ-জীবনে এটা আমাদের নিত্যদিনের কাজের একটা অংশ। বিশেষ কোনো নিবন্ধের ওপর আমাদের আগ্রহ থাকলে তা নিয়ে আমরা মত বিনিময় করি। ইংরেজির ওপর ইজুমির দখল বেশ ভাল। নিজে নিজেই সব কিছু পড়তে পারে; কিন্তু তাকে একা কখনো পত্রিকা পড়তে দেখিনি।

"আমি সব সময়ই চেয়েছি কেউ একজন আমাকে পত্রিকা পড়ে শোনাক।" বলে ইজুমি, "ছোটবেলা থেকে আমার স্বপ্ন ছিল রোদে বসব, আকাশ কিংবা সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকব আর তখন কেউ আমাকে জোরে জোরে পড়ে শোনাবে, হতে পারে তা খবরের কাগজ, পাঠ্যবই কিংবা উপন্যাস। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেউ তা করেনি। কাজেই অতীতে হারানো ওই সুযোগের সবটা এখন তুমি আমাকে পুষিয়ে দেবে। তাছাড়া তোমার কণ্ঠস্বরও আমার খুব প্রিয়।"

আকাশ আর সমুদ্র আমাদের কাছেই ছিল। অতএব দেরি না করে আমি জোরে। জোরে পড়ার মজা উপভোগ করতে লাগলাম। জাপানে থাকার সময় আমার ছেলেকে প্রায়ই জোরে জোরে ছবির বই পড়ে শোনাতাম। বাক্যগুলোতে নিছক চোখ বুলিয়ে যাওয়া থেকে উচ্চস্বরে পাঠ করার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা একটা বিষয়। আপনার মনের মধ্যে অপ্রত্যাশিত একটা কিছু উছলে উঠবে, অব্যাখ্যাত এক ধরনের সাড়া আমি অনুভব করেছিলাম যা রোধ করা অসম্ভব ছিল আমার পক্ষে।

তেতো কফিতে চুমুক দিতে দিতে নিবন্ধটা পড়ে শোনাচ্ছিলাম তাকে। নিজে নিজে কয়েকটা লাইন পড়ে জাপানিতে তা কিভাবে প্রকাশ করব তা ভেবে উচ্চস্বরে অনুবাদ করছিলাম। আমাদের আগের কোনো অতিথির ফেলে যাওয়া জ্যাম টেবিলের ওপর থেকে মুখে তুলে নেয়ার জন্য কয়েকটা মৌমাছি আনাগোনা করছিল ওখানে। পুরো

নিবন্ধটা পড়া শেষ হয়ে গেলে টেবিলে কনুই রেখে ইজুমি ঠায় বসে রইল। দু'হাতের আঙ্গুলগুলো জড়াজড়ি করে ঢুকিয়ে তাঁবুর একটা আদল তৈরি করে জিজ্ঞেস করল, তারপর কী হলো। পত্রিকাটি ভাজ করতে করতে বললাম, "তারপর আর। কি।"

"বিড়ালগুলোর কী হলো?"

"কাগজে কিছু লেখেনি।"

"দুনিয়ার সব জায়গার কাগজ একই ধরনের। যা তুমি জানতে চাও তা লিখবে না কখনো।"

ইজুমি সালেম সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে খুঁজে ম্যাচ জ্বালাল। রোজ সে এক প্যাকেট সালেম খায়- কমও না বেশিও না। আমি ধূমপান করি না। স্ত্রী গর্ভবতী থাকার সময় আমাকে সিগারেট ছাড়িয়ে দিয়েছিল সে।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ইজুমি বলল, "যা আমি জানতে চাই তা হলো, পরে বিড়ালগুলোর কী হয়েছিল? নরমাংস ভক্ষণের দায়ে কর্তৃপক্ষ কি ওদের মেরে ফেলেছিল, নাকি- বড় দুঃসময় গেছে তোদের এ কথা বলে একটুখানি আদর করে বিদায় দিয়েছিল? তোমার কী ধারণা?"

টেবিলের ওপর গুঞ্জরনরত মৌমাছিগুলোর দিকে তাকালাম। মুহূর্তের জন্য মনে হলো, টেবিলের ওপর থেকে মৌমাছিদের জ্যাম তুলে খাওয়া আর বিড়ালদের নরমাংস ভক্ষণ একই ব্যাপার। দুর থেকে ভেসে আসা শঙ্খচিলের কর্কশ চিৎকার মৌমাছির গুঞ্জনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। কয়েক সেকেন্ডের জন্য আমার চৈতন্য বাস্তব আর অবাস্তবের প্রান্তসীমায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। মনে হলো, কোথায় ছিলাম আমি? এখানেই বা কী করছি? অবস্থাটা ঠিক অনুধাবন করতে পারলাম না। দীর্ঘ একটা শ্বাস নিলাম। আকাশের দিকে তাকালাম, তারপর ইজুমির দিকে ফিরে বললাম, "ওই ব্যাপারে আসলে

আমার কোনো ধারণাই নেই।”

“ব্যাপারটা নিয়ে ভাবো একবার। তুমি যদি নগরীর মেয়র কিংবা পুলিশ প্রধান হতে, তাহলে বিড়ালগুলোর ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নিতে?”

আমি বললাম, “সংশোধনের জন্য তাদের কোনো প্রতিষ্ঠানে পাঠানো যেত হয়ত, যাতে তারা নিরামিষভোজীতে পরিণত হতে পারে।” আমার কথায় হাসল না ইজুমি, সিগারেট দীর্ঘ টান দিয়ে ধীরে ধীরে ধোয়া ছাড়তে লাগল।

“গল্পটা আমাকে একটা লেকচারের কথা মনে পড়িয়ে দিল। ক্যাথলিক জুনিয়র হাই স্কুলে ক্লাস শুরু করার ঠিক আগে গল্পটা শুনেছিলাম। তোমাকে বলেছিলাম নাকি একটা কড়া ক্যাথলিক স্কুলে পড়তে হয়েছিল আমাকে? প্রবেশিকা পরীক্ষার ঠিক পরে প্রধান শিক্ষয়িত্রী আমাদের সবাইকে ডেকে জড়ো করলেন, তারপর মঞ্চে গিয়ে ক্যাথলিক ধর্মের ওপর বিরাট এক বক্তৃতা ঝাড়লেন। অনেক কথাই তিনি বলেছিলেন; কিন্তু একটা কথাই আমার মনে আছে তা হলো জাহাজডুবির পর একটা বিড়াল নিয়ে দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ।” বলল ইজুমি।

“মনে হয় খুব ইন্টারেস্টিং ছিল ব্যাপারটা।” আমি বললাম। সে বলল, “তিনি আমাদের বললেন, “জাহাজডুবি হয়েছে। লাইফবোটে শুধু তুমি আর তোমার বিড়াল। একটা অজানা দ্বীপে এসে আশ্রয় নিয়েছ তোমরা। ওখানে কোনো খাবার দাবার নেই। শুধু পানি আর একজনের দিন দশেক চলার মতো শুকনো বিস্কুট। অবস্থার কথাটা ভাবো সবাই একবার। চোখ বন্ধ করে ছবিটা একবার কল্পনা কর। দ্বীপে আর কেউ নেই, তুমি আর তোমার বিড়াল। তোমার খাবার প্রায় শেষ। খুব ক্ষুধার্ত তুমি, তৃষ্ণার্ত, প্রায় মরার দশা হয়েছে তোমার। তখন কী করবে তুমি। তোমার শেষ খাবারটুকু থেকে কি বিড়ালটিকে একটু দেবে? না, ঠিক হবে না তা। কিছুতেই দেবে না তুমি। দেওয়াটা মস্ত বড় ভুল কাজ হবে : কারণ তোমরা প্রাণী হিসেবে অনেক মূল্যবান, ঈশ্বর-ই এটা

নির্ধারণ করেছেন। বিড়াল কিন্তু সেরকম না। কাজেই সব খাবার একাই তুমি খাবে।” এ কথা বলে শিক্ষয়িত্রী আমাদের দিকে কঠিন চোখে তাকালেন। আমি খানিকটা দুঃখ পেলাম। সবে স্কুলে পড়তে এসেছে। এমন শিশুদের এ ধরনের গল্প বলার কী কারণ থাকতে পারে? মনে মনে ভাবলাম। এ কেমন জায়গায় এসে পড়েছি আমি?

গ্রিসের একটি ছোট্ট দ্বীপে একটা অ্যাপার্টমেন্টে আমি আর ইজুমি থাকি। তখন ট্যুরিস্টদের মৌসুম ছিল না আর ওই জায়গাটা কোনো ট্যুরিস্ট স্পট নয় বলে ভাড়াও কম। ওখানে যাওয়ার আগে আমরা কেউ-ই ওই জায়গার নাম শুনিনি। এলাকাটি তুর্কি সীমান্তের কাছাকাছি। আকাশ পরিষ্কার থাকলে এখান থেকে তুরস্কের সবুজ পাহাড় দেখা যায়। খুব বাতাস থাকলে স্থানীয় লোকজন ঠাট্টা করে বলে শিশ কাবাবের ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে।

শহরের কেন্দ্রস্থলে গ্রিক স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বীরের ভাস্কর্য আছে। ইজুমি আর আমি ক্যাফের বাইরে বসে কফি কিংবা বিয়ার পান করার সময় উদ্দেশ্যহীনভাবে বন্দরের নৌকা আর দূরের তুর্কি পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকি। জায়গাটা ইউরোপের এক কোণায় অবস্থিত।

মাস দুয়েক আগেও আমি স্ত্রী ও পুত্রসহ টোকিওর উনোকিতে থাকতাম। খুব বড় সড়ড়া জায়গা নয়, তবে কাজ চালিয়ে নেয়া যেত। আমার ও আমার স্ত্রীর আলাদা। শোবার ঘর ছিল। ছেলেটার জন্যও একটা রুম ছিল। আর একটা রুম আমি স্টাডি হিসেবে ব্যবহার করতাম। অ্যাপার্টমেন্টটা ছিল কোলাহলহীন আর ওখান থেকে চমৎকার দৃশ্যও দেখা যেত। সপ্তাহান্তে আমরা তিনজনে মিলে তামা নদীর ধারে ঘুরে বেড়াতাম। বসন্তে নদীর তীরে চেরি ফুল ফুটত। আমি আমার ছেলেকে মোটর বাইকের পেছনে বসিয়ে টোকিও জায়ান্টস ট্রিপল এ টিমের বসন্তকালিন প্রশিক্ষণ দেখিয়ে আনতাম।

মধ্যম মানের একটা ডিজাইন কোম্পানিতে কাজ করতাম আমি। বই আর ম্যাগাজিনের

লে-আউট তৈরিতে বিশেষজ্ঞ ছিল ওরা। আমার বস ছিলেন খুব ভাল লোক। সহকর্মীদের সাথে আমার সম্পর্কও ভাল ছিল। বেতন খারাপ ছিল না। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ওই কোম্পানিতে ভবিষ্যত ভালই ছিল আমার। আর আমার জীবনটা মোলদাও নদীর মতো দ্রুত বয়ে যেত সমুদ্রের দিকে...।

কিন্তু আমার সঙ্গে ইজুমির দেখা হয়ে গেল।

.

ইজুমি আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট। ব্যবসা সংক্রান্ত একটা সভায় তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল। প্রথম চোখাচোখির সময়ই সম্ভবত প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম আমরা। সচরাচর এ ধরনের ঘটনা ঘটে না। তারপর আমাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয় বেশ কয়েকবার। তখন আমাদের যৌথ-প্রকল্প নিয়ে আলাপ হয় তার সাথে। আমি তার অফিসে যেতাম, সে-ও আসত আমার অফিসে। আমাদের দেখা-সাক্ষাগুলো হতো অল্প সময়ের জন্য, সেখানে অন্য লোকজনও এসে পড়ত আমাদের মধ্যে। সবই ছিল ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপার।

আমাদের প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে গেলে সাংঘাতিক রকমের নিঃসঙ্গতার ভেতর পড়ে যাই আমি। মনে হতো জীবনের জন্য অত্যাবশ্যক অনেক কিছু আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। গত দশ বছরে এ রকম অনুভূতি আমার মধ্যে সৃষ্টি হয়নি। আমার ধারণা ওর-ও তেমনি হয়েছিল।

সপ্তাহখানেক পরে সে আমাকে ফোনে তার অফিসে ডাকে। আমরা কিছুটা সময় আড্ডা দেই। আমি একটা জোক বললে সে হাসে। আমি বলি, “চলো কোথাও গিয়ে একটা কিছু পান করি। আমরা ছোট একটা বার-এ গিয়ে ঢুকি ও সামান্য পান করি। ঠিক মনে নেই কী নিয়ে আমাদের মধ্যে কথা হয়েছিল, তবে লক্ষ লক্ষ বিষয় আমরা খুঁজে

পেয়েছিলাম যা নিয়ে আমরা সারাজীবন কথা বলতে পারি। আমরা দুজনেই ছিলাম বিবাহিত। বিবাহিত জীবন নিয়ে কারও কোনো গুরুতর অভিযোগ ছিল না। আমরা আমাদের পতি/পত্নীদের ভালবাসতাম ও শ্রদ্ধা করতাম।

কিছু একটা পান করার জন্য আমরা নিয়মিত বাইরে যেতে শুরু করলাম। চাকরির কারণে তার স্বামী দেরিতে বাড়ি ফিরতেন, ফলে যে কোনো সময় আসতে ও ফিরে যেতে পারতাম। আমাদের দেখা হলে সময় দ্রুত পার হয়ে যেত। যখন ঘড়ি দেখতাম, মনে হতো শেষ ট্রেন হয়ত মিস করব। তাকে বিদায় জানানোর সময়ও আমার হাতে থাকত না। কারণ আমাদের বিস্তর কথা জমে থাকত, এতো অল্প সময়ে যা বলে শেষ করা যেত না।

আমরা কেউ-ই বিছানায় যেতে একে অপরকে প্রলুব্ধ করিনি, তারপরও আমরা শয্যায় যাওয়া শুরু করলাম। সেই সময় পর্যন্ত আমরা পত্নী/পতির প্রতি বিশ্বস্ত ছিলাম। যে কোনো ভাবেই হোক আমাদের মধ্যে কোনো পাপবোধ ছিল না; কারণ, আমরা জানতাম এটাই বাস্তবতা। তার শরীর থেকে কাপড় খুলে ফেলা, শরীর দলাই মলাই করা, জড়িয়ে ধরা ইত্যাদি আমাদের স্বাভাবিক কথাবার্তারই অংশ বিশেষ ছিল। কাজেই আমাদের ওই দেহ-মিলন হৃদয়-ঘেঁষা কোনো শরীরী আনন্দমাত্র ছিল না; এটা ছিল সুন্দর সুস্থ আর চমৎকার একটা কাজ, কোনো রকম ভান বা ভণ্ডামির স্থান সেখানে ছিল না। দেহ-মিলনের আনন্দের পর আমরা শুয়ে শুয়ে অনেক কথা বলতাম। আমি তার নগ্ন শরীর জাপটে ধরে রাখতাম, সে আমার দু'হাতের ভেতর লুটিয়ে পড়ত; আমরা আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত গোপন ভাষায় ফিসফিস করে কথা বলতাম।

যখন ইচ্ছে তখনই আমরা মিলিত হতাম। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, হয়ত অবাক হওয়ার কিছুই নেই। আমরা বিশ্বাস করতাম আমাদের ওই সম্পর্ক চিরস্থায়ী হবে। সমীকরণের একদিকে ছিল আমাদের দু'জনের বিবাহিত জীবন, অন্যদিকে আমাদের

দুজনের সম্পর্ক, কোনো সমস্যাই তৈরি করেনি। আমাদের বিশ্বাস ছিল, আমাদের সম্পর্কের কথা কেউ কোনোদিন জানবে না। হা দৈহিক মিলন ঘটেছিল আমাদের মধ্যে; কিন্তু তাতে তো কারও কোনো ক্ষতি হয়নি। যে-রাতে ইজুমির সাথে বিছানায় যেতাম, বাড়ি ফিরতে দেরি হতো আমার, আর এ জন্যে স্ত্রীর কাছে মিথ্যে বলতে হতো আমাকে। বিবেকের দংশনও সইতে হয়েছে; তবে কখনোই। আমার মনে হয়নি এটা সত্যিকারের একটা বিশ্বাসঘাতকতা। ইজুমি ও আমার মধ্যেকার সম্পর্কটি কঠোরভাবে শ্রেণীবদ্ধ হলেও তা ছিল সম্পূর্ণরূপে অন্তরঙ্গ আর আন্তরিক।

এর ভেতর আর কিছু না ঘটলেও এইভাবেই আমরা সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারতাম। ভোদকা পান করতাম মাঝে মধ্যে, আর যখন ইচ্ছে তখন বিছানায় যেতাম। অথবা নিজ নিজ পতি/পত্নীদের সাথে থেকে থেকে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে ওই সম্পর্কের স্বাভাবিক মৃত্যু কামনা করতে পারতাম যাতে আমরা আমাদের। আরামদায়ক ক্ষুদ্র জীবনযাত্রায় ফিরে যেতে পারি। আমার ধারণা এ রকম ঘটলে খারাপ হতো না। প্রমাণ করতে পারব না, তবে ওই রকম অনুভব আমার মধ্যে ছিল। কিন্তু ভাগ্য এসে বাধ সাধল। ইজুমির স্বামী আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারটি আঁচ করে ফেললেন। তাকে আটকে রেখে তিনি এলেন আমার বাড়িতে, নিজের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না তার। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, তখন আমার স্ত্রী বাড়িতে ছিল, ফলে ব্যাপারটা কুৎসিত আকার ধারণ করল। বাড়ি ফেরার পর স্ত্রী আমাকে জিজ্ঞেস করল, কী ঘটছে এসব? ইজুমি এর মধ্যেই সবকিছু স্বীকার করে ফেলেছিল, ফলে কোনো রকম গল্প ফেঁদে বসার সুযোগ আমি পেলাম না। যা যা ঘটেছিল সবই বলে দিলাম স্ত্রীকে। “ভালবেসে ফেলেছিলাম ব্যাপারটা আসলে এ রকম ছিল না, আমি ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করে বললাম, “বিশেষ ধরনের এক সম্পর্ক বলা যায়, তোমার-আমার মধ্যেকার যে-সম্পর্ক তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। দিন আর রাতের মতো। তুমি কিছুই টের পাওনি, তাই না? তার মানে হচ্ছে যে, তুমি যে-রকম সম্পর্কের কথা ভাবছ, আসলে ব্যাপারটা ঠিক তেমন ছিল না।”

আমার স্ত্রী কোনো কিছুই কর্ণপাত করল না। ওটা বিরাট আঘাত ছিল তার জন্য এবং সে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ল। আমার সঙ্গে দ্বিতীয় কোনো বাক্যালাপে গেল না। পরের দিন সকালে সে মালপত্র সব প্যাক করে গাড়িতে ওঠাল, আর আমার ছেলেকে নিয়ে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে দিল, গন্তব্য চিকাসাকিতে অবস্থিত তার পিত্রালয়। বেশ ক'বার ফোন করলাম তাকে। ধরল না। শেষে ফোন ধরলেন তার বাবা। বললেন, "তোমার কোনো খোঁড়া যুক্তি শোনার ইচ্ছে আমার নেই। তোমার মতো বেজন্মার ঘরে আমার মেয়েকে ফেরৎ পাঠাতে চাইনে।" প্রথম থেকেই আমাদের বিয়েতে ঘোর আপত্তি ছিল তার। কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো, তিনি তার আপত্তির যথার্থতা খুঁজে পেয়েছেন এবার।

হতাশ হয়ে আমি কয়েকদিন ছুটি নিলাম আর বিছানায় শুয়ে রইলাম একা একা। ইজুমির ফোন এলো। সে-ও একা। তার স্বামীও তাকে ত্যাগ করেছেন। তবে তার আগে তাকে কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়ে গেছেন তিনি আর একটা কাঁচি দিয়ে ওর সব কাপড়-চোপড় কেটে নষ্ট করে দিয়েছেন। স্বামী রত্নটি কোথায় গেছেন তা সে জানে না। সে বলল, "আমি ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। কী করব বুঝতে পারছি না, সব শেষ হয়ে গেছে। সে আর ফিরবে না।" ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে। সে আর তার স্বামী ছোটবেলাকার প্রেমিক-প্রেমিকা। আমি তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম; কিন্তু এখানে আমার কী-ই বা বলার ছিল?

শেষে ইজুমি বলল, "চলো কোথাও গিয়ে একটা কিছু পান করি। আমরা শিবুইয়াতে গেলাম আর সারারাত ধরে মদ পান করলাম। কতটা পান করেছিলাম তার হিসাব আমার কাছে ছিল না। ওর সাথে পরিচয়ের পর এই প্রথম বলার মতো কোনো কথা খুঁজে পেলাম না। ভোরবেলা হারাজুকু এলাকায় হেঁটে হেঁটে মদের প্রভাব কাটিয়ে উঠলাম আমরা। তারপর ডেনিতে গিয়ে কফি সহযোগে নাশতা করলাম। আর তখনই গ্রিসে যাওয়ার মতলবটা ওর মাথায় এল।

“গ্রিসে যাবে?”

“জাপানে থাকা কোনো মতেই আর সম্ভব নয়।” আমার দিকে তাকিয়ে বলল সে।

আইডিয়াটা আমার মনের মধ্যে খেলালাম আমি। কিন্তু ভোদকা-আক্রান্ত আমার মস্তিষ্ক যুক্তিটা গ্রহণ করতে পারল না।

“গ্রিসে যাওয়ার ইচ্ছে আমার বরাবরই ছিল।” বলল সে, “আমার স্বপ্ন ছিল ওই দেশটা। হানিমুন করতে চেয়েছিলাম ওখানে; কিন্তু টাকার অভাবে যেতে পারিনি। চল এখন আমরা দুজনে মিলে যাই। আমরা থেকে যাব ওখানে। ওখানে আমাদের কোনো চিন্তা-ভাবনা থাকবে না। জাপানে থাকলে বিষণ্ণতায় ভুগব আমরা, ভাল কিছু হবে না এখানে।”

গ্রিসে নির্দিষ্ট কোনো আগ্রহের বিষয় ছিল না আমার। তবে তার সঙ্গে একমত পোষণ করলাম। হিসাব করে দেখলাম আমাদের হাতে কত টাকা আছে। ওর সঞ্চয়ে ছিল ২৫ লাখ ইয়েন আর আমার হাতে ছিল ১৫ লাখ ইয়েন। সব মিলিয়ে ৪০ লাখ ইয়েন। অর্থাৎ ৪০ হাজার ডলার।

ইজুমি বলল, “ওই টাকা দিয়ে গ্রিসের কোনো গ্রামে বেশ ক’ বছর থাকা যাবে। বিমানের টিকেটের জন্য খরচ হবে ৪ হাজার ডলার।” আমি তখন চারপাশে তাকালাম। ভোরের ডেনিতে যুবক-যুবতীদের ভিড়। আমরাই একমাত্র দম্পতি যাদের বয়স তিরিশের ওপরে, আর তারা বিপর্যয়ে ভরা ঘটনাবলীর পরে গ্রিসে পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছে। কী করুণ অবস্থা, ভাবলাম আমি। দীর্ঘ সময় ধরে নিজের করতল পর্যবেক্ষণ করলাম। এটাই কী আমার ললাট লিখন? ঠিক আছে, দেখাই যাক না!

.

পরের দিন অফিসে গিয়ে পদত্যাগ পত্র জমা দিলাম। আমার বস আমার সম্পর্কে নানা রকম গুজব শুনেছিলেন। তিনি আমাকে কিছুদিনের ছুটি দিতে চাইলেন। কিন্তু আমি সবকিছু গোছগাছ করে ফেললাম। মাঝারি সাইজের নীল রঙের একটা সামলোনাইট স্যুটকেস জোগাড় করে ফেললাম। ইজুমিও আমারই মতো ব্যাগেজ সঙ্গে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

বিমানে মিসরের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় একটা আশঙ্কা আমাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলল- ভুলক্রমে কে যেন আমার স্যুটকেস নিয়ে গেছে। পৃথিবীতে হাজার হাজার নীল রঙের স্যামসোনাইট স্যুটকেস আছে। গ্রিসে গিয়ে ওই রকমের একটা স্যুটকেস আমার হাতে আসবে, খুলে দেখব সেখানে অন্য লোকের জিনিস। স্যুটকেসটি খোয়া গেলে ইজুমি ছাড়া আমার নতুন জীবনের সাথে কোনো সংযোগই থাকবে না। হঠাৎ আমার মনে হলো, আমি উধাও হয়ে গেছি। সে এক অদ্ভুত অনুভূতি। বিমানে যে লোকটি বসেছিল সে আমি নই। আমার মস্তিষ্ক সুবিধাজনক কিছু বোচকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে যা দেখতে আমার মতো। মনের ভেতর বিশৃঙ্খলা। জাপান ফিরে যেতে হবে আমাকে, তারপর নিজের শরীরখানা ফিরে পেতে হবে। কিন্তু এখন জেট বিমানে মিসরের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছি, কোথাও ফেরার উপায় নেই। শরীরের রক্ত মাংস হাড় যেন প্লাস্টারের তৈরি। প্রচণ্ডভাবে কাঁপতে লাগলাম আমি। সেই কাঁপুনি কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিমানের ভেতর গলগল করে ঘামতে লাগলাম। শার্ট গায়ের সঙ্গে এঁটে গেছে। শরীর থেকে বেরুচ্ছে অদ্ভুত গন্ধ। ইজুমি দৃঢ়ভাবে আমার হাত ধরে রেখেছে। মাঝে মাঝে বুকে জড়িয়ে ধরছে আমাকে। কোনো কথা বলছে না সে; কিন্তু বুঝতে পারছে আমার মনের মধ্যে কী চলছে। ওই রকম কম্পন চলল প্রায় আধা ঘন্টা। মরতে চেয়েছিলাম আমি। কানের কাছে রিভলভার ধরে ঘোড়া টিপে দিয়েছিলাম যাতে শরীর মন উভয়ই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়...।

এক সময় কম্পন থেকে যায়। খুব হালকা অনুভূতি আসে আমার মধ্যে। গভীর নিদ্রায়

ডুবে যাই। যখন চোখ মেলে তাকাই, দেখি আমার নিচে এজিয়ান সাগরের আকাশি রঙের জল।

.

দ্বীপটিতে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল ওখানে করবার মতো কিছুই ছিল না। ওখানে কোনো বন্ধুবান্ধব ছিল না। সিনেমা হল বা টেনিস কোর্ট ছিল না। ছিল বইপত্র বা পত্রিকার অভাব। আমরা এতো তাড়াহুড়ো করে জাপান ছাড়ি যে, সঙ্গে তেমন বই আনতে পারিনি। এয়ারপোর্ট থেকে দু'টো উপন্যাস কিনেছিলাম আর ছিল ইজুমির সংগ্রহ করা এস্কেইলাসের ট্র্যাজেডির একটি সংগ্রহ। ওগুলো দু'বার করে পড়ে ফেলেছিলাম।

ইজুমি গ্রিক ভাষা শিখতে শুরু করেছে। দোকানদার বা কফিশপের ওয়েটারদের সঙ্গে ভাঙা ভাঙা গ্রিসে সে এখন কথা বলতে পারে। ফলে আমাদের একটা পরিচিত গণ্ডি তৈরি হয়েছে।

কাজকর্ম না-থাকায় আমরা এখন সর্বত্র ঘুরে বেড়াই। বন্দরে গিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করি; কিন্তু মাছ পাই না। মাছ যে নেই তা নয়। ওখানকার পানি এত স্বচ্ছ যে মাছেরা চোখ মেললেই স্পষ্ট দেখতে পায় কারা তাদের ধরতে চাচ্ছে।

আমি একটা স্কেচবুক কিনেছি। দ্বীপের এখানে-ওখানে ঘুরে প্রাকৃতিক দৃশ্য কিংবা মানুষের মুখ আঁকবার চেষ্টা করছি ওয়াটার কালারে। ইজুমি সব সময় আমার পাশে বসে ছবি আঁকা দেখে আর গ্রিক ধাতুরূপ মুখস্ত করে। সে বলে, "পোর্ট্রেট এঁকে আয় করবার ব্যবস্থা করা যায় তো। ভালই তো আঁক। সত্যটা তুলে ধর, তুমি একজন জাপানি শিল্পী...।"

আমি তার কথা শুনে হাসি। এ বাবদে সে ভীষণ সিরিয়াস। একদিন সে বলল, "আমি

জাপানি ট্যুরিস্টদের গাইড হতে পারি। ভবিষ্যতে এখানে আরও অনেক জাপানি পর্যটক আসবে, যা আমাদের জন্য হবে লাভজনক। তবে গ্রিক ভাষাটা আমাকে আরও ভাল করে শিখতে হবে।”

আমি বলি, “কিছু না করে আড়াই বছর এখানে থাকা যাবে বলে তোমার মনে হয়?”

“খারাপ কিছু না ঘটলে বা অসুখ বিসুখ না হলে অবশ্যই থাকা যাবে। তবে অপ্রত্যাশিত সবকিছুর জন্য তৈরি থাকতে হবে আমাদের।”

আমি বললাম, “এ যাবৎ তো আমি কোনো ডাক্তারের কাছেই যাইনি।” ইজুমি সরাসরি আমার দিকে তাকাল। ঠোঁট সংকুচিত করে বলল, “ধর আমি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লাম। তখন কী করবে? সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থাটাতো নিতে হবে, তাই না? তা যদি হয় তাহলে আমাদের টাকা-পয়সা ফুরিয়ে যাবে।”

“এ রকম কিছু হলে জাপানে ফিরে যাব আমরা।” আমি বললাম। সে বলল, “ওরকম কিছু করবে না তুমি। কিছুতেই জাপানে ফিরে যাব না আমরা।”

.

ইজুমি তার গ্রিক ভাষা শিক্ষা অব্যাহত রাখল আর আমি অংকন বিদ্যা চালিয়ে গেলাম। এটাই ছিল আমাদের সারা জীবনের মধ্যে সবচেয়ে শান্তিময় সময়। আমরা সাধারণ খাবার খাই, সস্তা মদ পান করি। প্রতিদিন নিকটবর্তী পাহাড়ে উঠি। পাহাড়ের ওপর ছোট্ট একটি গ্রাম। ওখান থেকে আমরা দূরের দ্বীপ প্রত্যক্ষ করি। তাজা বাতাস আর ব্যায়াম করার ফলে শিগগিরই আমার স্বাস্থ্য ফিরে আসে। সূর্য ডুবে গেলে দ্বীপটি নিঝুম হয়ে আসে। সেই নৈঃশব্দ্যের ভেতর আমরা নীরবে সঙ্গম করি আর দুনিয়ার তাবৎ বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলি। তখন মানুষ খেকো বিড়ালের কথা ওঠে। আমি বলি, যখন আমি ছোট ছিলাম আমার একটা বিড়াল অদ্ভুতভাবে উধাও হয়ে গিয়েছিল। “বিড়ালের

উধাও হওয়া অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। বিশেষত গরমের সময় এমন হয়। তারা উত্তেজিত হয়ে পড়ে আর বাড়ি ফেরার পথ হারিয়ে ফেলে।" বলল ইজুমি। সে তার দ্বিতীয় সালেম সিগারেটটি ধরিয়ে বলল, "তোমার সন্তানের কথা ভাব কি মাঝে মধ্যে?"

"কখনো কখনো ভাবি। সব সময় না। হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে যায় ওর কথা।"

"তাকে দেখতে ইচ্ছে হয়?"।

"মাঝে মধ্যে হয়।" বলি আমি। কিন্তু ওটা মিথ্যে কথা। আমি কেবল ভেবেছিলাম, ওই ভাবেই ব্যাপারটা অনুভব করা উচিত। ছেলের সঙ্গে যখন থাকতাম মনে হতো ও হচ্ছে আমার দেখা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর একটা কিছু। বাড়িতে ফিরেই আমি প্রথমে ওর ঘরে যেতাম আর ওর ঘুমন্ত মুখটি দেখতাম। কখনো কখনো মনে হতো ওকে বুকে নিয়ে প্রবলভাবে আঁকাই যাতে ও ভেঙে খান খান হয়ে যায়...। এখনও সবই আছে- তার মুখমণ্ডল, তার কণ্ঠস্বর, তার হাঁটাচলা, কার্যকলাপ- কিন্তু সবই দূর এক দেশে। তার ব্যবহৃত সাবানের ঘ্রাণটি এখনও মনে আছে আমার। তার সঙ্গে গোসল করতে আর তার গা ঘষে মেজে দিতে খুব ভাল লাগত আমার।

"জাপানে ফিরে যেতে চাইলে যেতে পার। আমার জন্য ভেবো না। চালিয়ে নিতে পারব আমি।" ইজুমি বলল। মাথা নাড়ালাম আমি। জানি এটা কোনো দিন হবার নয়।

সে বলল, "তোমার ছেলে বড় হয়ে যদি তোমার মতো ভাবে, তাহলে কি হবে? যেন তুমি সেই বিড়াল, যে পাইন বনে হারিয়ে গেছে!" তার কথা শুনে আমি হাসি। বলি, "হতে পারে।" ইজুমি তার সিগারেটের অবশিষ্টাংশ অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিতে দিতে বলে, "চলো বিছানায় গিয়ে শরীরের খেলায় মাতি, কেমন?"

"এখন তো সকাল।" বলি আমি।

“তাতে কী হয়েছে?”

আমি বলি, “না কিছু হয়নি।”

.

মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে দেখি ইজুমি নেই। সাড়ে বারোটা বাজে। বাতি জ্বালিয়ে ঘরের চারদিকে তাকাই। ভয়ঙ্কর নৈঃশব্দ্য সবকিছু গ্রাস করে ফেলেছে। অ্যাসট্রেতে দু’টো সিগারেটের অবশিষ্টাংশ পড়ে আছে। পাশেই সিগারেটের খালি। প্যাকেট। বিছানা ছেড়ে উঠে শোবার ঘরের দিকে যাই। ইজুমি ওখানেও নেই। রান্নাঘর কিংবা বাথরুমেও ছিল না সে। দরজা খুলে আঙ্গিনার দিকে তাকাই। দুটো লাউঞ্জ চেয়ার চমৎকার জ্যোস্নায় ভেসে যাচ্ছে। আমি ধীরে ধীরে ডাকি, “ইজুমি, এ্যাই ইজুমি।” কেউ সাড়া দেয় না। আমি জোরে জোরে ডাকি। আমার বুক টিপৃটিপ করতে থাকে। কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। নিজেই ভাবি- এটা কি আমার গলার স্বর? তখনও কোনো উত্তর আসে না। সমুদ্রের দিক থেকে হালকা বাতাস ভেসে আসে। দরজা বন্ধ করে রান্নাঘরে আসি। নিজেকে সুস্থির করার জন্য গ্লাসে মদ ঢালি। একটুখানি।

রান্নাঘরের জানালা গলিয়ে চাঁদের আলো এসে দেয়াল ও মেঝেতে অদ্ভুত আলো ছায়া তৈরি করেছে। গোটা পরিবেশকে প্রতীকী নাটকের দৃশ্য বলে মনে হচ্ছে। মোটা একটা স্যুয়েটার আর জিন্সের প্যান্ট পরে বাইরে বেরিয়ে আসি। ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় ইজুমি হয়ত বাইরে হাঁটতে গেছে। তখন বাতাস ছিল না। কাঁকর বিছানো পথে আমার টেনিস শু’র ক্রমাগত পদবিক্ষেপের শব্দ কানে আসে। ইজুমি সম্ভবত বন্দরের দিকে গেছে। এ ছাড়া তার যাওয়ার জায়গা তো দেখছি না। বন্দরে যাওয়ার একটাই রাস্তা, তাকে আমি পাবোই।

বন্দরে যাওয়ার মাঝ রাস্তায় বাজনার হালকা শব্দ আমার কানে আসে। প্রথমে মনে

হয়েছিল এটা হ্যাঁলুসিনেশন। খুব খেয়াল করে শোনার পর বুঝলাম এটা আসলে সুরেলা ধ্বনি। নিঃশ্বাস বন্ধ করে যতটা সম্ভব সুরটি শোনার চেষ্টা করলাম। কেউ বাজনা বাজাচ্ছে। কিন্তু কী যন্ত্র ওটা? ম্যাভোলিনের মতো লাগছে, 'জোরবা দ্য গ্রিকে' অ্যান্থনি কুইন এরকম একটা বাজনা বাজিয়েছিলেন। বাজনাটি কি বাওজুকি? কিন্তু এত রাতে কে এখানে ওই বাজনা বাজাবে?

প্রতিদিন পাহাড়ের ওপরে যে গ্রামটিতে আমরা যাই, বাজনাটা ওখান থেকে আসছে বলে মনে হলো। কী করবো, কোন দিকে যাবো? ইজুমিও তো ওই বাজনা শুনতে পাচ্ছে। মনে হলো, ও যদি ওই বাজনা শুনে থাকে তাহলে তার উৎস খুঁজতে ওদিকেই যাবে।

আমি চৌরাস্তার ডানদিকে মোড় নিলাম। ঢালুর ওপরের দিকে উঠতে লাগলাম। রাস্তার দু'পাশে গাছ-গাছালি ছিল না। ছিল হাঁটু সমান ঝোঁপঝাড়। যতই হাঁটতে লাগলাম সঙ্গীতের শব্দ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল। ওই সঙ্গীতে উৎসবের আমেজ ছিল। কল্পনা করলাম পাহাড়ের ওপরের গ্রামটিতে ভোজোৎসব চলছে। মনে। পড়ল, সেদিনই বন্দরে আমরা বরযাত্রীদের একটা মিছিল দেখেছিলাম। ওটা নিশ্চয় বিয়ের ভোজোৎসব।

আর তখনই কোনো রকম হুঁশিয়ারি ছাড়া উধাও হলাম আমি। হয়ত চন্দ্রালোকিত রাত ছিল, মধ্যরাতে বাজছিল বাজনা। প্রতিটি পদক্ষেপেই মনে হচ্ছিল গভীর বালুর ভেতর ডুবে যাচ্ছি আমি। বিমানে মিসরের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় আমার মনের অবস্থা যে রকম হয়েছিল এখনও সেরকমই অনুভূত হচ্ছে। মুখের ওপর হাত ঘষলাম। কিন্তু ওটা আমার মুখ ছিল না। হাত দুটোও আমার ছিল না। আমার বুক টিপটিপ করছে। শরীর প্লাস্টারের পুতুল। সত্যিকার জীবনের কোনো ভাবাবেগ সেখানে নেই। একটা পুতুল বই কিছুই ছিলাম না আমি যাকে বলিদানের কাজে ব্যবহার করা হবে।

অবাক হয়ে ভাবলাম- সত্যিকার আমি কোথায়?

.

তখন অজ্ঞাত কোনো স্থান থেকে ইজুমির কণ্ঠস্বর ভেসে এল- সত্যিকার তোমাকে বিড়ালেরা খেয়ে ফেলেছে। তুমি যখন ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলে ওই ক্ষুধার্ত বিড়ালেরা তোমাকে গ্রাস করেছে। খেয়ে ফেলেছে তোমাকে। হাড়গোড়গুলো শুধু বাকি আছে...।

আমি চারদিকে তাকালাম। এটা নিশ্চয়ই কোনো মায়া। দেখতে পেলাম পাথর ছড়ানো মাঠ, ছোট ঝোঁপঝাড় আর তাদের ছায়া। কণ্ঠস্বরটা ছিল আমার মাথার ভেতর। অন্য কিছু ভাবার চেষ্টা করলাম। উনাকিতে আমার সেই ফ্ল্যাটে ফিরে গেলাম। সংগৃহীত রেকর্ডগুলোর কথা মনে পড়ল। চমৎকার জাজ কালেকশন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের জাজ পিয়ানো বাদকগণ ছিলেন আমার প্রিয় ও লেনি ক্রিস্তানো, আল হেইগ, ক্লদ উইলিয়ামসন, লো লেভি, রুস ফ্রিম্যান... কিন্তু ওসব তো আর নেই। আমি নিজেই সব নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছি। জীবনে আর ওই রেকর্ড শুনতে পাব না আমি।

ইজুমিকে চুম্বন করার সময় যে তামাকের ঘ্রাণ পেতাম, সেই ঘ্রাণ স্মরণে এল। তার ঠোঁট আর জিহ্বা অনুভব করতে পারছি। চোখ বন্ধ করে ফেললাম। আমার পাশে পেতে চাইলাম তাকে। কামনা করলাম, সে আমার হাত দুটো ধরুক, মিসরের ওপর দিয়ে বিমানে উড়ে যাওয়ার সময় যেমন ধরেছিল।

একটা ঢেউ শেষ অবধি আমার ওপর দিয়ে চলে গেল, সঙ্গে ছিল সঙ্গীত।

তাদের বাজনা কি থেমে গেছে? সে সম্ভাবনা নিশ্চয়ই আছে। যে যা-ই বলুক। রাত এখন একটা।

ঘড়ির দিকে তাকালাম। মনে হলো হাতে কোনো ঘড়ি নেই। দীর্ঘশ্বাস ফেলে দু'হাত পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম। সময়ের ব্যাপারে কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না আমার। আকাশের দিকে তাকালাম। চাঁদটি ঠাণ্ডা পাথর, বছরের নানা হাঙ্গামায় এর ছাল বাকল ভক্ষিত

হয়েছে। এর উপরিভাগের ছায়া যেন বা একটা কর্কট, তার বিচ্ছিরি খুঁড় বিস্তার করে আছে। চাঁদের আলো লোকেদের মনের সঙ্গে চাতুরি করছে আর বিড়ালদের উধাও করে ফেলেছে। ইজুমিকেও উধাও করে দিয়েছে। হতে পারে সবকিছুই করা হয়েছে সতর্কতার সঙ্গে, যার সূচনা হয়েছিল অনেকদিন আগের একরাতে।

আমি কি চালিয়ে যাব, না যেখান থেকে এসেছি সেখানে ফিরে যাব। কোথায় গেল ইজুমি? তাকে ছাড়া এই নিশ্চল দ্বীপে থাকব কী করে? সে-ই তো ছিল একমাত্র মানুষ যে আমার মতো একজন ভঙ্গুর, অস্থায়ী ব্যক্তিকে আগলে রেখেছিল।

পাহাড়ের ওপরে উঠতে লাগলাম। এখানে কি সত্যিই কোনো বাজনা বেজেছিল? পরখ করে দেখতে হবে, যদি কোনো কু পাওয়া যায়? পাঁচ মিনিটের মধ্যে পাহাড়ের শীর্ষে আরোহণ করলাম। দক্ষিণ পাহাড়টা সমুদ্রের দিকে নেমে গেছে, তারপরেই বন্দর, নিদ্রিত শহর। উপকূলের রাস্তায় বাতি জ্বলছে। পাহাড়ের অন্য দিকটা অন্ধকারে ঢাকা। কিছুক্ষণ আগে অনুষ্ঠিত হওয়া প্রাণবন্ত কোনো উৎসবের চিহ্নমাত্র ছিল না সেখানে।

ঘরে ফিরে এক গ্লাস ব্র্যান্ডি নিলাম। ঘুমুতে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। পূর্বাকাশে আলো না ফোঁটা পর্যন্ত চাঁদের মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে রইলাম। তখনই হঠাৎ সেই বিড়ালগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠলো যারা তালাবদ্ধ অ্যাপার্টমেন্টের ভেতর না খেয়ে মারা পড়েছিল। সত্যিকার আমার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু তারা জীবিত এখনও। আমার মাংস খুবলে খুবলে খাচ্ছে। কামড়াচ্ছে আমার হৃদপিণ্ড, রক্ত পান। করছে, গ্রাস করছে আমার পুরুষাঙ্গ। দূরে, দেখতে পেলাম তারা আমার মগজ লেহন করছে। ম্যাকবেথের ডাইনিদের মতো তিনটি কোমল বিড়াল আমার ভাঙা মাথা ঘিরে আছে, হাপুসহুপুস করে খাচ্ছে ভেতরের পুরু স্যুপ। তাদের খসখসে জিহ্বার ডগা আমার মনের নরম ভঁজগুলো লেহন করে চলেছে। এবং প্রতিটি লেহনের সঙ্গে সঙ্গে আমার চৈতন্য অগ্নিশিখার মতো দপদপ করে জ্বলে উঠছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

শেষ পৃষ্ঠা

পড়ে ভাল লাগলে বই কিনে রাখুন।

 করোনার প্রকোপের সময় বানানো বইগুলি। সবাই সুস্থ থাকুন, সুস্থ রাখুন।

আরও বই

টেলি বই

whocriesup@gmail

Collect More Books > From Here